বিষয় ঃ কোচবিহার

(শতবর্ষ পূর্বে প্রকাশিত কোচবিহার বিষয়ক
চারটি প্রাচীন ইতিকথার পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদনা ঃ ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

BISHAYA : COOCHBEHAR
Edited by : Dr. Nripendranath Pal
Published by : Sri Dwijadas Kar, Anima Prakashani
141 Keshab Ch. Sen Street. Calcutta-700009
On : 15 April, 1994.

প্রকাশ কাল : ১ বৈশাখ, ১৪০১
প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীস্বপনকুমার রায়
মুদ্রাকর : শ্রীশিশিরকুমার সরকার, শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন, কলকাতা-৭০০০০৭

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক

ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়

পূজ্যপাদেষু ।

সূচী

প্রস্তাবনা

সূচনা

কোচবিহার আজ পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা মাত্র। একদিন এই কোচবিহার ছিল স্বাধীন রাজ্য। বিস্তীর্ণ এই রাজ্যের স্থপতি ছিলেন মহারাজ বিশ্বসিংহ। মহারাজ বিশ্বসিংহের পরবর্তী কালে সিংহাসনে বসেন ষোড়শ শতাব্দীর "বিক্রমাদিত্য" মহারাজ নরনারায়ণ। মহারাজার দুর্জয় বাহিনী তাঁর অনুজ ও প্রধান সেনাপতি শুক্লধ্বজের নেতৃত্বে একের পর এক রাজ্যকে জয় করে রাজ্যসীমা প্রসারিত করে দিল আশাতীত ভাবে। কোচবিহার রাজসভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। শুরু হল সাহিত্য ও নাট্যচর্চা। সমাজ জীবন উদ্বেল হল ধর্মীয় বিপ্লবের প্লাবন উচ্ছ্বাসে। ক্ষমতা ও শক্তির শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছেই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে শুরু হল অন্তর্দ্বন্দ্ব। কূটিল রাজনীতির আবর্তে ক্ষয়িত হতে শুরু করল সামরিক শক্তি এবং রাজ্যসীমা। মুঘল আক্রমণ এবং সিংহাসনের রাজনীতিতে ভূটানের সক্রিয় অংশগ্রহণ কোচবিহারের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলল।

ভারতীয় ইতিহাসের তখন এক ক্রান্তিকাল। মুঘল রাজশক্তির সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত। বণিকের মানদণ্ড তখন রাজদণ্ড রূপে আভাসিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক বুদ্ধি তখন শুধু বাজার অনুসন্ধান করছে। সেই সংগে দেওয়ানী সীমা প্রসারে অতি আগ্রহী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বিপন্ন কোচবিহার রাজার আত্মরক্ষার ব্যাকুল আবেদন নিয়ে এল স্বর্ণ সুযোগ। কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ এবং কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে সম্পাদিত হল এক চুক্তি। এই চুক্তিই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার প্রদীপকে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিল। তারপর বিবর্তনের নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে দেশীয় করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে নিজের সমস্ত ঐতিহাসিক সত্তা হারিয়ে মিশে গেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভারত ইউনিয়নের প্রবাহমান নব ইতিহাসের সংগম ধারায়।

কোচবিহারের ইতিহাসকে নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন এবং গবেষণা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের এই ইতিহাস অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে পরিবেশন করেছেন। তাঁদের সেই ইতিহাস পরিবেশনার মধ্যে ঘটনাগত, কালগত বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও মৌলিক কতগুলি পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই পার্থক্যগুলি থাকার কারণ মূলত ইতিহাস রচয়িতার অবস্থানগত পার্থক্য, ইতিহাস রচয়িতার উদ্দেশ্যগত পার্থক্য, রচনাকালগত পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি কোচবিহারের ইতিহাস রচনা করেছেন, তিনি ছিলেন কোচবিহার রাজার একজন বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ, রাজকর্মচারী। সুতরাং তাঁর ইতিহাস রচনার মধ্যে আতিশয্যপূর্ণ উক্তি, রাজবংশের

গুণাগুণ বর্ণনার প্রবণতা ইতিহাসের সত্যকে বিঘ্নিত করতে বাধ্য এবং অন্যান্যদের রচিত ইতিহাস থেকে কিছুটা পার্থক্য হয়ে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে রাজকুলবধূ বৃন্দেশ্বরী দেবী যখন ইতিহাস রচনা করেন তখন তাঁর শ্বশুরকুলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইতিহাসের প্রকৃত সত্য পরিবেশনে বাধা সৃষ্টি করতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, তিনি যে সময়ের পটভূমিকায় ইতিহাস রচনা করেছেন, সেই সমকালীন উপাদান ইতিহাসের মধ্যে সঞ্চারিত হতে বাধ্য। সুতরাং তাঁর রচিত ইতিহাস আর যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর ইতিহাস বা আনন্দচন্দ্র ঘোষের ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। আনন্দচন্দ্র ঘোষও কোচবিহার রাজ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। রাজমহিষীর নির্দেশে রিপুঞ্জয় দাস ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন। আজকের দৃষ্টিতে সেটি একটা খণ্ডিত ইতিহাস হলেও কিছু কিছু নতুন তথ্যের সন্নিবেশ লক্ষ্যণীয়।

পরিশেষে জেনকিন্সের প্রতিবেদন। যদিও এই প্রতিবেদনকে ইতিহাস বলে তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি, তবুও তাঁর এই প্রতিবেদনে তৎকালীন কোচবিহারের ইতিহাসের এক রূপরেখা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। জেনকিন্স ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিভূ এবং তাঁর বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে আবেগ বর্জিত। তিনি কোন ঐতিহাসিক নন। তিনি প্রশাসক রূপে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তৎকালীন কোচবিহারের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, যদিও এর মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্নিহিত বাণিজ্যিক বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক স্বার্থের উপাদানগুলি সঞ্চারিত হয়েছে। এই কারণে এই প্রতিবেদনকে বাংলায় অনুবাদ করে পৃথক একটি ইতিহাসের পরিচ্ছেদ রূপে সংযোজন করা হল।

ঐতিহাসিক না হয়েও বিভিন্ন সময়ে কোচবিহারের ইতিহাস লেখার চেষ্টায় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিল, সেই ইতিহাস বা প্রতিবেদনগুলিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে সাহিত্য কর্মের এক মালিকা রচনা করলাম। এই গ্রন্থনায় নিজের অবদান হয়তো কিছুই নেই, শুধুমাত্র আগামী দিনের ইতিহাস-আলোচকদের কাছে আলোকপাতের দায়িত্ব পালন করলাম।

বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চার শুভারম্ভ হয় ১৮০১ খ্রীঃ রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" গ্রন্থখানির মধ্য দিয়ে। তারপর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচনা করেন "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্" (১৮০৫ খ্রীঃ), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলি" (১৮০৮ খ্রীঃ), মার্শ-ম্যানের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৮৩১ খ্রীঃ), রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিত "বাংলার ইতিহাস" (১৮৫৯ খ্রীঃ), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বাংলার ইতিহাস" (১৮৭৫ খ্রীঃ) এবং রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিত "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে একাধিক ইতিহাস রচিত হয়েছে ও হচ্ছে।

এবার চিন্তা করা যেতে পারে আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার অধ্যায় নিয়ে। বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার পথ প্রদর্শক হিসেবে কোচবিহার রাজ দরবারের নাম স্মরণীয়।

বর্তমান কালের আভিধানিক অর্থে ইতিহাস-চর্চা অনেক পরে হলেও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে মুন্সী জয়নাথ ঘোষ ১৮৪৫ খ্রীঃ তাঁর "রাজোপাখ্যান" রচনা করেন। এখানে রাজ প্রশস্তির আধিক্য থাকলেও ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব নেই। আনন্দচন্দ্র ঘোষের "কোচবিহারের ইতিহাস" ১৮৬৫ খ্রীঃ লিখিত। রিপুঞ্জয় দাসের "মহারাজ বংশাবলী"র রচনাকাল আনুমানিক ১৮৪৭ খ্রীঃ। মহারানী বৃন্দেশ্বরীর "বেহারোদন্ত" গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৫৯ খ্রীঃ। ১৮৮২ খ্রীঃ ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কোচবিহারের ইতিহাস" লিখিত হয়। যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী "কোচবিহারের ইতিহাস" ১৮৮৩ খ্রীঃ রচনা করেন।

বৃহত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস বাংলায় ১৮৬৪ খ্রীঃ রচনা করেন শ্যামধন মুখোপাধ্যায়। তাঁর গ্রন্থের নাম 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস'। এই গ্রন্থটিকে অনেকেই প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস বলে মনে করে থাকেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ উমেশচন্দ্র রায় লেখেন সিকিমের ইতিহাস। ১৮৮০ খ্রীঃ হরিমোহন সান্যাল 'দার্জিলিংয়ের ইতিহাস' রচনা করেন।

তবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে কোচবিহারে এর বহু পূর্বেই একাধিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। সেজন্য আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে কোচবিহার রাজসভা হল প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শক।

এমনিভাবে ইতিহাস চর্চার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে।

বঙ্গে মহিলা কবিদের মধ্যে সাহিত্য-চর্চায় প্রাচীনত্বের দাবী নিয়ে একাধিক মতামত থাকলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর মহিলা কবি রামী বা রামমণিকেই প্রথম মহিলা কবি বলে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছে। রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম অনেক ক্ষেত্রেই একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। রামীর বেশ কয়েকটি পদাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে।

রামায়ণ ও মনসাদেবীর কথার প্রথম মহিলা কবি এবং রচয়িতারূপে পদ্মপুরাণ লেখক দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতাব্দীর কবি। গঙ্গামণি ও আনন্দময়ী দেবীর পর উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দিকে এক একটি গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে কাব্যসাহিত্য পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী পারিবারিক সুযোগ সুবিধা এবং যুগভাবনায় ভাবিত হয়ে একাধিক কাব্য, বৈজ্ঞানিক পুস্তক, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁর গীতিনাট্য "বসন্ত উৎসব" ১৮৭৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তারপর প্রসন্নময়ী দেবী, গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর পর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হল কামনী রায় এবং মানকুমারী বসু। কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "আলো ও ছায়া" ১৮৮৯ খৃঃ প্রকাশিত হওয়ার পরেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তাঁর রচিত একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করে। মানকুমারী বসুর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে "প্রিয়প্রসঙ্গ", "শুভসাধনা" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁর কবিতার মধ্যে বিয়োগ বেদনার মূর্ছনা ঝঙ্কৃত হয়েছে। মহিলাদের সাহিত্য-চর্চার প্রাথমিক পর্বের আলোচনা দিয়েই পরিসমাপ্তি রেখা টানা যেতে পারে। কেবলমাত্র সেই সময়ে

কোচবিহারে মহিলাকবি রচিত সাহিত্য-চর্চার নিদর্শনকে উল্লেখ করে। শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী বিদুষী বৃন্দেশ্বরীর জন্ম আনুমানিক ১৮৩১ খৃঃ। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিতা না হলেও তিনি "বেহারোদন্ত" (বেহার+উদন্ত=বেহারোদন্ত=কোচবিহার রাজ্যের বৃত্তান্ত, সংবাদবার্তা কুশলাদি কথন) নামে কোচবিহারের একটি ইতিহাস কবিতার ছন্দে রচনা করেন। রচনাকাল ১৮৫৯ খৃঃ। এই বইখানিকে একাধারে ইতিহাস, আত্মজীবনী, বা ইতিহাস ভিত্তিক কাব্য বলে উল্লেখ করা যায়। বাংলা সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে বৃন্দেশ্বরীর নাম এই কারণে অমর হয়ে থাকবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মহিলাদের মধ্যে ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে রানী বৃন্দেশ্বরীই অগ্রদূত। জীবনী সাহিত্য রচয়িতা হিসেবেও অনেকে মনে করেন। তবে সাহিত্য ইতিহাসকারেরা রাসসুন্দরী দেবীর ১৮৭৬ খৃঃ প্রকাশিত "আমার জীবন" গ্রন্থখানিকে প্রথম বাংলা ভাষায় লিখিত আত্মজীবনী বলে মনে করেন, কিন্তু কোচবিহারের রাজ অন্তঃপুরে যে সময়ে সাহিত্য-চর্চা চলছিল তার সংবাদ ব্যাপক প্রচার লাভ করে নি বলেই হয়তো বা বৃন্দেশ্বরীকে এই সম্মান দেওয়া হয় নি। তাঁর রচিত ইতিহাসের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কথা অকপটে তিনি উল্লেখ করেছেন যা ইতিহাসে স্থান পাবার কথা নয়। সেজন্য আত্মজীবনী রচয়িতা হিসেবেও বৃন্দেশ্বরীকে আলোক বর্তিকাবাহী বলে উল্লেখ করা সঙ্গত। বৃন্দেশ্বরী দেবীর পরবর্তী দু-একটি জীবনীগ্রন্থ হল—বিনোদিনী দেবীর 'আমার কথা' ১৯১২ খৃঃ, সারদা সুন্দরীর 'আত্মকথা' ১৯১৩ খৃঃ, প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্বকথা' ১৯১৭ খৃঃ। এছাড়াও কোচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী ১৯২১ খৃঃ ইংরেজীতে "The Autobiography of an Indian Princess" নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেন।

ইতিহাসের কূটতর্কে জড়িয়ে না পড়ে বর্তমান সংকলনে যে কটি গ্রন্থ বা প্রতিবেদন সংযোজিত হয়েছে তার বিষয়ে অধ্যায় ভিত্তিক কিছু আলোচনা করার ইচ্ছায় এখানেই ইতি টানা হল। তবে "মহারাজ বংশাবলী" বিষয়ক চিন্তা-ভাবনাগুলি মূল গ্রন্থের সঙ্গেই দেয়া আছে, সেকারণে এখানে "মহারাজ বংশাবলী" বিষয়ে আলোচনার অবকাশ নেই।

॥ কোচবিহারের ইতিহাস ॥

যাদবচন্দ্র ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—"কাপ" শামবেদ সাণ্ডিল্য গোত্র, শশাই বাগচীর ধারা। যাদবচন্দ্রের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদেব ভারেঙ্গার চৌধুরী বংশে বিয়ে করে কুল ভঙ্গ করেন ও 'চক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ করে তারানগরের ভারেঙ্গা গ্রামে বসবাস করতে শুরু করেন। আদি ভারেঙ্গা গ্রাম যমুনা-পদ্মার করাল রোষে ভেঙ্গে গিয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলায় অবস্থিত।

যাদবচন্দ্রের পিতা পীতাম্বর চক্রবর্তী পাবনার চৌধুরীদের জমিদারী স্টেটে নায়েবের চাকুরী করতেন। এছাড়াও বেদ-বেদান্তে অভিজ্ঞ থাকায় ক্রিয়া কর্মে বা অনুষ্ঠানে

পৌরোহিত্য করে অতিকষ্টে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিপালনে গুরুদায়িত্ব বহন করেন। আর্থিক দুরবস্থার জন্য অন্যান্য পুত্রদের শিক্ষিত করতে না পারলেও যাদবচন্দ্র লোয়ার মিডিল (প্রাথমিক বিদ্যালয়) স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হন এবং গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য বৃত্তি লাভ করেন। শিক্ষার অদম্য উৎসাহ চৌধুরী জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরাই যাদবচন্দ্রকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। সসম্মানে স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করে এফ. এ. (First Arts, পরবর্তীকালে I. A. বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দারিদ্র ও অর্থাভাবে সে আশা পূর্ণ হয় নি। যাদব চক্রবর্তীরা ৬ ভাই এবং ৪ বোন। মোট ১০ জন ছিলেন। বসবাসের জন্য সামান্য স্থান থাকলেও রাত্রে দীর্ঘ সময়ের জন্য পড়াশোনা করার জন্য রাস্তার গ্যাসের আলোর নীচে আশ্রয় নিতেন। তাঁর নিজস্ব ডায়েরীর যে ২।৩ খণ্ড পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে প্রায়ই এই ছাত্র-জীবনের দারিদ্রের আভাস পাওয়া যায় এবং নিজস্ব ঐ অভিজ্ঞতা থাকায় উত্তরকালে ভারেঙ্গার বসত বাড়ী (যা দেওয়ানজী বাড়ী বলে পরিচিত) সেখানে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের ভরণ পোষণের ও শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন ও পরবর্তী জীবনে তারা যাতে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয় তার জন্য তিনি সজাগ ছিলেন।

এফ. এ. পাশ করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়ানী বিচার বিভাগে একজন সামান্য কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন। যাদবচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনে মেধা, নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কর্ম-ক্ষমতা বৃটিশ শাসক কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয় এবং তিনি চাকুরীতে উন্নতি লাভ করেন। উচ্চতর ডিগ্রী না থাকলেও কর্মদক্ষতা এবং সুবিবেচনার পরিচয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে কোচবিহারের বৃটিশ রেসিডেণ্ট যখন একজন দক্ষ ও বিশ্বাসী আধিকারিককে কোচবিহারের দেওয়ানী বিভাগের জন্য অনুসন্ধান করছিলেন, তখন যাদবচন্দ্রকেই অনেক ইংরাজ অফিসার সুপারিস করেন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের অস্থায়ী ভাবে দেওয়ান নিযুক্ত হন। ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং সহনশীল মনোভাবের জন্য বৃটিশ সরকার যাদব চক্রবর্তীকে কোচবিহারের মহারাজ কুমারের বৈবাহিক যোগাযোগের দায়িত্ব দেন। রেসিডেণ্ট চাইছিলেন কুমারের বিয়ে হোক কোন দেশীয় রাজকুমারীর সংগে, কারণ তারা চাইতেন অন্য দেশীয় রাজপরিবারের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন, যেমন বারাণসী, বরোদা, বোম্বাই এবং শেষে মাদ্রাজ। কোন ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র এই বিয়েতে জাতি বিচারে সম্মত হয় নি। যাদবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজের বিজয়নগরমের রাজকুমারীকে সর্বতোভাবে উপযোগী মনে করেছিলেন, কিন্তু তখন বঙ্গদেশে তথা কোচবিহারে আসতে সমুদ্র যাত্রা করতে হত। সেজন্য এবং কোচবিহারের মহারানীদের নীতি ছিল যে কোন রাজমাতা রাজ্য ছেড়ে পিতৃ গৃহে ফিরবে না, এই দুটি কারণে সে বিয়ে হয় নি। যখন মনোমত পাত্রী কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, যাদবচন্দ্র

তখন ব্যর্থ বিফল হয়ে কলকাতায় ফিরে ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের সংগে মিলিত হন। যাদবচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনের বন্ধু ও শিষ্য রেভারেণ্ড প্রসন্নকুমার সেনের সংগে আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত পাত্রী হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত সমাজ সংকারক কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা স্নীতি দেবীকে পছন্দ করেন। ঘটক হিসেবে তাঁর এই ভূমিকার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকায়। এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রেই তিনি বিভিন্ন বিখ্যাত ব্রাহ্ম ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে আসেন যেমন রাজনারায়ণ বসু, দুর্গামোহন দাস ইত্যাদি। কোচবিহার থেকে অবসর গ্রহণের (কার্যকাল ১৮৬৯-১৮৯৮ খৃঃ) পর দেওঘরে তাঁদের কয়েক জনের সঙ্গে বসবাস করেন। বিয়ের ঘটকালি বিষয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর ডাইরীতে লিখে রেখেছেন। তাঁর বর্ণনায় মধ্যে পাওয়া যায় কি ভাবে চতুর ঘটক বা পাণ্ডারা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করে মহারাজার জাতি গোপন করে পছন্দমত পাত্রী পাওয়া সম্ভব। কিন্তু, তিনি এসব মিথ্যা প্রস্তাবে রাজি হন নি। তা ছাড়াও এরূপ প্রস্তাবে ইংরেজ রেসিডেণ্টেরও আপত্তি ছিল।

যাদবচন্দ্র প্রথম জীবনে কর্মসূত্রে যেখানেই গিয়েছেন সেখানে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উদ্যোগী হয়েছেন এবং অনেক শহরেই তিনি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সময়ে জনসাধারণ এবং মহিলাদের মনে নারী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করা কতখানি কষ্টকর ছিল, তা এখন সঠিক অনুভব করা অসম্ভব।

কোচবিহার রাজ্যে তাঁর কর্মকাণ্ড উচ্চপ্রশংসিত হয়। তৎকালীন সরকার তাঁকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর গায়ের রং ছিল ফরসা, তবে তিনি খর্বকায় ছিলেন। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন, কাজকর্মে ছিলেন সৎ, বিভিন্ন মানবিক গুণের জন্য বন্ধুরাও তাঁকে খুব ভালবাসতো। যাদবচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে তাঁর অন্যান্য ভাইদের শিক্ষা লাভের দায়িত্ব নেন এবং তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন। বোনেদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি অনুভব করেন মেধাবী ছাত্রদের পক্ষেও পড়াশোনা করা কত কঠিন। তাঁর জন্মস্থানে চারজন ছাত্রকে তিনি প্রতিপালন করেন। সেখানে তিনি একটি স্কুলও স্থাপন করেন। দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁর পৈত্রিক বাসস্থানেরও ধীরে ধীরে তিনি উন্নতি করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফরিদপুর জেলার ধামরাই-এর মাধব রায়ের কন্যা প্রমদাসুন্দরী। যাদবচন্দ্রের চার পুত্র এবং পাঁচ কন্যা ছিল। পরিবার ছিল বৃহৎ। যৌথ পরিবারের আর্থিক দায়-দায়িত্বের বেশীর ভাগ তিনিই বহন করতেন। যাদবচন্দ্রের স্ত্রী স্কুলে না পড়লেও বাড়ীতে যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন এবং সেই সময়ে "সঞ্জীবনী" বাংলা সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়তেন। ১৯৩৩ খৃঃ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কোচবিহারে চাকুরী জীবনের শেষ সময়ে কলকাতার ২৩ নং ফর্ডাইস লেনে (বৌবাজার) ত্রিতল বাড়ী কিনেছিলেন, সেখানে থেকে পরিবারের অনেকেই লেখাপড়া শেখেন। ওনার অবর্তমানে পরে এ বাড়ীতে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের গুপ্তস্থান হয়েছিল।

কোচবিহারে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি দেওঘর (বৈদ্যনাথ, বিহার)-এ গিয়ে নিজস্ব বাসভবন তৈরী করেন, যার নাম "অশোক আশ্রম", বর্তমান ঋষি রাজনারায়ণ বসু রোড ও সৎসংঘ আশ্রমের কাছাকাছি। বাড়ী তৈরী হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। বাড়ীটি এখনও আছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হলেও তিনি শেষ জীবনে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু যেমন রাজনারায়ণ বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির নাম তাঁর ডাইরী থেকে পাওয়া যায়। পরিবারের লোকেদের সংগে সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে তিনি ভোর বেলায় উঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন এবং তারপর পূজা এবং প্রাতরাশ সেরে জাপানী রিক্সায় চড়ে বন্ধুদের সংগে দেখা করতে যেতেন।

পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে যাদবচন্দ্রের আনুমানিক জন্ম ১৮৩৯ খৃঃ বর্তমান বাংলা দেশে। ১৮৯২-৯৩ সনের কোচবিহারের প্রশাসনিক বিবরণীতে দেখা যায় যে ১০. ১০. ৯২ সনে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর বয়স ৫৫ বছর। তখন তিনি কোচবিহার রাজ্যের সিভিল এবং সেসন জজ সহ কাউন্সিলের জুডিশিয়াল মেম্বার ছিলেন, সে সময়ে তাঁর বয়স ৫৫ বছর হওয়ায় আরও ৪ বছর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এই হিসেব ধরলে তাঁর জন্ম সন হয় ১৮৩৭। ১৮৬৯ খৃঃ তিনি সর্বপ্রথম কোচবিহারে দেওয়ান হিসেবে অস্থায়ী ভাবে কাজে যোগদান করেন, তারপর কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে কালিকাদাস দত্ত স্থায়ীভাবে দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং ঐ বছরই যাদবচন্দ্রকে ফৌজদারী আহিলকার পদে নিযুক্ত করা হয়। তারপর ১২ বছর দেওয়ানী বিচারক এবং ৭ বছর সিভিল এবং সেসন জজের পদ অলংকৃত করেন। কোচবিহার রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি কাজ করেন। কোচবিহার গেজেটের পাতায় পাতায় তাঁর বিচারের রায়, আইন বিষয়ক নির্দেশাবলী ছাপা হয়ে আছে। রাজ্যের রেভিনিউ এজেন্ট নিয়োগের সময়ে তিনিই ছিলেন প্রধান কর্তা ব্যক্তি। জুডিশিয়াল মেম্বার হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরী জীবনে মহারাজার বিশ্বাসভাজন যেমন ছিলেন, তেমনি প্রজাদের সুখ সুবিধের কথাও তিনি ভাবতেন। ১৮৯৮ খৃঃ তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১১ খৃঃ ১০ই জুলাই সোমবার সকালে কলকাতার বাসভবনে কিডনীর রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে কোচবিহারে শোকের ছায়া নেমে আসে। কোচবিহার গেজেটে মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয় এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় ও শ্রদ্ধা জানাতে কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে শ্রাদ্ধ দিবস অর্থাৎ ২০শে জুলাই রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ অফিস বন্ধ থাকবে।

যাদবচন্দ্র ১৮৮৩ খৃঃ "কোচবিহারের ইতিহাস" বইখানি লেখেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে গ্রন্থটি লিখিত এবং কোচবিহার ষ্টেট প্রেসে মুদ্রিত। বইখানি সে সময়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। গ্রন্থের আকার রয়েল ১৬ পেজী, আর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯। সংক্ষিপ্ত আকারে রাজ কথা, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, নদ-নদী প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৮৯৫ খৃঃ তিনি 'The Native States of India' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ

করেন। এই বইতে ভারতের বিভিন্ন রাজরাজড়ার সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং পরিচিতি আছে। অবসর গ্রহণের পর তিনি "কুলশাস্ত্র দীপিকা" নামে একটি বই লেখেন। এই বইখানিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বিস্তৃত বংশ তালিকা দেওয়া আছে।

কোচবিহারের আইনগুলি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের বিষয় তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। বিচারের রায় অনেক সময়ে অনুবাদ করে গেজেটে ছাপা হয়েছে। কোচবিহারের একখানি বাংলা আইন সংকলক চন্দ্রমোহন বসু তাঁর বই-এর ভূমিকায় লিখেছেন যে "ফৌজদারী আদালতের সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু যাদব চক্রবর্তী মহাশয় অনুবাদটি ভাল করে দেখে সংশোধন করে দেন। এ বিষয়েও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল।"

যাদবচন্দ্রের ডাইরীর ছেঁড়া পাতা থেকে তৎকালীন কোচবিহারের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। এখানে তার দু' একটি তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন—কোচবিহার রাজ্য উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত ভূমি, জঙ্গল নিয়ে প্রাধান্য লাভ করে। ভুটান ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত ও "ডুয়ার" বা আলিপুর ডুয়ার নামে চা বাগানের প্রাণ কেন্দ্র যেখানে অনেক ইংরেজ চা বাগানের মালিক হন। তাঁদের সংগে সুসম্পর্ক থাকায় উত্তর ভারতে এই দেশীয় রাজ্য প্রাধান্য লাভ করে। বৃটিশ রেসিডেন্টের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। এই স্টেটের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল গভীর জঙ্গলে ও ভুটান নেপাল সীমান্তে বন্য জন্তুর আধিক্য। প্রতি বছর বড়দিনের সময়ে ১০ দিন ব্যাপী শিকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হত। সেখানে বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর সহ বহু ইংরাজ চা বাগানের মালিক বণিক সম্প্রদায় এই শিকারে যোগদান করতেন। একদা মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালে কোন এক যুবরাজ এই শিকার উৎসবে যোগ দিয়ে এর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। কোচবিহার রাজ্যের মহারাজার উপাধি ও সম্মান আরও বৃদ্ধি পায়। মহারানী ভিক্টোরিয়া কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের এক পুত্রের God Mother হন এবং রাজকুমার Prince Victor নামে পরিচিত হন। বৃটিশ রাজপরিবারের সংগে কোচবিহার রাজপরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন উত্তর ভারতে বৃহৎ শক্তিশালী রাজপরিবারের সংগেও গড়ে ওঠে নি।

যাদবচন্দ্রের বংশ-তালিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় পরিবারের অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভে বিদেশ গিয়েছেন, কেউ কেউ আবার সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন বা করেছেন। যাদবচন্দ্রের পুত্র দ্বিজেশ প্রথম জীবনে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে উকিল, পরে গৌরীপুর (অসম) রাজ্যের দেওয়ান। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী। ইনি রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব ছিলেন। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ করে বিভিন্ন স্থানে সুনামের সংগে অধ্যাপনা করেন। কবি, সমালোচক, প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রশংসিত। তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ সুধীজনের কাছে সমাদৃত।

যাদবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশচন্দ্র বিহারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অনাথবন্ধু চক্রবর্তী ইণ্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী।

এই অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর কাছ থেকেই যাদব চক্রবর্তীর জীবনী লেখার মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি।

যাদব চক্রবর্তীর কন্যা কিরণময়ীর পুত্র শচীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, যিনি Economic Weekly-র প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রীসভায় কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী হয়েছিলেন। শঙ্খনারায়ণ ভাস্কর্য বিদ্যায় খ্যাত। প্রথম জীবনে শান্তিনিকেতনে পরে বরোদায় ছিলেন। বর্তমানে দিল্লীতে ললিতকলা একাডেমীর চেয়ারম্যান। কিরণময়ীর এক মেয়ের বিয়ে হয় কবি মনীষ ঘটকের সংগে। তাঁর কন্যা লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী।

॥ বেহারোদন্ত ॥

কোচবিহার রাজপরিবারের সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে রাজমহিষীগণও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরই একজন মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর জীবনীও সাহিত্য-চর্চা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচ্য।

বৃন্দেশ্বরী দেবী ছিলেন গোয়ালপাড়া জেলার পর্বত জোয়ারের জমিদার রাজেন্দ্রকুমার চৌধুরীর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম ছিল প্রাণেশ্বরী চৌধুরী। বৃন্দেশ্বরী দেবী ছিলেন মধ্যমাকৃতি ও শ্যামবর্ণা। শারীরিক সৌন্দর্যে তিনি কামেশ্বরীর তুল্যা ছিলেন না। বৃন্দেশ্বরীর কোন আপন ভাই না থাকলেও দু' বোন ছিল। এই দু' বোনের সংগে বিজনীর রাজা অমৃতনারায়ণের বিয়ে হয়েছিল।

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ১২০৩ বঙ্গাব্দে। ৪৪ বছর বয়সে অর্থাৎ ১২৪৭ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন (১৮৪১ খৃঃ) মহারাজা একই দিনে কামেশ্বরী এবং বৃন্দেশ্বরী দেবীকে রাজবংশের কুলপ্রথা অনুসারে কোচবিহারে তুলে এনে বিয়ে করেন। রাজা ঘটক মাধ্যমেই বিয়ের কথা পাকা করেন, একত্রে বিয়ে হবার ফলে কে বড় রানী ছিল সেটা বলা কঠিন। তবে কামেশ্বরী দেবীকে 'ডাঙ্গর আই' এবং বৃন্দেশ্বরী দেবীকে 'বড় আই' বলা হত। বৃন্দেশ্বরী অপেক্ষা কামেশ্বরী বয়সে বড় ছিলেন। দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ না থাকলেও কামেশ্বরী দেশের রাজনৈতিক কাজকর্মে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। তবে রাজার (নরেন্দ্রনারায়ণ) নাবালকত্ব কালে রাজ্য শাসনভার পরিচালনায় এই দুজন মহিষীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

রাজোপাখ্যান গ্রন্থে শিবেন্দ্রনারায়ণের বিয়ের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। বিয়ের দিন এখানে বিভিন্ন ধরনের মজলিস এবং আনন্দ উৎসব করেন। গানের আসরে যেমন একাধিক উত্তম গায়ক উপস্থিত ছিল, তেমনি একশত বাঈও উপস্থিত ছিল। দিনাজপুর থেকে আতস বাজিকর বিভিন্ন ধরনের বাজি এনে পোড়ানোর ব্যবস্থা করে, যার ফলে

চারদিক আলোকময় হয়ে ওঠে। ধনী দরিদ্র সকলেই আনন্দ উপভোগ করে। নানা স্থান থেকে আগত অতিথি অভ্যাগতদের প্রচুর অর্থদানে সন্তুষ্ট করে বিদায় করা হয় এবং রাজপরিবারের পরিজনদের যথাযোগ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বহুল আনন্দের মাধ্যমে মহারাজার বিয়ের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

বৃন্দেশ্বরী দেবীর বিয়ের সময় বয়স ছিল আনুমানিক ৯।১০ বছর। এই হিসেবে তাঁর জন্ম সন ১৮৩১। স্বামীর সুখ তাঁর কপালে বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৭।১৮ বছর, সেই যৌবন কালেই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়, কারণ মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ ১২৫৪ বঙ্গাব্দে (২৩.৮.১৮৪৭ খৃঃ) ৫১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় কুমার চন্দ্রেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি শিবেন্দ্রনারায়ণের ছোট ভাই বজ্রেন্দ্রনারায়ণের চতুর্থ পুত্র। শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর চন্দ্রেন্দ্রনারায়ণ নরেন্দ্রনারায়ণ নামে কোচবিহারের সিংহাসনে বসেন নাবালক অবস্থায়। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে (১৮৭৬ খৃঃ) মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। নিরুপমা দেবী পালক পুত্রের নাম লিখেছেন কুমার রঙ্গীলনারায়ণ। পরবর্তী কালে রঙ্গীলনারায়ণ কোচবিহারের বিভিন্ন উচ্চ পদে কাজ করেন। ১৮৮৮ খৃঃ দেখা যাচ্ছে যে তিনি নায়েব আহিলকার হিসেবে কাজ করেছেন। অনেক সময়ে রঙ্গীলনারায়ণ দেওয়ানের পক্ষেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি 'কোচবিহার মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন শিক্ষার আলো বিস্তার লাভ করে নি সেই সময়ে নারীশিক্ষার কথা একেবারেই অভাবনীয় ছিল। পর্দার আড়ালে যে মহিলার জীবন, সে লেখাপড়া শিখবে সে তো আশ্চর্যের কথা। বৃহত্তর বঙ্গের শিক্ষা গণমুখী হয় নি, কিন্তু শত বাধা সত্বেও সাহিত্যানুরাগী রাজমহিষী সেই সময়ে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর শ্বশুর মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ এবং স্বামী মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রাজঅনুগ্রহ পুষ্ট কবিদের দ্বারা একাধিক রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের অনুবাদ হয়। মনে হয় তাঁর স্বকীয় প্রতিভা বিকাশে এই সাহিত্য-চর্চার পরিমণ্ডল তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। নিজেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পুঁথি পাঠ করতেন। তাঁর রুচিবোধও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর শ্বশুর এবং স্বামীর স্বকীয় রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার রাজপরিবারে যে সময়ে সাহিত্য-চর্চার বিশেষ করে অনুবাদ সাহিত্যের গৌরবময় যুগ সেই সময়ে তিনি কোচবিহারে রাজমহিষী হয়ে আসেন। পরিবেশ তাঁকে সাহিত্য-চর্চা করতে সাহস জোগায় এবং সাহিত্যের রস আস্বাদনে অনুরাগী করে তোলে।

কোচবিহার রাজপরিবারের মধ্যে তিনিই প্রথম স্বকীয় ভাবনায় কবিতার ছন্দে বাংলার "বেহারোদন্ত" অর্থাৎ বেহার>কোচবিহারের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখেন। তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন না। মনের আবেগে ইতিহাস ভিত্তিক কিছু কথা তিনি

তুলে ধরেছেন। সেজন্য ইতিহাসের তুলাদণ্ডে বিচার করতে গেলে অনেক ভুল চোখে পড়বে।

অষ্টাদশ শতে কাশী শকের নির্ণয়।
মৃগেন্দ্রের পক্ষ দিনে লিপি সাঙ্গ হয়॥ পৃঃ ৯৮

পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই ভণিতা অনুসারে 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থের রচনাকাল নিরূপণ করায় নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। রচনাকাল নির্ণায়ক শকাব্দ সূচক যে শ্লোক কবি উল্লেখ করেছেন তা থেকে প্রকৃত শকাব্দ বা খৃষ্টাব্দ নির্ণয় করা অসম্ভব। ভণিতা বা পুষ্পিকাটি একটু ত্রুটিপূর্ণ অথবা মুদ্রণ প্রমাদযুক্ত। কোচবিহার সাহিত্যসভা কর্তৃক 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থটি নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খৃঃ) দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকার ভূমিকায় মুদ্রণকাল বলা আছে ১২৬৬ (১৮৫৯ খৃঃ) আর রচনাকাল সন্দেহ নিয়েই বলা আছে ১২৭১ (১৮৬৪ খৃঃ) যা বাস্তবে অসম্ভব। আবার কাকিনা শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই ভাদ্র বইটি প্রথম ছাপা হয় লেখা আছে কিন্তু ঐ প্রেস স্থাপিত হয় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, তাহলে দেখা যাচ্ছে মুদ্রণকালজ্ঞাপক তথ্যও বিভ্রান্তিমূলক। কাশী শকও ধরতে পারছি না। নিরুপমা দেবী কোন হিসেবে রচনাকাল ১৮৬৪ ধরলেন বুঝতে পারলাম না। শিবেন্দ্রনারায়ণের দত্তকপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬৩ খৃঃ ৬ই আগষ্ট মৃগী রোগে মারা যান এবং তাঁর পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণ নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিবেন্দ্রনারায়ণ মহিষী বৃন্দেশ্বরী দেবী তাঁর কাহিনী লেখা শেষ করেছেন নরেন্দ্রনারায়ণের বয়ঃপ্রাপ্তির পর মহাসমারোহে সিংহাসনে আরোহণ এবং তারপর বিয়ের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান শেষে আবার কলকাতা যাবার কথা বলায় পুত্র অনুপস্থিতির দুঃখ বর্ণনা করেই। যদি এই সময়কেই রচনাকালের শেষ সময় ধরি তবে শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুকালে নরেন্দ্রনারায়ণের বয়স ছিল আনুমানিক ৬, অর্থাৎ নরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়েছিল ১৮৪৭—৬=১৮৪১ সনে। সাবালকত্ব ১৮৪১+১৮=১৮৫৯। সাবালক হিসেবে রাজ্য শাসনকাল ১৮৫৯+৪ =১৮৬৩ খৃঃ।

এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে রচনাকাল ১৮৫৯ খৃঃ! নরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হবার পরেই অনুষ্ঠানাদি হয়।

ভণিতা বিশ্লেষণে বলা যায়—মৃগেন্দ্র অর্থে সিংহ=সিংহরাশি,—ভাদ্র মাস ; গণনায় বৈশাখ থেকে পঞ্চম অর্থাৎ ৫, পক্ষ-২ আর দিন-৭ ; তাহলে অর্থ দাঁড়ায় ১৮০০ সন, ৫ এবং ২+৭=৯ সুতরাং রচনাকাল ১৮৫৯ খৃঃ। আর বাংলা সাল হচ্ছে ১২৬৬। শকাব্দ ধরে হিসেব করলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে যায়, যেমন ১৭৫৯+৭৮=১৮৩৭ খৃঃ, যা একেবারেই অসম্ভব। ১৭২৫ শক ধরেও কিছু হয় না, আবার ১৮০১ শক (১৮০১+৭৮) =১৮৭৯ খৃঃ হয় যা ইতিহাস মতে অবাস্তব। ১৮৫৯-কে শকাব্দে নিয়ে এলে হয় ১৮৫৯—৭৮=১৭৮১ শকাব্দ। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে ভণিতাটি শকাব্দ ধরে করা কষ্টসাধ্য। অষ্টাদশ শত অর্থাৎ ১৭০০ ধরে করলেও রচনাকাল নির্ণয়ের জটিলতা কমছে

না। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে অষ্টাদশ শত অর্থাৎ ১৭০০+(একাশী)=৮১ =১৭৮১ শকাব্দ, ১৭৮১+৭৮=১৮৫৯ খৃঃ।

খানচৌধুরী আমানতউল্লা তাঁর কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থের ৪৩৩ পৃঃ লিখেছেন যে "বেহারোদন্ত" পুঁথির রচনাকাল ১৮৫৯ খৃঃ। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল মহাশয়ও ভণিতা বিশ্লেষণ করে ১৮৫৯ খৃঃ-কেই সমর্থন করেছেন। এ ছাড়াও সঠিক রচনাকাল নিরূপণে একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তির সংগে যোগাযোগ করেছি। রচনাকাল সমস্যা সমাধানে পরস্পর বিরোধী মতামত পেয়েছি। তারপর সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে রচনাকালটি হবে ১৮৫৯ খৃঃ অর্থাৎ ১৮৫৯—৫৯৩=১২৬৬ বঙ্গাব্দ।

রচনাকাল এবং মুদ্রণকাল একই সময়েই হবে। মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন মাস এবং 'বেহারোদন্ত' মুদ্রণ মাস নিয়ে যে বিভ্রান্তি রয়েছে সেটা আমাদের আলোচনার উর্ধে রাখাই সমীচীন হবে।

'বেহারোদন্ত' গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয়ে অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস মনে করেন যে—আসল রহস্য রয়েছে "অষ্টাদশ শতে কাশী" অংশে। অষ্টাদশ=১৮, শতে কাশী=শত+একাশি=১০০+৮১, এর অর্থ হতে পারত ১৮৮১ শকাব্দ। তা অসম্ভব। কারণ ১৮৮১ দাঁড়াচ্ছে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং আমার মনে হচ্ছে—অষ্টাদশের ১৮ সংখ্যাটি অঙ্কস্য বামা গতির সূত্রানুসারে ধরতে হবে ৮১। এই ৮১ সংখ্যাটিকেই দ্বিতীয়বার ঝালিয়ে নিয়েছেন গ্রন্থকর্ত্রী। ১৭৮১ শকাব্দ পাওয়া যাচ্ছে এই ভাবে।

অন্য ভাবেও পাওয়া যেতে পারে।

অষ্টাদশ—১৮০০
− ১০০ (শতে কাশী, একাশী অর্থ বাদ দিয়ে ধরা হচ্ছে)
\+ ৮১ (একাশী=৮১ ধরা হচ্ছে)
১৭৮১ শকাব্দ।

শত ও একাশী শব্দের শ্লেষ দুটির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি কারণ পরের পংক্তিতেও একই রকম শ্লেষ করার চেষ্টা আছে। যথা—

মৃগেন্দ্র অর্থ ক চন্দ্র (ব্যাকরণগতভাবে ভুল, আসলে মৃগাঙ্ক অর্থ চাঁদ) খ—মৃগশিরা নক্ষত্র, মার্গশীর্ষে মাস, মকর বা সিংহ রাশি। মৃগেন্দ্র পক্ষ=মৃগাঙ্ক পক্ষ=শুক্ল পক্ষ (পূর্ণিমা ?) তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—

রাজমহিষী বৃন্দেশ্বরীর "বেহারোদন্ত" লিপি সমাপ্ত হয়েছে ১২৬৬ বঙ্গাব্দে (কারণ ১৭৮১ শকাব্দ=১২৬৬ বঙ্গাব্দ)-র মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে মকর বা সিংহ রাশিতে মৃগশিরা নক্ষত্রে। শেষোক্ত রাশি ও নক্ষত্র Lexicographically ঠিক।

কোচবিহার সাহিত্যসভার প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩৩০ সালে মহারানী সুনীতি দেবীর পুত্র ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের পত্নী লেখিকা ও 'পরিচারিকা' (নব-পর্যায়) সম্পাদিকা নিরুপমা দেবীর বিস্তৃত ভূমিকাসহ বইখানি পুনঃমুদ্রণ হয়। ১৩২৭ সালের পরিচারিকা পত্রিকাতেই এই বেহারোদন্ত বিষয়ক আলোচনাটি প্রকাশিত হয়। বৃন্দেশ্বরী দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর বিষাদময় জীবন জ্বালার মধ্যেই এই ইতিহাস-কাব্য রচনা করেন। বইখানিতে অতীত ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সমসাময়িক অনেক কথাই, বিশেষ করে পারিবারিক কথা বিস্তৃত আকারে পরিবেশিত হয়েছে, যেমন—তাঁর বিয়ে, বিয়ের রীতিনীতি, অলংকার ব্যবহার, উৎসব আয়োজন, মহারাজের শারীরিক অবস্থা, দেশের অবস্থা, অমঙ্গলসূচক চিহ্ন, মহারাজার মৃত্যু, শ্রাদ্ধ আদি কর্ম। নরেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ, শিক্ষা, দেশ শাসন ইত্যাদি সহ নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের প্রথম দিকের কিছু আলোচনা এবং শিক্ষালাভে অন্যত্র যাবার পরিকল্পনায় মাতৃহৃদয়ের বিলাপ দিয়েই আলোচনা শেষ হয়েছে। এর মধ্যে অনেকটাই আত্মজীবনীমূলক তথ্যে ভরপুর।

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বইটি লিখিত। প্রাচীন ধারা রক্ষা করার কুশলতায় তিনি প্রথমে গণেশ বন্দনা, মহামায়া বন্দনা, কালী বন্দনা করেন। এ ছাড়াও এই বন্দনাগুলিতে কবির দেব ভক্তির কথাও পল্লবিত হয়েছে। কেন তিনি হঠাৎ একখানি ইতিহাস রচনায় ব্রতী হলেন সে বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা কষ্টকর। বক্তব্য উপস্থাপনে দু-একটি স্থানে ছন্দের কঠিন সূত্রকে মেনে চলতে গিয়ে শব্দের পরিবর্তন বা সংক্ষেপ করা হয়েছে, যেমন—নারায়ণ স্থলে নারাণ, চেড়—চেয়ার। আবার হঠাৎ ছন্দপতনও ঘটেছে, যেমন—কপট করিয়া দেওয়ান গেল নিজালয়ে। তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার আছে, যেমন—বৃষভ, অশনি, কালকূট, বসুন্ধরা, মাতঙ্গ, শয্যা, ক্রন্দন প্রভৃতি। স্থানীয় শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন, যেমন—বিয়া, আদ্দাশ, পরবাস প্রভৃতি, শব্দ প্রয়োগে কবির সচেতনতার আরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই যে পংক্তি দুইটির কথা স্মরণে আসে তা হচ্ছে—

আসি বলে তদন্তে ডাক্তার একজন।
বৃং হিয়ার ওয়ান্ বটল্ গুড্ ডিককসন॥ পৃঃ ৭১

সম্পূর্ণ ইংরেজি উক্তিটি কবির রসবোধের যথার্থ পরিমাপক। অনুরূপ প্রয়োগ—"সাহেবের যাম্যে স্থিতি চেড়েতে ভূপতি।" পৃঃ ৮২ সাহেবের দক্ষিণ পাশে চেয়ারে নরেন্দ্রনারায়ণ বসেছেন। এ বর্ণনায় 'চেড়' শব্দটি বিলিতি পরিবেশকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। "প্রাণাধিকে সেই মত আজেণ্ট করিল" পংক্তিটিতে আজেণ্ট এই ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের ফলে পৌরাণিক পরিবেশের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। 'আজেণ্ট' শব্দটির পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহৃত হলে তা উপযুক্ত হতে পারত বলে মনে হয় না। এছাড়াও এজেণ্ট, জেনারেল, পেণ্টুলন প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ তিনি ব্যবহার

করেছেন। এসব দেখে বলতে পারি তিনি ইংরেজি ভাষাও শিখেছিলেন। ফিরিঙ্গী—ফরাসী শব্দ।

ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও তিনি নিজস্ব ভাবনার একটি ছাপ রেখে গিয়েছেন।

কবি যদিও স্বাভাবিক বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন: "নারী জাতি অল্পমতি বর্ণিতে না পারি।" তথাপি তাঁর রচনায় পারিপাট্য আনবার জন্য তিনি প্রয়াস যে করেন নি তা নয়। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় অলঙ্কার প্রয়োগে কবির নৈপুণ্য। শিবের বর্ণনা, রাজকুমারের শৈশব লীলার বর্ণনা, সুলক্ষণা পাত্রী নিস্তারিণী দেবীর রূপ বর্ণনা একেবারেই গতানুগতিক। তবে কবি নিজের অক্ষমতা বোঝাতে গিয়ে উৎপ্রেক্ষা-বিরোধের মিশ্র অলঙ্কার প্রয়োগ করে লিখেছেন—

খর্ব্ব কলেবর মনে চন্দ্রিমা ধারণ।
যেন পঙ্গু ইচ্ছে গিরি করিতে লঙ্ঘণ॥ পৃঃ ৫৭

সেখানে প্রথম পংক্তিতে ব্যক্ত দুর্বল দেহে জ্যোৎস্না উপভোগের কল্পনা সুন্দর। যদিও পরের পংক্তিটি আবার প্রথাসিদ্ধ। 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থে কবি দুটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে—

অক্রুর যেমন কৃষ্ণ চন্দ্রে হরি নিল।
প্রাণাধিকে সেই মত আজেণ্ট করিল॥ পৃঃ ৭৮

এখানে উপমাটি বহু পরিচিত হলেও তা অমোঘভাবে রাজ্যবাসীদের মর্মযাতনা দ্যোতিত করে তুলেছে।

দ্বিতীয় প্রতিবস্তূপমাটি হচ্ছে—

যে সুখ উদয় হৈল ঐ সবাকার।
ত্রিজগতে উপমান না দেখি তাহার॥
স্থলে পড়ি যদি মৎস্যগণে দুঃখ পায়।
যদি বন্যা তারে ভাসাইয়া নিয়া যায়॥
তাহাদের হয় যেই সুখ অতিশয়।
ইহার উপমা তাহে হইতে পারয়॥ পৃঃ ৮৪

এই প্রতিবস্তূপমাটি গদ্যধর্মী হলেও এতে নগরবাসীদের আনন্দের যে বাস্তব চেহারা পাওয়া যায় তা স্বীকার করতেই হবে। অনুরূপ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা—

রাজার জননীগণে দেখি নরবরে।
বাগী যেন বৎস দেখি চিরদিন পরে॥ পৃঃ ৮৮

আরও একটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ—

রাজটিকা ভালে আহা কিবা সুশোভন।
প্রথম দৃষ্টিতে জ্ঞান হয় ত্রিলোচন॥ পৃঃ ৯১

এখানে উপমেয় রাজটিকা চিহ্নিত ব্যক্তি। উপমান—ত্রিলোচন জ্ঞান হয় সংশয় বাচক শব্দ।

এই অলংকরণ প্রয়োগের পিছনে নারী হৃদয়ের যে অকপট উন্মোচনের পরিচয় পাওয়া যায় তা পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ না করে পারে না।

আমাদের সমাজে কোন বধূর স্বামীর নাম উচ্চারণ করা বিধিমত নয় বলে বিশ্বাস। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে স্বামীর নাম বলতেই হবে তবে আকারে ইঙ্গিতে, নামটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হত। আমরা এই বইতেও দেখতে পাই কবি মহারানী বৃন্দেশ্বরী কত ভণিতা করে স্বামীর নাম, বয়জ্যেষ্ঠের নাম উচ্চারণ করছেন—

ভূপালের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বামী যে আমার।
কহিতে লজ্জায় জিহ্বা হইতেছে আড়॥
গুরু পিতৃ মাতৃ আর স্বামি নাম আদি।
উচ্চারণ করিবারে নাহি কোন বিধি॥
সর্ব্ব দেবদেবী পদে করি নমস্কার।
স্বামী নাম উচ্চারণ, পাপে হই পার॥ পৃঃ ৬১

স্বামীর মৃত্যুর পর চারদিকে যখন শোকের কালো ছায়া, সেই সময়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার যে ভাষা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবনা, চিরন্তন সত্যের কথা ফুটে উঠেছে, যেমন—

সংসারের ধর্ম্ম হয় জনম মরণ।
জন্মিলেই মৃত্যু হয় না হয় বারণ॥
সেই মৃত্যু কেবল দেহের মাত্র হয়।
জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধ জীবের কভু নয়॥ পৃঃ ৭৩

মহারানী বৃন্দেশ্বরী শ্বশুর এবং স্বামীর ন্যায় শাক্ত ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আত্মচরিতধর্মী এই ইতিহাস গ্রন্থ "বেহারোদন্তের" বিভিন্ন ভণিতায় তাঁর উপাস্য দেবতার স্তুতি গান করেছেন। স্বামী শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় তিনি মহাশক্তি শ্যামা মায়ের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেছেন। প্রথম দিকে তিনি হিন্দু নারীর সংস্কার বশে স্বামীর নাম উচ্চারণ না করলেও স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর নাম উল্লেখ করে বলছেন—

কহি যোর করে, এসো মা অন্তরে,
দাসেরে করিয়া দয়া।
শ্রীশিবেন্দ্র রায়ে, রেখো রাঙ্গা পায়ে,
অভয় দেহ অভয়া॥ পৃঃ ৭০

এমনিভাবে এই গ্রন্থের সমাপ্তি পর্যায়ে এসে ভক্তের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নের এই পদগুলিতে—

শাস্ত্রেতে বর্জ্জিত, ধর্ম্মে নাই চিত,
বর্ণিবারে সাধ্য নাই।
কেবল ভাবনা, শ্যামা ত্রিনয়না,
ঐ পদ সদা চাই ॥
মনের বিকার, ক্ষান্ত নাই আর,
বৃথা দিন চলি যায়।
শ্রীবৃন্দেশ্বরীর, যেন এ শরীর,
লিপ্ত হয় রাঙ্গা পায় ॥ পৃঃ ৯৭

মহিলাকবির এই শাক্ত ভাবনার সাহিত্যিক মূল্য অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

এমনতরো একাধিক উপমা তুলে ধরে তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ণ করা যেতে পারে। এই মহামূল্যবান বইখানিতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অনেক কথাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে কোচবিহার রাজঅন্তঃপুরকেন্দ্রিক সাহিত্য-চর্চার বহু ধারার একটি মাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

কোচবিহারের ইতিহাস অনেকেই রচনা করেছেন। প্রত্যেকের রচনার মধ্যেই তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, পদমর্যাদা জনিত পারিপার্শ্বিকতা এবং মূল উৎসের উপর নির্ভরতার পার্থক্য হওয়ার কারণে ঐতিহাসিক তথ্যের এবং বক্তব্যের বেশ কিছু পার্থক্য হয়েছে। বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন। যেমন, মহারাণী বৃন্দেশ্বরী। তাঁর পরিচয় হচ্ছে তিনি কোচবিহারের মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী। সেই কারণে তিনি তাঁর শ্বশুর বংশের ইতিহাস রচনা করছেন, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তাঁদের গৌরব, তাঁদের ঐতিহ্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহিলা হওয়ার কারণে তিনি রাজ্য শাসন, অর্থনীতি এবং দেশের সামাজিক কাঠামোর প্রতি কোন সময়েই গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁর ইতিহাসের মধ্যে জনগণ অনুপস্থিত। সমস্ত দেশের সামাজিক কাঠামো তাঁর ইতিহাসের চালচিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে ইতিহাস পারিবারিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। রাজঅন্তঃপুরের বাইরে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেন নি। ধারণা করা যেতে পারে তাঁর ইতিহাস রচনার সূত্র ছিল পারিবারিক লোকশ্রুতি বা জনশ্রুতি এবং পরিবারে সযত্নে রক্ষা করা এই রকম কোন ইতিহাস, যদিও তিনি তাঁর রচিত ইতিহাসে কোন সূত্র উল্লেখ করেন নি। তাঁর ইতিহাস রচনার কাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রাজনৈতিক পর্যায় হিসেবে তখন কোচবিহার রাজ্যের আমূল পরিবর্তনের কাল। স্বাধীন রাজার সার্বভৌমত্বের কাল সমাপ্ত। ইংরেজ প্রশাসন ক্রমেই প্রাচীন শাসন ব্যবস্থাকে সরিয়ে তৎকালীন বৃটিশ শাসন পদ্ধতি চালু করতে চাইছে। এই ক্রান্তি লগ্নে তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বৃন্দেশ্বরীর রচিত ইতিহাসের গুরুত্ব এইখানেই, যে রাজঅন্তঃপুরবাসিনী হয়েও সাধারণ কাব্য বা সাহিত্য-চর্চায় সংগে সংগেই ইতিহাস

লেখার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল কলম তুলে নিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য দরবারে তাঁর স্থান স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে কবিতার ছন্দে ইতিহাস রচনায় আর কোন মহিলা ঐতিহাসিক আছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। যদি তিনিই প্রথম হন তবে তাঁকে এবং তাঁর রচিত ইতিহাসকে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব এ প্রজন্মের থাকে। যদি তাঁর রচিত ইতিহাসকে আত্মজীবনীই ধরে নেই তবে একথা স্বীকার করতেই হয় কাব্যের মধ্য দিয়ে আত্মজীবনী রচনার প্রচেষ্টা বাংলায় তিনিই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। এই ইতিহাসের মধ্যে যে অংশ তাঁর নিজের কালের মধ্যে পড়েছে, সেই অংশের পারিবারিক, ঐতিহাসিক বর্ণনা নিঃসন্দেহে তথ্যনিষ্ঠ। এই অংশের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, উৎসব, বেদনাময় ঘটনা, নিজের পরিবারের অসুখবিসুখ ইত্যাদি খুটিনাটি বর্ণনা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্য অংশের যদি ঐতিহাসিক মূল্য নাও থাকে, তবে তাঁর নিজের কালের ঐতিহাসিক অংশটুকুকে কোন ঐতিহাসিক মূল্যহীন বলে গণ্য করার দুঃসাহস রাখবেন না। এই সময়ের ইতিহাস আর যে কেউ রচনা করুক না কেন তাঁদের ঐতিহাসিক বীক্ষণ রাজাদের পারিবারিক ঘটনার বিবরণকে কখনই ধরতে পারবে না। সেই দিক থেকেও বৃন্দেশ্বরীর এই ইতিহাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

।। মেজর জেনারেল ফ্রানসিস্ জেনকিন্স-এর প্রতিবেদন ।।

ফ্রানসিস্ জেনকিন্স ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট এবং কমিশনার অফ্ সার্ভে। ১৮৩৪ খৃঃ তিনি মিঃ টি. সি. রবার্টসনের কাছ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কার্য-পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গৌহাটী এবং গোয়ালপাড়ায় তাঁর সদর কার্যালয় ছিল। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তিনি কোচবিহার রাজ্য পরিদর্শনে আসেন নি। তিনি ১৮৩৬, ১৮৪১, ১৮৪৫, ১৮৪৯ এবং ১৮৬০ খৃঃ বিশেষ কার্য-উপলক্ষ্যে কোচবিহার পরিদর্শনে আসেন।

১৭৯৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের কর্ণওয়েলে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল রেভারেণ্ড জেনকিন্স। তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক। ইংলণ্ডে সৈনিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তিনি ভারতে আসেন। ১৮১১ খৃঃ ভারতীয় সেনাবিভাগে এনসাইন হিসেবে যোগদান করেন। ১৮১৬ খৃঃ তিনি লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন, এরপর ১৮৩০ খৃঃ ক্যাপ্টেন, ১৮৪৯ খৃঃ তিনি মেজর এবং ১৮৫১ খৃঃ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদে বৃত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁকে অনারারি মেজর জেনারেল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৬৬ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট তিনি ভারতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ

করে দীর্ঘদিন তিনি এতৎ অঞ্চলে ছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই গুরু-দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদটি তৎকালীন Calcutta Monthly Journal লিখছে—

"Captain F. Jenkins received charge of the office of Agent to Governor-General on the North East Frontier from Mr. Robertson on the 28 Feb 1834..."

(সূত্র কোচবিহারের প্রাচীন কথা. পৃঃ ১৫০)

একটানা ১৮৬১ খৃঃ পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে চাকুরীর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন এইচ. হপকিনসন। তাঁর কাছে যোগদানের পর কোচবিহারের মহারাজার অভিনন্দনপত্র এবং সেই সঙ্গে মেজর জেনকিন্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি এখানে তুলে ধরা হল। সেই সঙ্গে নব-নিযুক্ত এজেন্টের উত্তরটিও প্রকাশ করা হল।

Coochbehar
5th March, 1861

Captain H. Hopkinson, Agent, Governor-General,
North-East Frontier.

My friend,

I am happy to hear from my Mooktear that you have got safe to Gowhatty on the 25th ultimo. I heartily congratulate you on your appointment to the office of Agent, Governer-General, and Commissioner of Assam, and hope, no sooner it is convenient to, than you will be so good as to visit Coochbehar, and let me have the pleasure of your personal acquaintance.

As regards any particulars about myself and my Raj, I beg to refer you to your predecessor and my esteemed friend Col. F. Jenkins, who, I belive, is still at Gowhatty.

Hoping you are quite well, and will believe me to be,

My dear friend,
Yours obediently,
(Sd.) Narendra Narayan Bhupa.

No. 123 16th March 1861

To-Rajah Narendra Narayan Bhoop, Coochbehar.

My friend,

I have the pleasure to acknowledge the receipt of your letter of the 5th current, congratulating me on my appointment to the office of the Agent, Governor-General, North-East Frontier, and Commissioner of Assam, and to convey in reply my thanks for the same.

2nd. I look forward with great satisfaction to the prospect of visiting your Raj, and cultivating personal acquaintance with you. Trusting this will find you in good health.

(Sd.) H. Hopkinson,
Agent, Governor-General,

(Ref. Coochbehar Select Records Vol-II)

অসমের দেশীয় চা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, নেপাল ও তিব্বতের সংগে বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়ে, কয়লা, তেলের উৎস সন্ধানে ও ব্রহ্মপুত্র নদে স্টিমার প্রচলনে, সর্বোপরি শিক্ষার অগ্রগতির প্রসারে ফ্রানসিস্ জেনকিন্সের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কর্ণেল জেনকিন্স মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল এবং পরে নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় ব্যাপী কোচবিহারের শাসন কার্যের সংগে যুক্ত ছিলেন। নাবালক রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রাজ্যের বহুবিধ উন্নয়ণমূলক কাজের সংগে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এ. ক্লড ক্যাম্বেল তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—"তাঁর মতো সুযোগ্য ব্যক্তিকে এ যাবৎ এ রাজ্যে পাঠান হয়নি" তাঁর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার মহারাজা, রাজকর্মচারীসহ সকলকেই বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করেছিল। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের প্রথম দিকে কোম্পানীর সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠে, তা তিনি দূর করতে সক্ষম হন। তিনি পরপর তিনজন মহারাজার রাজত্বের ও শাসনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এই সুযোগ খুব কম ব্যক্তিই পেয়ে থাকেন। মহারাজাদের বিশেষ সুহৃদ হিসেবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। কোচবিহার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ খৃঃ মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের নাবালকত্বের সময় মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর প্রচেষ্টায় রাজকুমার এবং পরিবারের অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের শিক্ষার জন্য একটি ভার্ণাকুলার স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খৃঃ থেকে ঐ স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৬১ খৃঃ একই বিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা একত্রে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৭ খৃঃ কোচবিহারে যে ভার্ণাকুলার স্কুলের শুভসূচনা হয়েছিল সেটাকেই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম সোপান বা ভিত্তি বলা যেতে পারে। ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৫৯ খৃঃ জেনকিন্স স্কুল স্থাপন করেন। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের নাবালকত্বের সময়ে এই রাজ্যের জন্য কল্যাণ ও

সেবামূলক কাজের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মহারাজা সিংহাসন লাভের পর তাঁকে কিছু অর্থ উপহার হিসেবে দিতে চান। কর্ণেল জেনকিন্স মহারাজা প্রদত্ত ঐ সাম্মানিক অর্থ গ্রহণ না করে, ঐ অর্থ দিয়ে কোচবিহারে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য একটি ইংলিশ স্কুল স্থাপনের পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের অকৃত্রিম বন্ধু মেজর জেনকিন্সের নামে ঐ ভার্ণাকুলার স্কুলটির নামকরণ করা হয় "জেনকিন্স স্কুল"। আজও সেই জ্ঞানের প্রদীপ অনির্বাণ।

এই স্কুল স্থাপনের সংবাদে আনন্দিত হয়ে জেনকিন্স সাহেব ১৮৬১ খৃঃ জানুয়ারী মাসের ৭ তারিখে গৌহাটী থেকে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে এক পত্র মারফৎ জানান—

...I am obliged to you for laying the foundation of the school in my name and I hope you will take measures to provide for its being a prosperous institution......" (Princely Cooch-behar : A. Documentary Study on Letters [1790-1863 A.D.] Page 117;)

নাবালক রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে জেনকিন্সের বিশেষ আগ্রহ ছিল, যাতে তিনি পরবর্তী কালে ইংরেজীতে রাজকার্য করতে পারেন। তাঁর এই দূরদর্শিতার নিদর্শন পাই ১৮৪৭ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বরের এই চিঠির অংশ থেকে—

"........The young Rajah is a very nice intelligent lad, five or six years of age. I shall hope to be able to place him under a competent English gentleman, that he may be instructed in English,......"

(Ref. ibid. Page 75)

১৮৬০ খৃঃ কর্ণেল জেনকিন্স কোচবিহার সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালের চিত্র রয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রাপ্তির স্বীকৃতিতে বাংলার সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারীর পত্র থেকে জানা যায় যে বাংলার সরকার কোচবিহারের সার্বিক অগ্রগতির তথ্য এবং রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলার বিবরণীতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব-কালের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, ভূমিরাজস্ব, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে একটি চিত্র পাওয়া যায়। রাজকার্যে রাজার আগ্রহ, দক্ষতা বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেছিলেন। প্রজাদের অবস্থাও বাদ যায় নি। এককথায় এই প্রতিবেদনটিও সেই সময়কার অবস্থা পর্যালোচনার একটি দলিল বলা যেতে পারে।

এই বিবরণীও অনুবাদ করে জেনকিন্সের মূল প্রতিবেদনের সংগে তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনার জন্য তুলে ধরা হল। বাংলা সরকারের প্রশংসাসূচক মূল চিঠিখানি নিম্নরূপ—

From—Lord H. U. Browne.

Under-Secretary to the Government of Bengal.

To—The Agent to the Governor-General, North-East Frontier.

Fort William, the 10th April 1860.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your communication, dated the 3rd ultimo, and in reply to convey to you the thanks of the Lieutenant-Governor for the interesting report, Political. which you have submitted, on the present State of affairs in Cooch Behar. The Lieutenant-Governor thinks that the report affords grounds to hope that, under the management of the present Rajah, the improvement of the country and the prosperity of the people will gradually be promoted.

I have & C.,
(Sd.) H. Ulick Browne,
Under-Secretary to the Government of Bengal.

(Ref. Princely Cooch Behar : A Documentary Study on Letters, [1790-1863 A.D.] Page 101)

জয়নাথ মুন্সী লিখিত "রাজোপাখ্যান" গ্রন্থে দেখা যায় ১২৪৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৮৩৬ ইং) গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট হিসেবে জেনকিন্স কোচবিহার রাজ্যের সকল বিষয় তদন্ত করার জন্য রাজধানীতে আসেন। সেই সময়ে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কাশীতে ছিলেন। রাজকুমার শিবেন্দ্রনারায়ণ ও বজ্রেন্দ্রনারায়ণের উপর রাজকার্যের ভার ছিল। কর্ণেল জেনকিন্স রাজবাড়ীতে গিয়ে কুমারদ্বয়ের সংগে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরাও প্রথানুযায়ী সাহেবের তাঁবুতে গিয়ে মাননীয় এজেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করেন। এজেন্ট সাহেব মাল কাছারী আদালত ও ফৌজদারী বিষয়ক কাগজপত্র পরীক্ষা করে সেই তথ্যাদি বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করেন। এই আলোচনা কালে দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী সহ বিভিন্ন রাজকর্মচারী এবং জয়নাথ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। একাধিক আলোচনা বৈঠকে তাঁর নিকট উপস্থাপিত বিষয়াদির মীমাংসা সূত্র তিনি নির্দেশ করেন এবং দরখাস্ত সমূহের নিষ্পত্তির ভার কুমারদ্বয়ের উপর দিযে তিনি গৌহাটী প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী কালে ঐ সকল মোকদ্দমাদির নিরপেক্ষ বিচারের সংবাদে এজেন্ট সাহেব তাঁদের খুব সুখ্যাতি করেছিলেন।

১৮৪১ খৃঃ মাঘ মাসে শিবেন্দ্রনারায়ণের বিয়ের কিছুদিন পূর্বে কর্ণেল জেনকিন্স গৌহাটী থেকে কোচবিহার রাজধানীতে আসেন এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা দেখে মনে হয় যে তিনি রাজ্যের তৎকালীন দেওয়ানী, ফৌজদারী ইত্যাদি বিচার পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এরপর কর্ণেল জেনকিন্সকে শিবেন্দ্রনারায়ণের বিয়ের দিন পর্যন্ত রাজধানীতে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অন্যত্র সরকারী কাজ থাকার কারণে তিনি বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারার অক্ষমতা প্রকাশ করে গৌহাটী চলে যান। শিবেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ১৭৯৬ খৃঃ শেষ ভাগে। তাঁর জন্ম উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হয়েছিল। শিবেন্দ্রনারায়ণের বিয়েতে সেই সময়কার গভর্ণর জেনারেল অকল্যাণ্ড একজোড়া বন্দুক উপহার দিয়েছিলেন। ১৮২২ খৃঃ গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁর কার্যালয় তখন ছিল গোয়ালপাড়া এবং তিনি খুব কমই কোচবিহার পরিদর্শনে আসতেন। গৌহাটী-প্রতাপগঞ্জ-ধুবরী-গৌরীপুর-তুফানগঞ্জ-বলরামপুর এই এলাকার নদীপথেই তিনি যাতায়াত করতেন। ১৮৪২ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বরে জেনকিন্স লিখিত এক পত্রে দেখা যায় যে গোয়ালপাড়াতে তাঁর কার্যালয়ের সহকারীদের মাঝে মাঝে কোচবিহার পরিদর্শনের কথা বলছেন।

শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বিচার ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। ১৮৪০ খৃঃ তিনি "রাজসভা" স্থাপন করেন। এটাই ছিল রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারালয়। রাজা ছিলেন এই বিচার সভার সভাপতি। এ ছাড়াও দু'জন স্থায়ী সদস্য ছিলেন। এই সময়ে বিচারের সুবিধার্থে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুটি বিভাগ চালু করা হয়।

কোচবিহারে সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ে জেনকিন্সের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহ মহিষী এবং উপেন্দ্রনারায়ণের মহিষী সহমরণে যান। এ ছাড়াও প্রজাদের মধ্যে দু-একটি সতী হবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারত সরকার, সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খৃঃ সতীদাহ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও কোচবিহার রাজ্যে পরবর্তী কালেও সতীদাহের ঘটনা রয়েছে। এই সময়ে কোচবিহার তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এজেন্ট ছিলেন জেনকিন্স। তিনি এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করার জন্য কোচবিহার অধিপতি এবং ইংরেজ সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতে এবং পত্র মারফৎ যোগাযোগ করেন। সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক তাঁর প্রগতিশীল মনোভাবের নিদর্শন স্বরূপ একাধিক মূল্যবান সরকারী পত্র তাঁর শুভ প্রচেষ্টার নিদর্শন হয়ে আছে। কোচবিহার সিলেক্ট রেকর্ড সহ বিভিন্ন পত্র সংকলনের পাতায় পাতায় আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৪৯ খৃঃ কোচবিহারে সতীদাহ নিবারণের সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়।

১২৫১ বঙ্গাব্দ (১৮৪৫ খৃঃ) মাঘ মাসে ভূপতির সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য গৌহাটী থেকে এজেন্ট ক্যাপ্টেন জেনকিন্স কোচবিহারের রাজধানীতে আসেন। রাজকার্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যেই অনেক মত বিনিময় হয়। শিবেন্দ্রনারায়ণের শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি

সাহেবের তাঁবুতে যেতে পারলেন না। রাজবাড়ীতে পুনরায় অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর মহারাজা কাশীধামে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তাঁর প্রস্তাবে একপ্রকার সম্মতি দিয়ে ২।১ দিন পরে তিনি গৌহাটীর পথে রওনা হন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে মহারাজের কাশী যাওয়ার ছাড়পত্রের জন্য এজেন্ট সাহেবকে চিঠি লিখতে হচ্ছে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে কার্য পরিচালনায় কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন তার ব্যবস্থাও কর্ণেল জেনকিন্স করছেন।

রাজোপাখ্যানে তিনবার জেনকিন্সের কোচবিহার আগমনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিন বারই তিনি শীতের সময় অর্থাৎ মাঘ মাসে কোচবিহারে এসেছেন। সেই সময়ে জলযানেই যাতায়াত হত। বলরামপুরের নদীপথ দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। শীতের সময় নদীপথ নিরাপদ এবং মনোরম পরিবেশে চলাচল আরামদায়ক ছিল বলেই তিনি নদী পথেই যাতায়াত করতেন।

১৮৩৪ খৃঃ থেকে শুরু করে ১৮৬১ খৃঃ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে গভর্ণর জেনারেল ও কোচবিহার রাজ সরকারের সংগে একাধিক বিষয়ে জেনকিন্সের অসংখ্য চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল। এই চিঠিগুলি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি Journal of the Asiatic Society of Bengal-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মূলত তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় সে সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রবন্ধ Asiatic Society Journal-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। ১৮৪৯ খৃঃ লিখিত প্রতিবেদনটি তাঁর জ্ঞান এবং অনুসন্ধিৎসার সাক্ষ্য বহন করে। বিভিন্ন পুঁথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, রেকর্ড ইত্যাদি দেখেই তিনি ঐতিহাসিক রিপোর্টটি প্রস্তুত করেন। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজের গুরুত্ব জেনকিন্স সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন। এর পূর্বে কোচবিহারের দলিল-দস্তাবেজের সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই ত্রুটি উপলব্ধি করে জেনকিন্স কোচবিহারের প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। তাঁর উদ্যোগেই উনিশ শতকের ২য় দশক থেকে কোচবিহারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ, হাতে লেখা নকল প্রস্তুতকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

[সূত্র—'কোচবিহারের প্রাচীন কথা', সম্পাদনা: বিশ্বনাথ দাস, ১৯৯১, পৃঃ ১৫১, ১৫২।]

মেজর জেনকিন্সের আগমন ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হলেও ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ইংরেজ কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পূর্ব থেকে। ১৭৭২ খৃঃ পর্যন্ত কোচবিহারের সংগে ইংরেজ কোম্পানীর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, কিন্তু কোম্পানী এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় নির্দিষ্ট কতকগুলি উদ্দেশ্য সামনে রেখে।

কোচবিহারের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তক্ষেপের কারণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একাধিক কোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা

যেতে পারে। প্রথমতঃ ব্রিটিশদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পটভূমি। পরবর্তী কালে ওয়ালটার হ্যামিলটন এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণে বলেছেন যে—নতুন অধিগৃহীত রাজ্য হতে আর্থিক লাভের চেয়ে সংলগ্ন ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের শান্তি ও সুরক্ষার প্রশ্নই বড় বেশী। কারণ এই সময়ের পূর্ব থেকেই ভুটান রংপুর জেলার উপর জোরপূর্বক প্রবেশের জন্য একাধিক আক্রমণ চালায়। (১৮২০) (Ref. Historical Documents of Assam and The Neighbouring State p. 97 by N. N. Acharya). সেইজন্যে এইসব এলাকার শান্তি এবং সুরক্ষাই মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই ১৭৭২ খৃঃ চুক্তি প্রস্তাব সাগ্রহে কোম্পানী গ্রহণ করে। বাংলায় কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের উত্তর ভাগের সুরক্ষাই তাঁদের মুখ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর রাজনৈতিক অভিসন্ধি সম্বন্ধে জন পেমরেল লিখেছেন যে—তিনি ব্রিটিশ রাজ্যসীমা বৃদ্ধির সুযোগে আনন্দ বোধ করলেও, দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করেছেন যে ভবিষ্যতে তাঁর রাজ্য জয়ের দিকে কোন পরিকল্পনা ছিল না এবং আরও বলেছেন যে কেবলমাত্র কোম্পানীর রাজ্যের রূপরেখা সম্পূর্ণ ভাবে স্থির করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। (The Invasion of Napal, John Pemble, Page-31-32).

দ্বিতীয়তঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার দ্বারাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরও সাধিত হয়। এ পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলে কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্য নেপালের মধ্য দিয়েই চলত, কিন্তু এই সময়ে নেপালে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার ফলে কোম্পানী ভূটান, অসম এবং কোচবিহারের উপর দিয়ে তিব্বতের সংগে ব্যবসায়িক সম্পর্কের পথ খুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্য সাধনে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পরিকল্পনা ছিল গোরখাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগে ভুটানের আন্তরিক সম্পর্ক সুস্থভাবে গড়ে ওঠে নি। ভুটানের কোচবিহার দখলের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে থাকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বাণিজ্যের পথকে সুগম অবাধ করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং স্বভাবতই ভুটানের সংগে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ কোচবিহারের রাজকুমারী বর্তমানে জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবী তাঁর (The Princess Remembers) গ্রন্থে ইংরেজদের মনোভাব বিষয়ে মত প্রকাশ করে লিখেছেন যে—কোচবিহারের সংগে ব্রিটিশদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ও বৈচিত্র্যময়। কোচবিহারের ভৌগোলিক অবস্থানই এর প্রকৃত কারণ। কোচবিহার ভূটান সিকিম অসমের আগ্রাসী পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সংগে নিরন্তর জড়িয়ে পড়েছিল। অন্যপক্ষে নেপাল ও তিব্বতের সংগে ভূটান, অসম, সিকিম জড়িয়ে পড়ে। এই রণ-নীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও অশান্ত এলাকায় ব্রিটিশদের নিরন্তর আধিপত্য স্থাপন অত্যন্ত জরুরী ছিল। পারিবারিক কলহে রাজ্যের জীবনযাত্রা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এর পরিণতি হল ১৭৮৮ খৃঃ রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা।

চতুর্থতঃ কোম্পানী শাসিত অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপ কোচ রাজ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে থাকে। সুতরাং কোচবিহারের পার্শ্ববর্তী এলাকার শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় কোম্পানী উদ্বিগ্ন ছিল। এই সন্ন্যাসীদের সমস্যা ব্রিটিশদের অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ। ফলে ১৭৭৪ খৃঃ ভুটানের সংগে চুক্তি সম্পাদনে এই সন্ন্যাসীদের বিষয়ে একটি সর্ত সেখানে সংযুক্ত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় এই রাজ্য সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে নি, যদিও দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিলোপ সাধনের প্রবণতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

[সূত্র : The Modernisation of a Princely State Cooch-Behar under Maharaja Nripendra Narayan (1863-1911)—Kamalesh Chandra Das, 1989. unpublished Thesis).

কোচবিহার রাজের দুর্বলতার সুযোগে ভুটিয়ারা রাজ্যে আক্রমণ ও প্রজা নির্যাতন করে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। রাজার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকায় নিরুপায় হয়ে ১৭৭৩ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগে এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তারপর ইংরেজের ছায়াতলে বসে নিশ্চিন্তে রাজ্য শাসন করলেও সেদিন থেকেই রাজ্যের সার্বভৌমত্ব লুপ্ত হয়। এই সময় থেকেই বহিরাগত বিভিন্ন পদাধিকারীর কর্তৃত্বাধীনে রাজ্যের বহুবিধ কাজ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর "প্রাচীন বাঙ্গলা পত্র সঙ্কলন" (পৃঃ ১১) গ্রন্থে লিখেছেন যে "কুচবিহারের গৃহ বিবাদে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সুব্যবহার হইয়াছিল।" ইংরেজ ক্যাপ্টেন জোন্সের নেতৃত্বে কোচবিহার থেকে ভুটিয়া সৈন্যদের বিতাড়িত করা হলেও রাজ্যে ইংরেজ বাহিনীর স্থায়ী শিবির গড়ে ওঠে। কোচবিহার রাজপরিবারের গৃহ বিবাদ মেটাতে, রাজ্যের মধ্য থেকে অরাজকতা দূর করতে এবং সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে মেজর জেনকিন্স বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উপদেশ, আদেশ, নির্দেশ, পত্র প্রভৃতি রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ণের সহায়ক ছিল।

১৭৬৫ খৃঃ দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বা উত্তর-পূর্ব ভারতে কোম্পানীর প্রশাসনিক উন্নয়ণের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোম্পানীকে রাজস্ব সংগ্রহের নির্দিষ্ট অধিকার দেওয়ার ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে সুসংহত করতে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান কোম্পানীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সামন্ত রাজ্য সিকিম, কোচবিহার, ভূটান, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে কোম্পানীর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ভাবে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের

আত্মপ্রকাশ ঘটে, যাঁরা শুধু কোম্পানীর ঔপনিবেশিক স্বার্থকেই বড় করে দেখেন নি, পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণ, তাঁদের শিক্ষা এবং সামন্ত রাজাদের সংগে সম্পর্কের ক্ষেত্র বিষয়ে একাধিক প্রতিবেদন দিয়েছিলেন, তার মধ্যে দু'একটি গ্রন্থের আকারে পাই। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্র তুলে ধরে ছিলেন, সুতরাং তাঁদের বিষয়ে জানা অত্যন্ত আবশ্যক।

কোচবিহার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একাধিক প্রতিবেদনের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল জেনকিন্সের প্রতিবেদন। এ ছাড়াও কর্ণেল জে. সি. হটন, মার্শ ও লোভে, বেকেট, করালীচরণ গাঙ্গুলী পরিবেশিত প্রতিবেদন অন্যতম।

মিঃ ডবলিউ এ. ও. বেকেট কমিশনার হিসেবে কোচবিহারে আসেন এবং কোচবিহারের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করেন, প্রসঙ্গক্রমে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করেন।

মার্শ ও শোভে কেবলমাত্র রাজা ও নাজিরদেওর বিরোধ বিষয়ে তদন্ত করেন নি। কোচবিহারের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও প্রতিবেদনে মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন যে এতদিন যে শাসন ব্যবস্থা চলছে তা রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর নয়। রাজ্যের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন পক্ষই রাজ্যের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বিপক্ষের ক্ষতি করাই ছিল শক্তি গোষ্ঠির লক্ষ্য। ১৭৮৮ খৃঃ তাঁরা অনুসন্ধানের প্রতিবেদন পেশ করেন।

১৮৬৪ খৃঃ কর্ণেল হটনও কোচবিহার বিষয়ক একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

করালীচরণ গাঙ্গুলী ১৯৩০ খৃঃ ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ লেখ্যাগারে রক্ষিত যে সমস্ত তথ্য রয়েছে সেগুলির মধ্য থেকেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অনুসন্ধান করা যায়। জেনকিন্সের ১৮৬০ খৃঃ লেখা দ্বিতীয় প্রতিবেদন এবং কর্ণেল হটনের প্রতিবেদন এই লেখ্যাগারেই সযত্নে রক্ষিত আছে।

এছাড়াও সমকালীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন প্রভাতী দৈনিক, বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক, সুরভী সাপ্তাহিক পত্রিকায় নৃপেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ নিয়ে এবং ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য ছাপা হয়েছে।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের বয়স যখন কেবলমাত্র দশ বছর সেই সময়ে ডগলাস কোচবিহারের রেসিডেণ্ট কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর পড়াশোনার বিষয়ে সজাগ ছিলেন। ডগলাসের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শিক্ষকের মাধ্যমে তাঁকে বাংলা, সংস্কৃত এবং পার্শী ভাষা শেখান হয়। ১৭৯৩ খৃঃ মাত্র তের বছর বয়সে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ দু'জনকে বিয়ে করেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ক্ষমতায় আসীন হবার পরবর্তী কালে ক্ষুদ্র রাজ্য কোচবিহার সম্পর্কে ইংরাজ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ওয়েলেসলির ইংরাজ সাম্রাজ্য বিস্তারের কুটিল আগ্রাসী নীতির কার্যক্রমের মধ্যে কোচবিহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৭৩ খৃঃ সন্ধি সুত্রের তিন নং ধারার ব্যাখ্যা নতুনভাবে করা হতে থাকে এবং রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালকে রাজার সার্বভৌম অধিকার রক্ষার চেষ্টা ও ইংরেজদের আগ্রাসী নীতির মধ্যে সংঘর্ষের কাল বলে উল্লেখ করতে পারি। তবে ইংরেজের বহু কুট কৌশল এড়িয়ে রাজা তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হন।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৯ খৃঃ ২৯শে মে বারাণসীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কোচবিহারে আসামাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁর এই সিংহাসন আরোহণের বিরোধিতা করেন তাঁর ছোট ভাই ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এবং যোগেন্দ্রনারায়ণ, তাঁদের দাবীকে শক্তিশালী করতে পিতার পূর্ব বাসনার কথা তোলেন যে তাঁর অন্তিম ইচ্ছে ছিল তাঁর তৃতীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। এই বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সংগে একাধিক পত্রালাপ হয়। ম্যাকলিয়ড স্কট, জেনকিন্স্‌সহ ইংরেজ সরকারকে এই সিংহাসন বিরোধ মীমাংসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। সিংহাসনের দাবীদারেরা শিবেন্দ্রনারায়ণকে হরেন্দ্রনারায়ণের বৈধ সন্তান নন এই অভিযোগ এনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে মিঃ জেনকিন্স তাঁর বিবরণীতে ইংরেজ সরকারকে জানান যে হরেন্দ্রনারায়ণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে কেবলমাত্র শিবেন্দ্রনারায়ণই রাজকার্যের সংগে গভীরভাবে যুক্ত। শিবেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে একাধিক বক্তব্য থাকলেও শেষপর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে কোচবিহারের মহারাজা রূপে স্বীকৃতি দেন।

মিঃ জেনকিন্স লিখেছেন যে হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই হতাশাব্যঞ্জক ছিল। শিবেন্দ্রনারায়ণ দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না। শিবেন্দ্রনারায়ণের আধুনিক এবং প্রগতিশীল মনোভাবের কথাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শিবেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান থাকায় নাজিরদেও খগেন্দ্রনারায়ণের নাতি কবীন্দ্রনারায়ণকে তাঁরা দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু হঠাৎ তার মৃত্যু হলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র চন্দ্রেন্দ্রনারায়ণকে ১৮৪৪ খৃঃ পুনরায় দত্তক নেন। পরে চন্দ্রেন্দ্রনারায়ণ নরেন্দ্রনারায়ণ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জেনকিন্স কোচবিহার রাজ্যের প্রশাসনিক উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন কোচবিহার রাজ্য এবং ইংরেজ শাসকদের মধ্যে যোগসূত্র। তৎকালীন প্রশাসনের ত্রুটিগুলি তিনি উল্লেখ করেন এবং বাংলার সরকারের কাছে কোচবিহার রাজ্যে একজন রেসিডেন্ট পাঠানোর প্রস্তাব রাখেন। তিনি রিজেন্টকে একজন

কমিশনারের ক্ষমতায় রাজ্যের প্রশাসনিক বিষয়ে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণও করবেন। কিন্তু বাংলার ইংরেজ সরকার তাঁর প্রস্তাবগুলিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। রাজ্যের সুষ্ঠু কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এজেণ্টই সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

এতদ অঞ্চলে কর্ণেল জেনকিন্স দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের ফলে এবং তাঁর দূরদর্শিতার ফলশ্রুতি হিসেবেই কোচবিহার রাজ্যের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং শিক্ষা অনুরাগ বিষয়েও একাধিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজ্যের সুশাসনের সংগে সংগে নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি বিষয়ে উদ্যোগ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কর্মজীবনে এখানকার সমাজ জীবনের সংগেও জড়িয়ে যান এবং সামাজিক উন্নয়ণে নিজের মানসিকতায় একাধিক উন্নয়ণধর্মী প্রকল্প গ্রহণ করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মিঃ জেনকিন্স কোন গ্রন্থ লিখতে প্রয়াসী হন নি। তিনি কেবলমাত্র তাঁর কর্মস্থলের একটি প্রতিবেদন ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করেন। মুদ্রিত আকারে আমরা মূল প্রতিবেদন পাই নি, তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি কেবলমাত্র ছাপা হয়। তিনি রিপোর্ট পেশ করেন ১৮৪৯ খৃঃ তারপর ১৮৫১ খৃঃ দার্জিলিং-এর (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এ. ক্যাম্পবেল লিখিত সিকিম মোরাঙ্গ এবং জেনকিন্স লিখিত কোচবিহার—এই দুটি অধ্যায় নিয়ে বইটি ছাপা হয়। কোচবিহারের বিবরণ ১৯ থেকে ৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। বংশলতাটিও বিস্তৃত। বইখানির নাম Selections From The Records Of The Bengal Govt. Published by Authority. No. V

কোচবিহার বিষয়ক প্রতিবেদনটি মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত।

(ক) কোচবিহারের সাধারণ প্রশাসন।

(খ) কোচবিহারের সংগে বৃটিশ সরকারের সম্পর্ক।

(গ) কোচবিহারের ভূমি ব্যবস্থার পরিচালন ও তার নিয়মাবলী।

তিনি যে সময়ে এই প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন, সেই প্রতিবেদনে কোচবিহারের বিচার ব্যবস্থা, বিচার পদ্ধতি, তার বিভিন্ন শ্রেণী, কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ, বেতন, নৈতিকতা, মহকুমা স্তরে প্রশাসনিক এবং বিচার ব্যবস্থা, থানা চৌকি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়াও রাজাদের মধ্যে বিরোধ, কর্মক্ষমতা এবং এখানকার টাকশাল বিষয়ে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়েও আলোকপাত করা আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে কোচবিহারের সংগে ব্রিটিশের সম্পর্ক। মেজর জেনকিন্স বাংলার সমস্ত দুয়ারগুলিকে অবিলম্বে ইংরেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আবেদন রাখেন। তাঁর এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একাধিক যুক্তি দর্শান। কোচবিহারের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত হলেও ১৭৭২ খৃঃ চুক্তি এবং তার পূর্বাপর কারণ ভুটিয়াদের

সংগে বিরোধ, সীমানা বিরোধ, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ে রয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে আছে এখানকার ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায় বিষয়ক রূপরেখা। এখানে জমির শ্রেণী বিভাগ, কে কোন ধরনের জমির স্বত্ব ভোগ করে থাকেন তার বর্ণনা। রাজা, রাজ-পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এই জমির স্বত্ব বিষয়ে কতটুকু ক্ষমতা তারও বিবরণ পাওয়া যায়।

এককথায় বলতে পারি মেজর জেনকিন্স অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন সেই সময়কার কোচবিহারের প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক চালচিত্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই সংকলনকে জীবনদান করতে আমাকে একাধিক সাহিত্য রসিকের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। 'কোচবিহারের ইতিহাসে'র লেখক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবনী সংগ্রহে তাঁদের পরিবারের একাধিক ব্যক্তির সংগে পত্রালাপ করে শেষ পর্যন্ত তাঁর পৌত্র অনাথবন্ধু চক্রবর্তী, এম. এ. (অবসরপ্রাপ্ত আই. আর. এস.) মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও আমার দাবীকে উপেক্ষা করতে না পেরে তথ্যাদি পাঠিয়ে লেখক পরিচিতিকে সাবলীল করে তুলতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন।

'বেহারোদন্ত' গ্রন্থের ছন্দ অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং আমার পর্যালোচনা বিষয়ে সময় উপযোগী সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন এ. বি. এন. শীল কলেজের বাংলা সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ মিহিরকুমার মজুমদার। তাঁর সুচিন্তিত মতামতের জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

'বেহারোদন্ত' গ্রন্থের রচনাকাল নিরূপণে মধ্যযুগের সাহিত্যবিশারদ অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস মহাশয় নতুন আঙ্গিকে যে বিশ্লেষণ সূত্র দিয়েছেন তার জন্য আমি ধন্য।

'মহারাজ বংশাবলী' গ্রন্থ বিষয়ে অধ্যাপক ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় চাকুরী সূত্রে কোচবিহারে থাকাকালীন সময়ে একটি সার্বিক সুচিন্তিত মতামত লিখেছেন। তাঁর মূল্যায়ণ ও মতামত মূল গ্রন্থের সংগে সংযোজন করা হল।

ফ্রানসিস্ জেনকিন্সের প্রতিবেদনটি অনুবাদে সর্বশ্রী অজয় শঙ্কর সর্বাধ্যক্ষ, বিবেকভূষণ চট্টোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র রায় সহৃদয়তার সংগে সাহায্য করেছেন। তাঁদের স্নেহানুকুল্য না পেলে এই কঠিন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হত না। জেনকিন্সের দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি বহু কষ্ট স্বীকার করে সংগ্রহ করে দিয়েছেন কোচবিহার বিষয়ে অনুরাগী অধ্যাপক ডঃ শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু দে, ডঃ মৃণালকান্তি দাম, ডঃ কমলেশচন্দ্র দাস, শ্রীবিশ্বনাথ দাস আমার এই প্রস্তাবনা অংশকে পরিমার্জন, পরিবর্ধন বিষয়ে সানন্দে সাহায্যের হাত

প্রসারিত করেন। তাঁদের প্রতিনিয়ত উৎসাহে আমি সাহস পাই। অভিজ্ঞদের সুচিন্তিত ছাড়পত্র আমার আগামীদিনের পাথেয়।

গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন কবি-প্রাবন্ধিক শ্রীস্বপনকুমার রায়। আমার অনুজপ্রতিম সুহৃদকে গভীর স্নেহে জানাই আমার শুভেচ্ছা।

এই মালা গাথার পেছনে স্ত্রী হেলেনা পাল, কন্যা শুভশ্রী এবং পুত্র শুভজ্যোতি ও ছোট ভাই শ্রীবরুণচন্দ্র পাল সহ পরিবারের যে ত্যাগ স্বীকার, উদারতা ও সহযোগিতা রয়েছে সে কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

নানা অসুবিধে সত্বেও আমার এই সংকলনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে সুধী পাঠক এবং কোচবিহার অনুরাগীদের হাতে তুলে ধরতে এগিয়ে আসেন আমার শুভৈষী অণিমা প্রকাশনীর শ্রীদ্বিজদাস কর এবং শ্রীজগবন্ধু সাহা।

পরিশেষে কোচবিহারের প্রাচীন কথার দলিলগুলি হারিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। এই উদ্যোগ সমাদৃত হলে আমার দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে বলে মনে করি।

নৃপেন্দ্রনাথ পাল

হাজরা পাড়া
কোচবিহার।
রাস পূর্ণিমা, ১৪০০

কোচবিহারের ইতিহাস

যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৮৮৩



যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী

কোচবিহারের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

রাজ্য কোচবিহারের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নস্থিত ব্রিটিষাধিকৃত ভোটান্ত প্রদেশ; পূর্ব্ব সীমা আসামান্তর্গত ধুবড়ী জেলা; দক্ষিণ সীমা রঙ্গপুর; এবং পশ্চিম সীমা জলপাইগুড়ী। এই রাজ্য ২৫°, ৫৭', ৪০", এবং ২৬°, ৩২', ৩০" উত্তর অক্ষাংশে সংস্থিত; পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৮°, ৪৭', ৪০" হইতে ৮৯°, ৫৪', ৩৫" পর্য্যন্ত। ইহার ভূমি পরিমাণ ১৩০৭ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৬০২৬২৪; তন্মধ্যে ৩১১৬৭৮ পুরুষ ও ২৯০৯৪৬ স্ত্রীলোক। রাজস্ব প্রায় ১৪০০০০০ টাকা। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ এখনও পতিতাবস্থায় আছে; কেবল তিন অংশের দুই-অংশ মাত্র কর্ষিত হইয়াছে।

॥ প্রাকৃতিক অবস্থা ॥

কোচবিহার রাজ্যের আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত আলম্বিত অলাবু সদৃশ। ইহা একটী সুবিস্তীর্ণ-সমতল ক্ষেত্র; ইহার মধ্যে কোন পর্ব্বত বা প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি নাই। গগণ-স্পর্শী তুষারাবৃত হিমাচল পর্ব্বত শ্রেণী এই রাজ্যের উত্তরে বিরাজমান, সুতরাং এখানে পর্ব্বত নিঃসৃত বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদ নদীর অভাব নাই। রাজ্যান্তর্গত ভূমি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ক্রমে নিম্ন হওয়াতে প্রখর গতি নদ নদী সমূহ পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র নদ নদীই কার্ত্তিক হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ছয় মাস কাল প্রায় শুষ্কাবস্থায় থাকে। বৈশাখের শেষ ভাগ হইতে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গরাজী ঘন নীল নীরদ-মালায় পরিবেষ্টিত হইতে থাকে। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতিত হয়, এবং নদ নদী সকল নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া মহাবেগে ধাবিত হইয়া থাকে; তখন বালুকা মিশ্রিত ভূমি ভাগ সরস হইয়া উঠে, ও নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জে সমুদয় প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

কোচবিহারের ভূমি শস্য শালিনী ও উর্ব্বরা। মৃত্তিকা বালুকা মিশ্রিত বশতঃ কঠিন নহে, সুতরাং কর্ষণ-কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে নানাবিধ ধান্য, কোষ্টা, সর্ষপ, ও অত্যুত্কৃষ্ট নানা জাতীয় তামাকু প্রধান। কোচবিহারের তামাকু বহুল পরিমাণে নারায়ণগঞ্জে প্রেরিত হইয়া থাকে; তথা হইতে মঘেরা আপন দেশে লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কোচবিহার হইতে তামাকু ও কোষ্টা অধিক পরিমাণে মারোআড়ী ও অন্যান্য মহাজন কর্ত্তৃক অন্যত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

॥ নদ ও নদী ॥

কোচবিহারের ক্ষুদ্র নদ নদীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র প্রধান; যথা:—(১) ত্রি স্রোতা (তিস্তা), (২) সিঙ্গিমারী, (৩) কালজানী, (৪) তোরসা বা ধল্লা, (৫) গদাধর, এবং (৬) রায়ডাক। এই ছয়টী নদীতে বৎসরের সকল সময়েই নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

১। তিস্তা নদী তিব্বৎ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে।

ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১৫৬॥ ক্রোশ[১] ; তন্মধ্যে তিব্বৎ দেশে ১০ ক্রোশ ; সিকিমে ৪৮॥ ক্রোশ ; সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৫ ক্রোশ ; ভুটান ও দারজিলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ১০ ক্রোশ ; ভুটান ও জলপাইগুড়িতে ২২॥ ক্রোশ ; অত্র রাজ্যে ৪ ক্রোশ ; ও রঙ্গপুর জেলায় ৫৫ ক্রোশ। বর্ষার প্রারম্ভে ইহার বেগের পরিসীমা থাকে না। নদীর গর্ভ প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ, ও জল অত্যন্ত পরিষ্কার ও শীতল।

২। সিঙ্গিমারী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিশ্রিত হইয়াছে। এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই নদীর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে ; যথা,—মুজনাই, ডানকানা, জলধাক্কা ও মানসাই।

৩। তোরসা বা ধল্লা হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দুর্গাপুরের নিকট সিঙ্গিমারীর সহিত একত্র হওত উভয়ে এক ধারে ব্রহ্মপুত্রে মিশ্রিত হইয়াছে। ইহারই শাখা নদী বুড়া তোরসা। কোচবিহার নগর এই বুড়া তোরসার তীরে অবস্থিত।

৪। কালজানী ভুটান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিলিত হওত ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

৫। বড় গদাধর হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত ও অন্যান্য নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

৬। রায়ডাক হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া কালজানী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পরে শোণকোশ নাম ধারণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কোচবিহারে কোনরূপ বৃহদায়তন বিশিষ্ট নৈসর্গিক সরোবর বা হ্রদ নাই। ইহার মৃত্তিকা বালুকা মিশ্রিত হওয়ায় নদীর গতি সহজেই পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং খিলের ন্যায় জলাশয় অনেক বিদ্যমান আছে ; ইহাদিগকে ছড়া বলে। রাজধানী কোচবিহার নগর তিনদিকেই নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার লোক সংখ্যা ৯৫৩৫। নগরটি বহু সংখ্যক ইষ্টক-২য় প্রশস্ত রাজপথে পরিপূর্ণ। কোন কোন রাস্তার উভয় পার্শ্ব বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। নগর মধ্যে বৃহদায়তন অনেক দীর্ঘিকা আছে ; তন্মধ্যে সাগরদীঘী সর্ব্ব প্রধান। ইহার চতুষ্পার্শ্বে পরম রমণীয় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। তদভ্যন্তরেই যাবতীয় কাছারী, অফিস, ট্রেজারী, বিদ্যালয়, ছাপাখানা, পুস্তকালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত আছে। রাজধানীতে বহু ইষ্টক নির্ম্মিত দোকান আছে ; সম্প্রতি দৈনিক বাজারের নিমিত্ত রাজ্য সরকার হইতে বহু ব্যয়ে লৌহময় গৃহশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নগরের অন্যান্য স্থান জেলখানা, আর্টিজান-স্কুল, পুলিশ ষ্টেসন, পুলিশ ও মিলিটারী লাইন্স, ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বাটীতে সুশোভিত। নগরের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ অন্তরে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান, সেই স্থানটীর নাম নীলকুঠি। ইহা নানারূপ সুদৃশ্য বৃক্ষরাজীতে ও প্রশস্ত রাজপথে পরিশোভিত।

॥ অধিবাসী ॥

কোচবিহারের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী ও মুসলমান। রাজবংশীর সংখ্যা মুসলমান হইতে তিনগুণ অধিক। এতদ্ব্যতীত কোচ, মেচ, গারো,

১। ক্রোশ—পথের পরিমাণ, ৮০০০ হাত, দুই মাইলের মত।

দোভাবীয়া, মোড়ঙ্গিয়া প্রভৃতি, এবং আর্য্য বংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও কায়স্থেরও বসতি আছে। সম্প্রতি ১৮৮১ সালে যে লোকসংখ্যা হইয়া গিয়াছে, তদনুসারে ভিন্ন জাতীয় লোক দিগের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হিন্দু………	৪২৭৪৭৮
মুসলমান ………	১৭৪৫৩৯
খৃষ্টিয়ান………	৪৮
জৈন…………	১৬৪
সাঁওতাল………	১৯
আদিম জাতীয়…	৩৯৬

॥ জলবায়ু ॥

কোচবিহারের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। ইহার নদনদী ও জলাশয় সকল প্রস্তর খণ্ড ও বালুকা কণায় পরিপূর্ণ থাকাতে, জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুস্বাদু। অল্প খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, কূপ সংখ্যা অত্র রাজ্যে অধিক ; কূপের জলও প্রায় পরিষ্কার। এখানে দক্ষিণ ও উত্তর বায়ু অতি বিরল। পূর্ব্ব বায়ুই প্রায় সদা সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া থাকে ; ইহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। বসন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মধ্যে মধ্যে পশ্চিম হইতে বায়ু বহিয়া থাকে ; সেই বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর।

শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই কয় ঋতু ব্যতিরেকে এ স্থানে অন্য কোন ঋতুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শীত ঋতুর আধিকার, এবং চৈত্র হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রাদুর্ভাব থাকে। বৈশাখের শেষে আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে বহুল পরিমাণে বৃষ্টি হয়। বোধহয় বঙ্গদেশের, অথবা সমস্ত ভারতবর্ষের কোন স্থানেই এত অধিক বৃষ্টি পতিত হয় না। গড়ে প্রতি বৎসর ১২৫ ইঞ্চি জল হইয়া থাকে। কিন্তু এই রাজ্যের ভূমি অত্যন্ত উচ্চ ও ব্রহ্মপুত্র নদের দিকে ক্রমে নিম্ন জন্য, বৃষ্টি হইবা মাত্র অতি অল্প কাল মধ্যেই জলরাশি ব্রহ্মপুত্রে চলিয়া যায়। অবিশ্রান্ত ১৫ দিবস বৃষ্টির পর দুই দিবস কাল মাত্র রৌদ্র হইলেই এখানকার রাস্তা ঘাট শুষ্ক হইয়া যায়। বঙ্গদেশের ন্যায় কোচবিহারে কোন স্থানেই বৃষ্টির জল দীর্ঘকাল স্থির হইয়া থাকে না।

॥ জীবজন্তু ॥

কোচবিহারের কোনরূপ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষবিশিষ্ট সুবিস্তীর্ণ অরণ্য নাই। নল, খগড়া, কেশে প্রভৃতির মধ্যেই অত্র রাজ্যস্থ বন্য জন্তুর আবাস স্থান। হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেণীর নিম্ন প্রদেশস্থ সুবিস্তীর্ণ শালবন ইহার উত্তরাংশে অবস্থিত। সুতরাং সর্ব্ব প্রকার বন্য জন্তু এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। নানা জাতীয় ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক, হরিণ, প্রভৃতি জন্তুতে অরণ্য পরিপূর্ণ থাকে। কোচবিহারের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত অপেক্ষাকৃত জঙ্গলময়। এই স্থানেই রাজ্যেশ্বর মহারাজ স্বীয় বন্ধুবর্গ সহিত প্রতি শীত ঋতুতে মৃগয়া করিয়া থাকেন। এখানে মৎস্য অতি বিরল। শীতকালে ব্রহ্মপুত্র হইতে নানা জাতীয় মৎস্য ধীবরগণ কর্তৃক এখানে আনীত হয় বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, ও বহুদূর হইতে

আনীত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ বিস্বাদ হইয়া যায়। এখানে দুই তিন প্রকার নূতন মৎস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাদের নাম পুঠিতর, শিল-ঠোকা, চোঙাতর প্রভৃতি।

॥ শিল্প ॥

শিল্প কার্য্যে কোচবিহারবাসীগণের বিশেষ দক্ষতা দৃষ্ট হয় না। নূতন শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এ প্রদেশে কেবল এণ্ডি নামক কাপড়, ও মেখলি নামক চট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এণ্ডি এক রূপ সামান্য মোটা রেশম, তদ্দ্বারা অত্রস্থ আপামর সাধারণ সমুদায় লোক আপন আপন ব্যবহার জন্য গাত্রাবরণ করিয়া থাকে। এই স্থানে বাঁশ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বাঁশের দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের সমুদায় কার্য্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাসগৃহ, শয়নের খাট, বসিবার চৌকী, কেদারা, মোড়া, পিঁড়ি, শস্য রাখিবার পাত্র, তৈলাধার, দুগ্ধাধার প্রভৃতি সকলই বাঁশের নির্ম্মিত।

॥ বাণিজ্য ॥

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ধান্য, তামাকু, কোষ্টা ও সর্ষপ এ দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই সমুদায় দ্রব্য বহুল পরিমাণে অন্য দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং নানা-বিধ বস্ত্র, লবণ, বাসন, মসলা, প্রভৃতি স্থানান্তর হইতে অত্র রাজ্যে আনীত হয়। যে সকল দ্রব্য প্রতি বৎসর স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, তাহার আনুমানিক মূল্য পঞ্চদশ লক্ষ টাকা; ও যে সকল দ্রব্য অত্র রাজ্যে আনীত হয়, তাহার মূল্য অনুমান ১০ লক্ষ টাকা হইবে। রেলওয়ে দেশের মধ্যে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত হওয়ায় দেশের লোকের ও বাণিজ্যের উন্নতি দিনদিনই সংসাধিত হইতেছে। কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম[১] নির্ম্মিত হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই রাজ্যের বাণিজ্য বন্দর মধ্যে কোচবিহার নগর, মাথাভাঙ্গা, হলদীবাড়ী, শিবপুর, চওড়াহাট, বলরামপুর ও ভইশখুচি সর্ব্বপ্রধান।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশ অত্র রাজ্যে স্বাধিকার স্থাপন করিবার পূর্ব্বে এ প্রদেশ কিয়ৎকাল অরাজক অবস্থায় ছিল। পাল বংশীয় রাজগণের রাজ্য শেষ হইলে রাজা নীলধ্বজ অত্র রাজ্যে অধিকার স্থাপন করেন। তাঁহার পর চক্রচন্দ্র, ও তৎপরে নীলাম্বর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইঁহার অন্যতর নাম কান্তেশ্বর ছিল। কোচবিহার নগরের দক্ষিণে ছয় ক্রোশ দূরে গোসানীমারী নামক স্থান ইঁহার রাজধানী ছিল। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে যবন সেনানী হোসেন শাহ কর্ত্তৃক কান্তেশ্বরের রাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কান্তেশ্বরের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণের হৃদয় বিকলিত ও নয়নাশ্রু আকৃষ্ট করিতেছে। গোসানীমারীর অপর নাম কান্তপুর। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নগরের মধ্য দিয়া সিঙ্গিমারী নদী প্রবাহিতা হইয়া রাজধানীর পুরাতন কীর্ত্তিসমূহ কতক বিনষ্ট করিয়াছে। নগরের চিহ্ন ও তদ্ভগ্নাবশেষ বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক অবলোকন করিলে

১। রাজবর্ত্ম—রাজপথ।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নগরের পরিধি অন্যূন ১০ ক্রোশ ছিল। নগরের এক দিকে ধল্লা নদী, ও অপর সমুদয় ভাগ মৃন্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীর, ও তদুভয় পার্শ্বস্থ সুগভীর পরিখা দ্বয় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীরের নিম্নভাগ একশত ত্রিশ ফুট প্রশস্ত; উহার উচ্চতা ত্রিশ ফুট। প্রাচীরের উপরি ভাগে সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে ইষ্টকরাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধহয় মৃন্ময় প্রাচীরের উপরে অত্যুচ্চ একটী ইষ্টকময় প্রাচীরও নির্ম্মিত ছিল। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে যে পরিখা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা প্রায় ২৫০ ফুট প্রশস্ত। এ নগরে প্রবেশের তিনটী মাত্র দ্বার ছিল। সেই তিনটী দ্বার অদ্যাপি বাগদুয়ার, জয়দুয়ার, ও হোকোদুয়ার নামে বিখ্যাত আছে। দ্বার সকল ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল; অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

নগরের মধ্যস্থলে রাজবাটী ছিল। ঐ স্থান অদ্যাপি রাজপাট নামে খ্যাত। ইহা চতুষ্কোণ, এবং ৬০ ফুট গভীর একটী পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানে অদ্যাপি ছোট বড় বহু সংখ্যক দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক ইষ্টক স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। বৃহদায়তনের প্রস্তর খণ্ডেরও অভাব নাই।

বাগদুয়ারের নিকটেই গৌরিপাট নামক একটী স্থান আছে, তাহা প্রস্তর নির্ম্মিত। তথায় মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে অনেক দীর্ঘিকা আছে; তাহার তীর ও সোপান সকল ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। নগরের মধ্যে এবং বহির্ভাগে বহুসংখ্যক সুপ্রশস্ত ও উচ্চ রাজপথ বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী রাস্তার দুই পাশে প্রস্তরময় দেবদেবীর নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। কোন মূর্তির নাসিকা, কাহারও বাহু, কাহারও বা বক্ষঃস্থল অথবা পদদ্বয় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় ইতর লোকে এই সমস্তকে নাক-কাটা নাক-কাটী বলে।

।। তৃতীয় খণ্ড ।।

বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক কোচবিহারে রাজ্য সংস্থাপন।

।। প্রথম অধ্যায় ।।

১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে যবন সেনাপতি হোসেন শাহ কর্তৃক কান্তেশ্বরের রাজ্য ধ্বংশ হইলে, ১৪ বৎসর কাল কোচবিহার প্রদেশ অরাজক অবস্থায় ছিল। পরে হাজো নামক কোচ বংশীয় কোন বীরপুরুষ কামরূপের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। হাজো কীর্ত্তিমান লোক ছিলেন। কামাখ্যার মন্দিরের অনতিদূরে অদ্যাপি তাঁহার একটী মন্দির বর্ত্তমান আছে। হীরা ও জীরা নাম্নী হাজোর দুইটী কন্যা ছিল। মেচ জাতীয় হাড়িয়া নামক কোন এক প্রধান দলপতির সহিত ঐ কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়। জীরা জ্যেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে, হাড়িয়ার ঔরষে, চন্দন ও মদন নামে দুই পুত্র জন্মে। হীরা কনিষ্ঠা, তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নাই। কথিত আছে যে যোগী-বেশ-ধারী মহাদেবের ঔরষে শিষ্যসিংহ ও বিশ্বসিংহ নামে হীরার দুই পুত্র জন্মে। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বিশ্বসিংহকে হনুমান দণ্ড প্রদান করেন। হনুমান দণ্ড অদ্যাপি কোচবিহারের রাজবাটীতে সাদরে রক্ষিত হইতেছে, ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ইহার পূজা হইয়া থাকে। বিশ্বসিংহ রাজ্য লাভ করার পর, চিকনা পর্ব্বতবাসী অষ্টগ্রামের অধিপতি তুর্ক

কোতোয়ালের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে মদন নিহত হইয়াছিলেন। পুত্র বিয়োগ বিধুরা বিমাতার কথঞ্চিৎ শোকাপনয়ণার্থ বিশ্বসিংহ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চন্দনকে শকাব্দা ১৪৩২, বঙ্গাব্দা ৯১৭, ও ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্য ভার প্রদান করেন। এই সময় হইতেই কোচবিহারের রাজশকের গণনারম্ভ হইয়াছে। বিশ্বসিংহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি সমগ্র কামরূপে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ভোটানাধিপতি তাঁহার পরাক্রমে ভীত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন। অষ্টম হেনরী যে সময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, ইব্রাহিম যে সময়ে দিল্লীর সম্রাট, নসিরৎসাহ যে সময়ে গৌড় নগরে বঙ্গাধিপের আসনে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্বসিংহ আসামের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে জলপাইগুড়ির পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশ জয় করিয়া স্বাধিকার সংস্থাপন করেন।

॥ চন্দন ॥

রাজশক ১—১২; খৃঃ ১৫১০—১৫২২

১৩ বৎসর।

বিশ্বসিংহ যে রূপে চন্দনকে রাজ্য ভার প্রদান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। চন্দন নামমাত্র রাজা ছিলেন; রাজকার্য্য সমুদায় বিশ্বসিংহই সম্পাদন করিতেন। কামরূপের শাসনকর্ত্তার তিন কন্যা ছিল; চন্দন তাঁহার এক কন্যাকে, বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ অপর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দন ১৩ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ৪০ বৎসর বয়ক্রম সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

॥ বিশ্বসিংহ ॥

১৩—৪৩; ১৫২৩—১৫৫৩

৩১ বৎসর।

চন্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিশ্বসিংহ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রথমে সিংহাসন প্রস্তুত করেন, এবং ইঁহার রাজদণ্ডের উপর হনুমানের মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার সময় তাঁহার বয়স ২২ বৎসর ছিল। তাঁহার ভ্রাতা শিষ্যসিংহ রায়কত উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অভিষেক সময়ে ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বিজনী, বিদ্যাগ্রাম, বিজয়পুর প্রভৃতি প্রদেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণ করিয়াই ইনি ভোটানাধিপতিকে কর প্রদান করিতে আদেশ করেন। ভোটানাধিপতি দেবরাজ ইঁহার আদেশ অবমাননা করাতে ভোটানাক্রমণার্থ ইনি সজ্জীভূত হন। তৎশ্রবণে দেবরাজ ভীত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি গৌড় পরাজয় কামনায় সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছিলেন; এবং জলপাইগুড়ির পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া উক্ত প্রদেশ সাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে স্বীয় ভ্রাতা শিষ্যসিংহ রায়কতকে বৈকুণ্ঠপুরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের তিন পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ, মধ্যম নরনারায়ণ, এবং কনিষ্ঠ চিলারায়। নরনারায়ণের অপর নাম মল্ল-নারায়ণ, ও চিলারায়ের অন্য নাম

শুক্লধ্বজ ছিল। বিশ্বসিংহ চিকনা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশে হিঙ্গলাবাস নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপন করেন।

॥ নরনারায়ণ ॥

৫৩—৮৫; ১৫৫৪—১৫৮৬

৩২ বৎসর।

রাজা নরনারায়ণ ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। কথিত আছে যে, সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহ রাজা হইবেন স্থিরীকৃত হইয়া তাহার উদ্যোগ হইতেছিল; এমত সময়ে নরনারায়ণের স্ত্রী উপস্থিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সম্পাদনান্তে তিনি যখন তাঁহাকে প্রণাম করেন, "আপনি রাণী হইবেন", এই কথা বলিয়া নৃসিংহ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাজা হইলে তাঁহার আশীর্ব্বচন মিথ্যা হইবে। এই কথা স্মরণ করত নৃসিংহ রাজত্ব গ্রহণ না করিয়া তদীয় কনিষ্ঠ নরনারায়ণকে সিংহাসনে উপ-বেশন করাইলেন। রাজা নরনারায়ণ স্ব-নামে মুদ্রা খোদিত করিয়া তাহার প্রচলন করেন। ইহারই নাম নারায়ণী টাকা; এই মুদ্রাই নারায়ণী টাকা বলিয়া খ্যাত হয়। খৃঃ ১৮৬৫ পর্য্যন্ত নারায়ণী টাকা অত্র রাজ্যে প্রচলিত ছিল। টাকার একদিকে তাঁহার নিজ নাম অঙ্কিত হয়, ও অপর দিকে দেবনাগর অক্ষরে মহাদেবের নাম খোদিত হয়। রাজা নরনারায়ণ প্রথমে স্ব-নামে মোহর অঙ্কিত করিয়া প্রচলন করেন। ইনি দুইটী মোহর প্রস্তুত করেন; একটীতে স্বীয় নাম ও অপরটীতে কেবল সিংহ মূর্ত্তি ছিল। ইহাকে সিংহছাপ বলিতেন। তাঁহার যাবতীয় অনুজ্ঞা সিংহছাপে প্রচারিত হইত। ইনি সমগ্র আসাম এবং গৌড়ের কতক অংশ পরাজয় করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ আসাম পরাজয় করিয়া আসাম অধিপতির রাজ-ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ছত্র অদ্যাপিও কোচবিহারের রাজাদিগের অন্যতর রাজ-সজ্জা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় বা শুক্লধ্বজ অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অনেক নূতন প্রদেশ কোচবিহার রাজ্যভুক্ত করেন। ইঁহারই বাহুবলে গঙ্গানদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের সীমা বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

কোচবিহারের সাত ক্রোশ পূর্ব্বে রাণীরহাটের সন্নিকটে অদ্যাপি কতকগুলি গড় ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানকে 'চিলারায়ের কোট্' বলে। রাজা নরনারায়ণও স্বয়ং যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার অন্য নাম মল্ল-নারায়ণ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহারই সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "রত্নমালা" নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। অদ্যাপি কোচবিহার ও আসাম প্রদেশে এই ব্যাকরণ প্রচলিত আছে। ইনি কামরূপ হইতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া খাগড়াবাড়া, ময়নাগুড়ি প্রভৃতি পঞ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং প্রত্যেকের ভরণ-পোষণার্থ নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। হিন্দুধর্ম্মেও ইঁহার বিলক্ষণ মতিগতি ছিল। কামাখ্যার বর্ত্তমান মন্দির ইঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবীর নিত্য সেবার্থ ইনি নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে অদ্যাপিও ইঁহার, ও ইঁহার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের গাত্র দেশে প্রস্তরোপরি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে। রাজা মল্লনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ আসাম পরাজয় করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ ঐ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

রাজা নরনারায়ণ আসাম পরাজয় করিয়া বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা শোণ-কোশ নদ হইতে তৎপূর্ব্ব প্রদেশসমূহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজকে প্রদান করেন। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিতনারায়ণ ও বলিতনারায়ণের উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি বিজনী ও দুরঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহনারায়ণের পুত্রগণের ভরণ-পোষণার্থ ইনি পাঙ্গার রাজ্য তাঁহাদিগকে সমর্পণ করেন। তাঁহাদের বংশ কালবশে লোপপ্রাপ্ত হইয়া পাঙ্গার রাজ্য তদীয় দৌহিত্র সন্তানগণের উপভোগ্য হইয়াছে। ইনি তেত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করত মানব লীলা সম্বরণ করেন।

॥ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥

৮৫—১১৮ ; ১৫৮৭—১৬২০

৩৪ বৎসর।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীর সিংহসনে আকবরসাহ উপবিষ্ট ছিলেন, এবং রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আকবরের অন্যতর সেনাপতি আলিকুল খাঁ গৌড় রাজ্য পরাজয় করেন। তাঁহার সৈন্যেরা কোচবিহারের অধিকার মধ্যেও নানারূপ অত্যাচার করে। লক্ষ্মীনারায়ণ বিলাস পরতন্ত্র ছিলেন ; স্বয়ং কোন যুদ্ধে গমন করিতেন না। তাঁহার সৈন্যেরা প্রায়সই যবন সেনার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিল, এবং রাজ্য বিনষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। পরে তিনি বাধ্য হইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরসাহ দিল্লীর বাদসাহ ছিলেন। সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সৈন্য তাঁহার রাজ্যে আর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, সম্রাট এইরূপ আদেশ প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রতিশ্রুত হইতে হইয়াছিল যে, তিনি আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ নারায়ণী টাকা আর প্রচলন করিবেন না। এই সময় হইতে সম্পূর্ণ নারায়ণী টাকা উঠিয়া গিয়া নারায়ণী আধুলী (অর্দ্ধ মুদ্রা) প্রচলিত হইল।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ১৮টী পুত্র ছিল ; তন্মধ্যে বীরনারায়ণ মহারাণীর গর্ভ সম্ভূত। রাজা তদীয় ১৮ পুত্রের বাস নিমিত্ত ১৮টী ভিন্ন ভিন্ন বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই স্থান অদ্যাপি "আঠার কোটা" নামে খ্যাত। ইনি তদীয় তৃতীয় পুত্র মহীনারায়ণকে নাজীরদেব অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৩৪ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ১৬২০ খৃঃ অব্দে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বর্গারোহণ করেন।

॥ বীরনারায়ণ ॥

১১৯—১২৩ ; ১৬২১—১৬২৫

৫ বৎসর।

১৬২১ খৃঃ অব্দে রাজা বীরনারায়ণ পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইঁহার অভিষেক সময়ে রায়কত অনুপস্থিত থাকা হেতু মহীনারায়ণ-কুমার ছত্র ধারণ করিয়া-

ছিলেন। বীরনারায়ণের রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ভোটানাধিপতি কর ও উপঢৌকন প্রদান রহিত করেন। রাজা একান্ত বিলাসপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর কোন বাক্যব্যয় করিলেন না। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন।

॥ প্রাণনারায়ণ ॥

১২৪—১৬২ ; ১৬২৬—১৬৬৪

৩৯ বৎসর।

১৬২৬ খৃঃ অব্দে রাজা প্রাণনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সময় কোচবিহারে সংস্কৃত ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়াছিল। ইনি পঞ্চরত্ন নামক এক সভা সংস্থাপন করেন। কবিরত্ন ও কবিভূষণ নামক দুইটী প্রধান পণ্ডিত এই সভার অধ্যক্ষতা করিতেন। ইঁহার সভাসদ্‌বর্গ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং রাজা নিরন্তর শাস্ত্রালোচনায় দিন যাপন করিতেন। ইনি জল্পেশ্বরে, গোসানী-মারীতে, বাণেশ্বরে এবং সিদ্ধেশ্বরী নামক স্থানে দেবমন্দির সংস্থাপন করেন। ইঁহার সভায় গায়কদিগের বিশেষ সমাদর ছিল, এবং ইনি সংগীত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি নির্ব্বিবাদে ও পরমসুখে ৩৯ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। প্রাণনারায়ণ দীর্ঘকাল পীড়িত থাকাতে দেশ মধ্যে জনরব হইয়া উঠিয়াছিল যে, মহারাজার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ইহাতে মহীনারায়ণ নাজিরদেব তাঁহার ৪ পুত্র রূপনারায়ণ, জগৎনারায়ণ, যজ্ঞনারায়ণ, এবং চন্দ্রনারায়ণ সহ, রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে নিকটে আনয়নার্থ কবিরত্ন ও কবিভূষণকে প্রেরণ করিলেন। মহীনারায়ণ, পণ্ডিতদ্বয়কে দেখিবা মাত্র, তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহার ৩ দিন পরেই মহারাজ মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহীনারায়ণের ৪ পুত্র সিংহাসন অধিকার করণার্থ ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করে। মহীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া প্রাণনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মোদনারায়ণকে স্বয়ং ছত্র ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। মোদনারায়ণের নামে মুদ্রা প্রস্তুত ও মোহর অঙ্কিত হইল।

॥ মোদনারায়ণ ॥

১৬১—১৭৬ ; ১৬৬৪—১৬৭৯

১৫ বৎসর।

রাজা মোদনারায়ণ ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহীনারায়ণ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করিয়া তাঁহার নিজের সমুদয় লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; সুতরাং মোদনারায়ণ নামমাত্র রাজা হইলেন। মহীনারায়ণের আদেশ মতেই রাজকার্য্য চলিত। সম্যক প্রকারে ক্ষমতাবিহীন রাজা হইয়া মহী-নারায়ণ কিছু দিন অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন। পরে অকস্মাৎ এক দিবস মহীনারায়ণের নিযুক্ত কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করেন। ক্রোধ পরবশ হইয়া মহীনারায়ণ ও তাঁহার ৪ পুত্র সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে

তুমুল সংগ্রাম হইল। সংগ্রামে মহীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনারায়ণ প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে ঈশ্বর কৃপায় মোদনারায়ণ জয় লাভ করিলেন। মহীনারায়ণ ভগ্না-ভিভূত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার ৩ পুত্র ভুটানে পলায়ন করিল। মহীনারায়ণকে ধৃত করার জন্য রাজা স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। বৈকুণ্ঠপুরে মহীনারায়ণ ধৃত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রত্রয় ভুটিয়াগণের সাহায্যে বিহার আক্রমণ করিল। দুই তিন বার যুদ্ধ হইয়া অবশেষে তাহারা সম্যক রূপে পরাস্ত হইল। ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া মোদনারায়ণ মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বিশ্বসিংহের বংশ এই হইতেই লোপ প্রাপ্ত হয়।

॥ বসুদেবনারায়ণ ॥

১৭৬—১৭৭ ; ১৬৮০—১৬৮১

২ বৎসর।

রাজা মোদনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজকর্ম্মচারীগণ ইতি কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠপুরে রায়কতকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই গোঁসাই মহীনারায়ণের পুত্রত্রয় ভুটিয়াগণের সাহায্যে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অনেকের প্রাণবধ করে; এবং রাজার ছত্রদণ্ড, সিংহাসন, তরবারি প্রভৃতি অপহরণ করে। রাজা প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বসুদেবনারায়ণ, এবং ইঁহার পুত্র মাননারায়ণ ভয়ে দক্ষিণ দেশে পলায়ন করিলেন। গোঁসাই মহীনারায়ণের পুত্রত্রয় প্রত্যেকেই রাজা হইতে সচেষ্ট হইল। ইতিমধ্যে রায়কত সসৈন্যে রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মহীনারায়ণের পুত্রেরা প্রাণভয়ে ভুটিয়াগণ সহিত পর্ব্বত প্রদেশে পলায়ন করিল। রায়কত শত্রুদিগের সাক্ষাৎ না পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন; পরে বসুদেবনারায়ণকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া বৈকুণ্ঠ-পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় মহীনারায়ণের পুত্রগণ রাজ্য আক্রমণ করিল। বসুদেবনারায়ণ সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্যকরূপে পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। রায়কতেরা এই সংবাদ শ্রবণে পুনরায় সসৈন্যে রাজধানীতে উপস্থিত হইল, এবং বসুদেবনারায়ণের ভ্রাতুষ্পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

॥ মহেন্দ্রনারায়ণ ॥

১৭৭—১৮৮ ; ১৬৮২—১৬৯৩

১২ বৎসর।

১৬৮২ খৃঃ অব্দে রাজা মহেন্দ্রনারায়ন রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন; তৎকালে তিনি পঞ্চম বৎসরের শিশু ছিলেন। রাজকর্ম্মচারীগণের হস্তে যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তৎকালে রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটে; মোগল সম্রাট পূর্ব্ব ভাগ, পাটগ্রাম, ও বোদা, এই পরগণাত্রয় অধিকার করেন; এবং কাকিনিয়া, কাজিরহাট, টেপা প্রভৃতির শাসনকর্ত্তাগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যবনরাজের বশ্যতা স্বীকার করত

সনন্দ গ্রহণ করে। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দে মানব লীলা সম্বরণ করেন।

॥ রূপনারায়ণ ॥

১৮৫—২০৫ ; ১৬৯৪—১৭১৪

২০ বৎসর।

১৬৯৪ খৃঃ অব্দে—১৮৫ রাজশকে—রাজা রূপনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি গোঁসাই মহীনারায়ণের পৌত্র। ইঁহার রাজ্যাভিষেক হওয়ার পর ইনি শিশুনারায়ণকে নাজিরের পদে, এবং সত্যনারায়ণকে দেওয়ানের পদে মনোনীত করিলেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে পরগণা পূর্ব্ব ভাগ, বোদা, এবং পাটগ্রাম, যাহা যবন সম্রাট অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পুনরুদ্ধারার্থ তিনি যুদ্ধ করত অকৃতকার্য্য হন ; এবং ঢাকার নবাব জবরদস্ত খাঁকে কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন। রাজা রূপনারায়ণ বিংশতি বৎসর রাজত্ব করত ১৭১৪ খৃঃ অব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই রাজাই বিখ্যাত মদনমোহনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

॥ উপেন্দ্রনারায়ণ ॥

২০৫—২৫৪ ; ১৭১৪—১৭৬৩

৪৯ বৎসর।

১৭১৪খৃঃ অব্দে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে ভোটরাজ নির্ব্বিবাদে ভোটান্ত প্রদেশ অধিকার করেন। মহারাজের কোন সন্তানাদি না হওয়াতে তিনি সত্যনারায়ণ দেওয়ানদেবের পুত্র দিনরায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু দিনরায় রাজার জীবিতাবস্থায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্য তদানীন্তন ঢাকার সুবেদারের সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং কোচবিহার আক্রমণার্থ অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার ধলুয়াবাড়ী রাজধানীতে মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী সহমরণ গমন করিয়াছিলেন।

॥ দেবেন্দ্রনারায়ণ ॥

২৫৪—২৫৬ ; ১৭৬৩—১৭৬৫

২ বৎসর।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ তদীয় পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম সময় রতি শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজবাটীর নিকটস্থ পদ্ম পুষ্করণীর তীরে তরবারির দ্বারা তাঁহাকে নিহত করে। রাণীগণ পুত্র শোকে অধীরা হন। ভোটরাজ এই হত্যাকাণ্ডে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত অত্যাচারের চক্রান্তকারী রামানন্দ গোস্বামীর প্রাণদণ্ড করেন, এবং কোচবিহার রাজ্য রক্ষার্থ জনৈক রাজ-প্রতিনিধি অত্র রাজ্যে প্রেরণ করেন।

॥ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ॥

২৫৬—২৬০ ; ১৭৬৫—১৭৭০

৫ বৎসর।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে খড়্গনারায়ণ দেওয়ানদেবের তৃতীয় পুত্র রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, নাজিরদেবের সহায়তাক্রমে, কোচবিহারের রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীবর্গের কুমন্ত্রণায় তদীয় দেওয়ান রামনারায়ণের বিনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হন; এবং তাঁহাকে এক দিবস রাজভবনে আহ্বান করত স্বহস্তেই তাঁহাকে বধ করেন। ভোটরাজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শ্রবণে, ও রাজার স্বেচ্ছাচারিতা অবলোকনে, অমাত্যবর্গসহ রাজাকে বন্দী করত ভোট রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

॥ রাজেন্দ্রনারায়ণ ॥

২৬১—২৬৩ ; ১৭৭০—১৭৭২

২ বৎসর।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভোটরাজের সাহায্যে বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যচ্যুত ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। ইনি দার পরিগ্রহ করিয়া সপ্তাহ কাল মধ্যেই মানব লীলা সম্বরণ করেন।

॥ ধরেন্দ্রনারায়ণ ॥

২৬৩—২৬৫ ; ১৭৭২—১৭৭৪

২ বৎসর।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে বন্দীকৃত রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তৎকালে অত্র রাজ্যে ভোটরাজের সম্পূর্ণ আধিপত্য হইয়াছিল। ভোটরাজ ইঁহাকে কোন মতেই রাজপদে স্থিরতর রাখিবেন না। কিন্তু তদানীন্তন নাজিরদেব স্বীয় ক্ষমতাবলে ইঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোটরাজ ইহাতে কুপিত হইয়া বহুবিধ সেনা লইয়া বিহার রাজ্য আক্রমণ করেন; এবং রাজভবনে শিবির সন্নিবেশিত করেন। নাজিরদেব কৌশলক্রমে শিশু রাজার হিত কামনায় রাজমাতা সহ বলরামপুর গ্রামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথায়ও ইঁহাদিগের বিপদাশঙ্কা দেখিয়া ব্রিটিষ রাজ্য পাঙ্গা প্রদেশে পলায়ন করিলেন। ভোট-সৈন্য একাদিক্রমে প্রায় সমস্ত বিহার রাজ্য নির্ব্বিবাদে অধিকার করিতে লাগিল। নাজিরদেব অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত একমত হইয়া তদানীন্তন ব্রিটিষ গভর্ণর জেনারেল ওআরেন হেষ্টিংস সাহেব সদনে রাজ্যোদ্ধারার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব কোচবিহার রাজ্য হইতে বার্ষিক নিয়মিত কর প্রাপ্ত হইলে সাহায্য করিবেন, এমত প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল, ও ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ দিবসে এক পক্ষে কোম্পানী বাহাদুর, অপর পক্ষে কোচবিহারের মহারাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ, এতদুভয় মধ্যে এই বিবরণে সন্ধি স্থাপিত হইল যে, কোম্পানী বাহাদুর নিঃসহায় রাজ্যভ্রষ্ট ও

বিপদাপন্ন রাজার রাজ্যোদ্ধারের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিবেন; মহারাজকে সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে; রাজ্যোদ্ধার হইলে মহারাজ কোম্পানী বাহাদুরের বশীভূত থাকিবেন, ও বর্ষে বর্ষে কোম্পানী বাহাদুরকে অর্দ্ধ রাজস্ব লালবন্দী স্বরূপ প্রদান করিবেন। ব্রিটিষ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অর্দ্ধ রাজস্বের যে পরিমাণ নিরূপিত হইবে, তাহা চিরন্তনের জন্য স্থিরতর থাকিবে; ভবিষ্যতে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইলেও তাহার ন্যূনাতিরেক কদাপি হইবে না। রাজার কোনরূপ বিপদ ভবিষ্যতে উপস্থিত হইলে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে রাজার সাহায্য করিবেন, কিন্তু সৈন্যের ব্যয় মহারাজকে দিতে হইবে। কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্ট কৌন্সেলের অধ্যক্ষ, এবং রাজার পক্ষ হইতে খগেন্দ্রনারায়ণ নাজিরদেব সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে কাপ্তেন জোন্স সাহেব ৪ কোম্পানী ইংরেজ সৈন্য সহ অত্র রাজ্যে উপনীত হইয়া অচিরে দুর্ব্বৃত্ত অসভ্য ভুটিয়াদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া বন্দী রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে কারা মুক্ত করত স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়া দিলেন। মহারাজ ধরেন্দ্র-নারায়ণ ২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

।। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ।।

২৬৫—২৭৪ ; ১৭৭৪—১৭৮৩

৯ বৎসর।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার কোচবিহারের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি এবার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্যে নিতান্ত ঔদাস্যভাব অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মহারাণী এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর দ্বারাই রাজ্য শাসনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। মহারাজ তদীয় রাজত্বের শেষ ভাগে বাতুল সদৃশ হইয়াছিলেন। ২৭৪ রাজশকে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ন মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

।। হরেন্দ্রনারায়ণ ।।

২৭৪—৩২৯ ; ১৭৮৩—১৮৩৮

৫৬ বৎসর।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজের উইল অনুসারে মহারাণী রাজমাতা, হরেন্দ্রনারায়ণ প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। নাজিরদেবও সমগ্র রাজ্যে স্বীয়াধিপত্য বিস্তার করিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন; ফলতঃ রাজমাতার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া স্বীয় ক্ষমতা রাজ্য মধ্যে প্রবল করিবার নিমিত্ত নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া কোন ফললাভ করিতে পারিলেন না। রাণীর হস্তে রাজ্যভার

ন্যস্ত থাকিলে গবর্ণমেণ্টের কর প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইবে, এই মর্ম্মে নাজিরদেব গভর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন। রাজ্যাভ্যন্তরস্থ সমস্ত গোলযোগের বিষয় অবগত হওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন স্মিথকে অত্র রাজ্যে প্রেরণ করেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন স্মিথ এস্থানে আগমন করত মহারাণী রাজমাতার ক্ষমতা স্থিরতর রাখিয়া রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপনার্থ ঘোষণা করিয়া গেলেন। নাজিরদেব তখন অগত্যা তাঁহার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর রাজমাতা বৈর-নির্যাতনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। তাঁহার আদেশক্রমে নাজিরদেব ও দেওয়ানদেবের সর্ব্বনাশ হইল। এমন কি, নাজিরদেব প্রাণভয়ে কামরূপ ক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন; ও তথা হইতে তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া বহুবিধ সৈন্য সংগ্রহ করত বিহার রাজ্য ও রাজভবন আক্রমণ করিলেন; এবং রাজমাতা, মহারাজ, ও সর্ব্বানন্দ গোস্বামীকে লইয়া গিয়া বলরামপুরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। রঙ্গপুরের কালেক্টর এই সংবাদ অবগত হইয়া কতিপয় সেনা প্রেরণ করত রাজা ও রাজমাতাকে শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া বিহারে পুনঃ প্রেরণ করিলেন, এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত করত রঙ্গপুরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। নাজিরদেব সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া পাটগ্রাম, বোদা ও পূর্ব্বভাগের উপস্বত্ব গ্রহণ করিতেন। কিন্তু রাজ্যের শান্তিরক্ষার ভার তৎকালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে নাজিরদেব উক্ত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন।

১৮০১ খৃঃ অব্দে মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং ব্রিটিষ তত্বাবধানও রহিত হইল। কিন্তু পুলীশের তত্বাবধানের ভার রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে ন্যস্ত থাকিল। মহারাজ হরেন্দ্র রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেন না; সুতরাং রাজকর্ম্মচারীরাই সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। রাজ্যের সুশাসনার্থ ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট ক্রমান্বয়ে গুডলেড, পীরট মুর, হেনরি ডাগ্‌লাস, স্মিথ, আমূটী ও ম্যাক্‌লাউড্ সাহেবদিগকে কমিশনর নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঃ ফ্রান্সিস প্যারি ও মেঃ স্যেজ মহারাজের হস্ত হইতে ফৌজদারীর ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আইসেন; কিন্তু মহারাজ তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওআলিস গবর্ণর জেনেরলের পদে পুনরাগমন করেন। তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে রঙ্গপুরের জজের হস্ত হইতে বিহারের ফৌজদারীর ক্ষমতা গৃহীত হইয়া মহারাজের প্রতি অর্পিত হয়। গবর্ণর জেনেরল মহারাজকে এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখেন যে, তাঁহার কোন বিষয়ে উপদেশ লওয়ার প্রয়োজন হইলে তিনি কমিসনরের যোগে স্বয়ং গবর্ণর জেনেরলকে পত্র লিখিবেন। ১৮০৭ সালে মহারাজ বর্ত্তমান সাগরদীঘী খনন করিয়া তৎপশ্চিম তীরে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮১২ খৃঃ অব্দে মহারাজ ভেটাগুড়ী নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত বাটীতে গমন করেন। মেঃ ম্যাক্‌লাউড সাহেব নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিত পড়িত করিয়া রাজার হস্ত হইতে ফৌজদারীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ গবর্ণর জেনেরল সাহেবকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিলে, মহামতি লর্ড ময়রা মহারাজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নানাবিধ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া

ম্যাক্‌লাউড্‌ সাহেবকে বেহার হইতে প্রস্থান করার আদেশ করিলেন, ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতির সমস্ত ক্ষমতা অবিরোধে পরিচালন জন্য মহারাজকে পত্র লিখিলেন। তিনি স্পষ্টরূপে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন যে, লালবন্দী নিয়মিত রূপে প্রদত্ত হয় কিনা, এতদ্বিষয় মাত্র দৃষ্টি রাখা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধলিয়াবাড়ী নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন; ৭ বৎসর এই রাজধানীতে বাস করিয়া ১৮২৮ খৃঃ অব্দে মহারাজ পুনরায় কোচবিহারে রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ৫৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে বারাণসীতে মানব লীলা সম্বরণ করেন।

।। শিবেন্দ্রনারায়ণ ।।

৩৩০—৩৩৮ ; ১৮৩৯—১৮৪৭

৮ বৎসর।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজ্যাধিকার লাভ করেন। কাশীক্ষেত্রে বৃদ্ধ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যু হইলে, কুমার বজ্রেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু শিবেন্দ্রনারায়ণ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ক্রমে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিজীবী ও শান্ত স্বভাবাপন্ন ছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। শিবেন্দ্রনারায়ণ গবর্ণমেণ্টের সেই সমুদয় ঋণ পরিশোধ করত রাজ্যের সুশাসন ও নানাবিধ বিষয়ে সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থা ও আইন মত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ রাজসভা ও মহাবিচারালয় সংস্থাপন করেন। এই বিচারালয়ে রাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত সমুদয় বিচারের চরম নিষ্পত্তি হইত। দেওয়ান বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ী এবং বাবু ঈশানচন্দ্র মুস্তফী এই বিচারালয়ের বিচারক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে শিবেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং পণ্ডিতগণ সহ বিচারালয়ে অধিষ্ঠান হইতেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তিনি ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করেন। ইনি একত্রে দুই দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে মহারাজ কাশী যাত্রা করেন। যাত্রাকালে ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করত সঙ্গে লইয়া যান। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ বারাণসীতে মানব লীলা সম্বরণ করেন।

।। নরেন্দ্রনারায়ণ ।।

৩৩৮—৩৫৪ ; ১৮৪৭—১৮৬৩

১৬ বৎসর।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রাজ্যাভিষিক্ত হন। নরেন্দ্রনারায়ণ স্বর্গীয় মহারাজের সমভিব্যাহারে বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতেন। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের লোকান্তর হইলে, বারাণসীতেই মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ

রাজ্যাভিষিক্ত হন। তৎকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। অতঃপর তিনি এই রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন; এবং তদানীন্তন দেওয়ান বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ীর উদ্যোগে গবর্ণর জেনেরলের এজেন্ট জেঙ্কিন্স্ সাহেবের অভিপ্রায় মত তিনি বিদ্যাভ্যাস জন্য কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। কৃষ্ণনগরে কিয়ৎকাল শিক্ষালাভ করিয়া, কলিকাতায় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে নীত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের অপ্রাপ্ত বয়স সময়ে তাঁহার পিতা কুমার বজ্রেন্দ্রনারায়ণ সরবরাহকার নিযুক্ত থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজের বিমাতৃদ্বয় শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কামেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরী রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কোচবিহারে জেঙ্কিন্স স্কুল সংস্থাপিত হয়। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তিনি ষ্ট্যাম্প আইন ও নিজের ষ্ট্যাম্প কাগজ এরাজ্যে প্রচলিত করেন।

১৮৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মহারাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৬ই অগাষ্ট তারিখে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ, ২২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, বিহার রাজধানীতে স্বর্গারোহণ করেন।

॥ মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ॥

১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৭ই অগাষ্ট ও ৩৫৪ রাজশকের ২২এ ভাদ্র তারিখে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ দশ মাস বয়ঃক্রম কালে, সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতামহী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নিস্তারিণী রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে মহারাজের নামে টাকা ও মোহর মুদ্রিত হয়। কয়েক মাস পর্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পাদন করিয়া মহারাণীগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট মহারাজের অপ্রাপ্ত ব্যবহার-কার পর্য্যন্ত নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার সঙ্কল্পে, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ২৬এ জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত কর্ণেল হটন সাহেব মহোদয়কে কোচবিহারের কমিসনর নিযুক্ত করেন। তিনি ১১ই ফেব্রুয়ারী এখানে উপস্থিত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ভূমি-দান, পেন্সন্ প্রদান, এবং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বলবৎকরণ ব্যতীত মহারাজের অন্যান্য সমুদয় ক্ষমতা কমিসনরকে দেওয়া হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে, রাজ্য শাসনপ্রণালীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। মহারাজের লালন পালন এবং বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ রূপ মনোযোগ প্রদান করিতে কমিসনর উপদিষ্ট হইয়াছিলেন।

কর্ণেল হটনের সময়েই এরাজ্যের পূর্ব্বতন দোষাশ্রিত নিয়মাদি রহিত হইয়া সুশাসক প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি রাজসভা উঠাইয়া দেন, এবং ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব্ব প্রচলিত একান্ত ঘৃণাকর মনুষ্য বিক্রয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন এ রাজ্যে প্রচারিত করেন। এই সকল কার্য্য দ্বারা মহামতী হটন সাহেব যে এ দেশীয় লোকের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কর্ণেল হটন ভুটান যুদ্ধে বিশেষ লিপ্ত থাকায়, এখানকার শাসনভার একজন ডেপুটী কমিসনর সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হয়। ডেপুটী কমিসনর কোচবিহারে অবস্থান করিয়া কমিসনরের অনুমতি মতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। মেঃ বিভারিজ, মেঃ স্মিথ, কাপ্তেন লুইন, মেঃ ডল্টন, ক্রমান্বয়ে ডেপুটী কমিসনর ছিলেন। ইঁহাদের অনুপস্থিতিতে মেজর লেন্স, মেঃ বেকেট এবং কাপ্তেন গর্ডন প্রতিনিধি ডিপুটী কমিসনরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই সময়ে কিরূপ নিয়মে রাজকার্য্য সমাধা হইত, তাহার প্রত্যেক বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে বর্ণিত হইতেছে।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর বারাণসীর কোর্ট অব ওয়ার্ডসে নীত হন। তথা হইতে ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্কিপুরে আনীত হন, এবং পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে রীতিমত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর এপ্রিল মাসে শ্রীযুক্ত নেলার সাহেব মহারাজের তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ কলিকাতাতে নীত হন ; এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চে খ্যাত-নামা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিবালার সহিত মহারাজের বিবাহ হয় ; তৎপরে ১৫ই মার্চ্চে তিনি ইংলাণ্ডে যাত্রা করেন। অনধিক এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরীর অধিকাংশ পরিদর্শন করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চে তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর কলিকাতাতে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দের ১১ই এপ্রেলে ভবিষ্যদুত্তরাধিকারী রাজকুমার রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। বর্ত্তমান সন ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবরে মহারাজের স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কার্য্যের নানা সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় তিনি বর্ত্তমান সনের ৮ই নবেম্বর তারিখে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে অত্যন্ত সমারোহ হইতেছে ; দেশ দেশান্তরীয় রাজা ও ভূস্বামীগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রায় পঞ্চাশৎ প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজগণসহ কোচবিহারে উপস্থিত হইয়া সদ্বিদ্বান, ধীশক্তি সম্পন্ন, প্রশস্ত হৃদয়, ও উদারচরিত শ্রীশ্রীমন্ মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের হস্তে এই দিনে রাজ্যভার প্রদান করিলেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী দিবসে দিল্লী নগরীতে যে দরবার হয়, তাহাতে মহারাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে মহারাণী ভারতেশ্বরীর নাম যুক্ত পতাকা ও পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তনের গবর্ণর-জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর মহারাজকে এক মূল্যবান তরবারি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালের বিদ্রোহের পর লর্ড কেনিং মহোদয় কোচবিহারের রাজাদিগের দত্তক গ্রহণাধিকার স্বীকার করেন। কোচবিহারাধিপতির সম্মানার্থ গবর্ণমেণ্ট এলাকায় ১৩ তোপ ধ্বনি হইয়া থাকে। তাঁহার উর্দ্ধতন বিচারের অর্থাৎ প্রাণদণ্ড বিধানের ক্ষমতা আছে।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

।। ডেপুটী কমিসনর ।।

সাধারণ ব্যবস্থা-সমন্বিত প্রদেশ সমূহের জজ ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ইঁহার আছে। ইঁহার আফিস দুইভাগে বিভক্ত: ইংরেজী বিভাগে মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য হইয়া থাকে; এবং অডিট্ বিভাগে মঞ্জুরী ও নিকাশের কার্য্য হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে অডিট আফিস জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হয়; ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে অডিট আফিস জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হয়; ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে তাহা রাজধানীতে আনীত হইয়াছে।

।। মাল বিভাগ ।।

এই বিভাগের তত্বাবধারণের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশের কালেক্টরগণের ক্ষমতা ইঁহার আছে। মহকুমার নাএব-আহেলকার (বিচারক), এবং সহকারী নাএব-আহেলকারের হস্তে ডিপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। খাজনা সম্বন্ধীয় ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের আইন অংশত এরাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে। যে বৎসরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এরাজ্যের ভার গ্রহণ করেন, সেই বৎসরে রাজস্ব এবং দেবত্র মহাল হইতে ২৯৭৪০২ মাত্র টাকা আয় হইয়াছিল। বিগত বর্ষে উহা হইতে ৯৪৩৬৯৯ টাকা আয় হইয়াছে।

মাল কাছারীর তত্বাবধারণ ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিভাগের ভারও দেওয়ানের হস্তে আছে।

১। আবকারী:—ইহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন দারোগা আছেন। দেশীয় ও বিলাতী মদ্য, গাঁজা, আফিম এবং মদক ব্যবসায়ীদিগের শুল্কাদিতে বিগত বৎসর ৬৩৪০৩ টাকা আয় হইয়াছে। ১৮৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে ২০৪১ টাকা মাত্র আয় হইয়াছিল।

২। ট্রেজারী:—কর্ণেল হটন সাহেবের সময়ে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহার ভার ডিপুটী কমিসনরের হস্তে ছিল। ষ্ট্যাম্প হইতে বিগত বৎসর ৯৫৩৫৭ টাকা আয় হইয়াছে।

৩। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস:—পূর্ব্বে অনেকগুলি মহাল ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। এখন চারি পাঁচটী মাত্র রাখিয়া তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৪। কৃষি ও বন বিভাগ:—আমেরিকা ও স্পেন দেশীয় প্রণালী অনুসারে তামাকু প্রস্তুতের এবং জাঁত দেওয়ার কার্য্য কয়েক বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ব্যয় বাহুল্য বিধায় স্থগিত হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সিরেন্‌সেষ্টার কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এই বিভাগের প্রধান তত্বাবধায়ক হইয়াছেন। গবোৎপাদন কার্য্যালয়ের কার্য্যও এই বিভাগের অন্তর্গত।

।। ফৌজদারী বিভাগ ।।

এই বিভাগের প্রধান তত্বাবধায়ককে ফৌজদারী আহেলকার বলে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অধিকাংশ ইঁহার আছে। মহকুমার

কার্য্যকারকগণের হস্তে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি, কার্য্যবিধি, এবং সাক্ষ্য বিষয়ক আইন এরাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

নগরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন এবং শান্তিরক্ষার ভারও ফৌজদারী আহেলকারের হস্তে ন্যস্ত।

এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে জেলখানার তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়। পূর্ব্বে কয়েদীগণ দৈনিক দেড় ও দুই আনা করিয়া খোরাকি পাইত, এবং ইচ্ছামত বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিত। কিন্তু ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যভার গ্রহণাবধি জেলখানার কার্য্য অন্যান্য জেলার ন্যায় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। রাজ কারাগারে গড়ে ১৮০ জন কয়েদী থাকে।

।। দেওয়ানী বিভাগ ।।

এই বিভাগের প্রাধান কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আহেলকার বলে। অন্যান্য জেলার সবর্ডিনেট জজ, এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা ইঁহার আছে। ইঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রেজেষ্টরী আফিস আছে। সদরে একজন সবরেজিষ্ট্রার আছেন, এবং মহকুমার কার্য্যকারকগণের ও রেজিষ্টরী করার ক্ষমতা আছে। ভারতীয় রেজেষ্টরী আইন এরাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

।। শিক্ষা বিভাগ ।।

বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকারের ৩২৯টী স্কুল আছে। তন্মধ্যে ৪টী রাজকীয়, ২৫৭টী সাহায্যকৃত, এবং ৬৮টী প্রাইভেট। এতদ্ব্যতীত মহারাজের জ্ঞাতি কুটুম্বাদির নিবাসের জন্য একটী ছাত্রাবাস নিজ-বিহারে, এবং আর একটী বাস্কিপুরে অবস্থিত আছে। রাজধানীতে একটী শিল্প বিদ্যালয় আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৯৫৪১ জন ছাত্র এই সকল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। যখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এরাজ্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন ২টী মাত্র রাজকীয় স্কুল, এবং ১৫০ জন ছাত্র ছিল। রাজ-লাইব্রেরী নামক একটী বৃহৎ পুস্তকালয় রাজধানীতে অবস্থিত আছে।

।। চিকিৎসা বিভাগ ।।

রাজ্যের এবং রাজধানীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন সিবিল্ সার্জন (ইংরেজ ডাক্তার) আছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চারিটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সদর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য আসিষ্টাণ্ট সার্জন ও অন্যান্য স্থানে এক একজন নেটিব ডাক্তার আছেন। গোম সূর্য্যাধান (গো-বীজে টীকা দেওয়া) পদ্ধতি এখানে প্রচলিত হইয়াছে।

।। পুলীশ বিভাগ ।।

বর্ত্তমান সময়ে একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে ৩ জন ইনস্পেক্টর, ১০ জন সব-ইনস্পেক্টর, ২৯ জন হেড্ কনষ্টেবল, এবং ২৬৫ জন কনষ্টেবল আছে। রাজ্য মধ্যে ৬টি থানা এবং ৭টি ফাঁড়ি আছে। পুলীশের কাজ-কর্ম্ম বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় চলিয়া থাকে।

॥ পূর্ত্ত বিভাগ ॥

সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনের এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাজ্য মধ্যে ২৮৪½ মাইল পথ আছে; তাহাতে ১৭৮টী কাষ্ঠময় এবং একটী লৌহময় সেতু আছে। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধা আছে। যখন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন ৬৯ মাইল মাত্র পথ ছিল। এতদ্ব্যতীত নগর মধ্যে বহুসংখ্যক মনোহর ইষ্টকালয়, দীর্ঘিকা প্রভৃতি এই বিভাগ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

॥ সৈন্যব্যূহ ॥

এই রাজ্যে কর্ণেল হটন সাহেবের আগমনের পূর্ব্বে ৫৮০ জন সৈন্য ছিল। কিন্তু তাহারা নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল, এবং অসজ্জিত থাকিত। কর্ণেল হটন কাপ্তেন হেদায়ত্তালীকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার দ্বারা সৈন্যদিগকে এরূপ সুশিক্ষিত করেন, যে এই সৈন্য দ্বারা ভোটান যুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন। এই সময়ে পদাতিক সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৭০০ শত করা হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিবেন, এই বন্দোবস্তে ভোটান যুদ্ধের পর সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করিয়া, ৮০ জন মাত্র রাখা হয়। ইহার অধিকাংশ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কএক জন অশ্বারোহীও আছে। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট দত্ত দুইটী কামান ও অপর কএকটী কামান আছে।

॥ সংবাদাদি প্রচলন ॥

ভোটান যুদ্ধের সময় এখানে একটী টেলিগ্রাফ্ (তাড়িৎ বার্ত্তার) আফিস সংস্থাপিত হয়। যুদ্ধাবসানে আফিসটী উঠিয়া যায় নাই। মহারাজ লাভ ও ক্ষতির ⅓ অংশ বহন করিবেন, এই নিয়মে আফিসটীর কার্য্য চলিতেছে। রাজধানীতে একটী পোষ্টাফিশ (ডাকঘর), এবং মফঃস্বলে ৫টী শাখা পোষ্টাফিশ আছে। রাজকীয় কর্ম্মকারগণ সার্ব্বিস সরকারী-ষ্ট্যাম্প (ডাক) টীকেট্ ব্যবহারের ক্ষমতা পাইয়াছেন; সুতরাং থানার ডাক এখন উঠিয়া গিয়াছে।

॥ সমাপ্ত ॥

বেহারো দন্ত

(কবিতার ছন্দে কোচবিহারের ইতিহাস)

মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেব্যা

সম্পাদনা—

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল

শ্রীশ্রীদুর্গা

বেহারোদন্ত নামক
গ্রন্থ।

—: • :—

শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী দেব্যা
মহারাণী কৃত।

———

স্থিত বেহার
রাজ অন্তঃপুর।

সন ১২৬৬ বাঙ্গলা
তারিখ ১৫ ভাদ্র।

কাকিনীয়াস্থ শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি ।

অথ গণেশ বন্দনা ।

নমো নমো গণেশায়, লম্বোদর খর্ব্ব কায়,
সুশোভিত কুঞ্জর বদন ।
সিন্দুর মণ্ডিত আভা, সহস্র চপলা প্রভা,
সর্ব্বাগ্রেতে যাঁহার পূজন ॥
রমাপতি বন্দি মাথে, চরাচর ব্যোমপথে,
ঘটে পটে জীবে নারায়ণ ।
বৃষভ বাহন পরে, বন্দি দেব বাঘাম্বরে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ॥
পিতামহে করি নতি, যাঁহার আজ্ঞায় ক্ষিতি,
স্থাবর জঙ্গম আদি করি ।
দুর্গা দুঃখ বিনাশিণী, জগৎ জননী যিনি,
স্থাপি মাকে হৃদয় উপরি ॥
ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটী সুরে, শিরে ধরি একেবারে,
প্রত্যেকের নাম কৈতে নারি ।
অবলা সরলমতি, নাহি জানি স্তুতি নতি,
ক্ষমিবেন সবে কৃপা করি ॥

অথ মহামায়া বন্দনা ।

মহামায়ার মায়াবশে সব তত্ত্ব ভুলে ।
মীন মত বন্দি হোয়ে আছি মায়া জালে ॥
ভাই বন্ধু সুতে কহি আমার আমার ।
নয়ন মুদিলে হবে সব অন্ধকার ॥
পাপে মতি সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্ম জ্ঞান নাই ।
কুকর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞানে রয়েছি সদাই ॥
এ ভব বন্ধনে মাগো তরাও এ দীনে ।
অন্তিমেতে স্থান দুর্গা দিও শ্রীচরণে ॥
সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তা হতেছে আমার ।
বেহার বৃত্তান্ত কিছু করিতে প্রচার ॥
খর্ব্ব কলেবর মনে চন্দ্রিমা ধারণ ।
যেন পঙ্গু ইচ্ছে গিরি করিতে লঙ্ঘণ ॥
জন্ম অন্ধ মনে করে সৃষ্টি দেখিবার ।
সেই মত বাঞ্ছা শ্যামা হয়েছে আমার ॥
দক্ষ সুতা দাক্ষায়ণী ভব ভাবাঙ্গনা ।
কৃপানেত্রে চেয়ে মাগো পূরাও কামনা ॥

অথ কালী বন্দনা ।

খর্ব্ব ত্রিপদী ।

ত্রিগুণ ধারিণী, গুণি শিরোমণি,
নির্গুণা করেছ মোরে ।
নাহি দিলে গুণ, কি গুণে মা গুণ,[১]
বর্ণি গুণ কি প্রকারে ॥
তুমি গুণি স্থির, জননী গুণির,
গুণিগণ অগ্রগণ্যা ।
গুণি বর্গ যারা, বর্ণে গুণ তারা,
গুণির নিকটে ধন্যা ॥
মান্য গুণি গণে, বর্ণে গুণ গুণে,
রাখে গুণে বদ্ধ করি ।
নাহি গুণ সেল, নির্গুণের শেষ,
কান্দি গুণ গুণ করি ॥
কৈতে তব গুণ, মহেশ নির্গুণ,
পঞ্চবক্তে[২] নাহি পারে ।
যন্দেশ্বরী কয়, বর্ণনা কি হয়,
বর্ণময়ী বর্ণ হারে ॥
রক্ষ রক্ষ তারা, ওহে ভব দারা,
কর দুর্গে দুঃখ দূর ।
পড়েছি বিপাকে, উদ্ধার আমাকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ॥
সারদে বরদে, বরদে বরদে,
আছি মা বিপত্তি কূপে ।
এই বর চাই, রহিবে সদাই,
পেটে বাগীশ্বরী[৩] রূপে ॥

গ্রন্থারম্ভ

পয়ার ।

বেহার ঈশ্বরগণ জন্ম বিবরণ ।
একমন চিত্তে সবে করুন শ্রবণ ॥
হীরা দেবী গর্ভে জন্ম শিবের ঔরসে ।
শিশু বিশু নামদ্বয় ব্যাপ্ত সর্ব্বদেশে ॥

১ । গুণ—গণ্য কর । ২ । পঞ্চবক্তে—পঞ্চমুখে । ৩ । বাগীশ্বরী—সরস্বতী দেবী ।

শিল্প সিংহের রায়কত হইল খেয়াতি।
বিশ্বসিংহ রাজা হয়ে পালিলেন ক্ষিতি॥
শিল্প বংশ বলে আর নাহি প্রয়োজন।
বিশ্বদেব বংশাবলী করহ শ্রবণ॥
ভূপের মধ্যম পুত্র নরনারায়ণ।
রাজ্যপ্রাপ্তে বহুদেশ করেন শাসন॥
তস্য সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষিতি পতি।
প্রজাবর্গে পালিতেন যেমন সন্ততি॥
বীরনারায়ণ নামে বীর অবতার।
পিতার বিয়োগে পান রাজ্যে অধিকার॥
প্রাণনারায়ণ নামে তাঁহার নন্দন।
কাল প্রায় শত্রু পক্ষ করেন শাসন॥
তদন্তরে মোদনারায়ণ নরপতি।
পিতৃ অন্তে বসুদেব[১] পাইলেন ক্ষিতি॥
মহীন্দ্রনারায়ণ হয় সন্তান[২] তাঁহার।
পিত্রভাবে করিলেন রাজ্যে অধিকার॥
লক্ষ্মীনারায়ণ সুত জগৎ কুঙর[৩]।
তদঙ্গজ রূপনারায়ণ নরেশ্বর॥
উপেন্দ্রনারাণ রূপনারাণ তনয়।
বাল্যকালে রাজ্যেশ্বর হন মহাশয়॥
সরোবর তটে বসি ছিলেন রাজন।
শিরশ্ছেদ করে তাঁর দ্বিজ একজন[৪]॥
খগেন্দ্র[৫] দিওয়ান রূপনারাণের সুত।
পঞ্চ পুত্র ছিল সবে সর্ব্বগুণ যুত॥
তৃতীয় ধৈর্য্যেন্দ্র রায় হন ক্ষিতীশ্বর।
পরাভবে শত্রু সঙ্গে বন্দি নৃপবর॥
ভূপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র নারাণ।
রাজা হৈয়ে সপ্তাহেতে[৬] পাইল নির্ব্বাণ॥
ধরেন্দ্র কুঙর পেয়ে রাজ্য অধিকার।
ইংরাজ সহায়ে তাঁকে করেন উদ্ধার॥

১। বসুদেব—মোদনারায়ণের ভ্রাতা ছিলেন। ২। মহীন্দ্রনারায়ণ বসুদেবনারায়ণের ভ্রাতার পৌত্র ছিলেন। ৩। জগৎনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র ছিলেন। ৪। উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ হত হয়েছিলেন। ৫। খগেন্দ্র নহে, খড়্গনারায়ণ। ৬। সপ্তাহ নহে, রাজত্বকাল দু'বছর হবে।

রোগগ্রস্তে শেষে রায় মুদেন নয়ন।
পুনর্ব্বার ধৈর্য্যেন্দ্রনারাণ রাজা হন॥
রাজকার্য্যে রাজ্যেশের নাহি ছিল মন।
ছদ্মবেশে তীর্থে তীর্থে করেন ভ্রমণ॥
মহাকষ্টে ভূপেশ্বর প্রাপ্তহন বর।
শিবসম পুত্র পান সর্বগুণ ধর॥
কতদিনে ভূপালের হৈল উর্দ্ধগতি।
ত্রিবর্ষের শিশু তাঁর হইল ভূপতি॥
হরেন্দ্রনারাণ নাম খ্যাত সর্ব্বত্রেতে।
বাল্যকালে ঘটিল উৎপাত নানামতে॥
রাজ্য আশে শত্রু হয়ে খগেন্দ্রনারাণ।
দ্বি সহস্র সৈন্য সঙ্গে করেন পয়ান[১]॥
বহু যুদ্ধে রাজসৈন্য পরাভব করি।
জননী সহিতে ভূপে নিল নিজ পুরী॥
যেন পাতালেতে মহী, রাম লক্ষ্মণেরে।
বন্দিকরি রাখিলেক লয়ে কারাগারে॥
বন্ধনে ঈষৎ হাসি শ্রীমধুস্থদন।
ইঙ্গিতে হনুর হস্তে করেন নিধন॥
কলিকালে সেইরূপ ইহাও হইল।
ফিরিঙ্গির তোপে সৈন্য ভস্ম হয়ে গেল॥
কিন্তু দুরাচার পরে হল অদর্শন।
রহিলেক সেই হেতু জীবনে জীবন॥
গুপ্তভাবে রক্ষে প্রাণ বিপক্ষ ঈশ্বর।
শেষে রোগগ্রস্তে যান শমন নগর॥
কত দিনান্তরে ভূপ বর প্রাপ্ত[২] হয়।
আপনার বাহুবলে রাজত্ব করয়॥
রাম রাজ্য মত সবে করয়ে বসতি।
রোগশোক রাজ্যে নাই নাহিক দুর্গতি॥
সদা শত্রুগণ আসি করে প্রণি পাত।
হাজির থাকয়ে দ্বারে হয়ে যোড় হাত॥
সহস্র সহস্র নারী ছিল যে রাজার।
সংক্ষেপ কারণে সব না হয় বিস্তার॥
কলিকাল মধ্যে রাজা অতি পুণ্যবান।
কাত্যায়নী প্রতি ভক্তি রাবণ সমান॥

১। পয়াণ—প্রস্থান, গমন।
২। বর প্রাপ্ত—বয়ঃপ্রাপ্ত।

সদা যাগ যজ্ঞ ধ্যান বলিদান আদি।
নানামত অর্চ্চনা করেন নিরবধি ॥
কতখানে কত মত রাখিলেন কীৰ্ত্তি।
স্থানে স্থানে স্থাপন করেন শক্তি মূৰ্ত্তি ॥
এইমত মহারাজা আনন্দিত মনে।
সর্ব্বক্ষণ রহে রায় দেবীর অর্চ্চনে ॥
কত দিনে রাণীগণ হন গর্ভবতী।
ক্রমে ক্রমে হইলেক অনেক সন্ততি ॥
ভূপালের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বামী যে আমার।
কহিতে লজ্জায় জিহ্বা হইতেছে আড় ॥
গুরু পিতৃ মাতৃ আর স্বামি নাম আদি।
উচ্চারণ করিবারে নাহি কোন বিধি ॥
সর্ব্ব দেবদেবী পদে করি নমস্কার।
স্বামী নাম উচ্চারণ, পাপে হই পার ॥
গুরুজন মান্যজন সর্ব্বজনে আর।
করিতেছি আমি শত শত পরিহার ॥
উপহাস না করিবে এ অভাগিনীরে।
রচনার জন্য নাম হল কহিবারে ॥
বিশ্বের আধার নাম তেঁই তাঁরে স্মরি।
ইথে যত অপরাধ ক্ষমিবে শঙ্করী ॥
শুভক্ষণে শুভলগ্নে জন্মেন যখন।
জয় জয় জয়ধ্বনি করে রামাগণ[১] ॥
কাৰ্ত্তিক হইতে দেখি মনোহর রূপ।
শিবেন্দ্রনারায়ণ নাম রাখিলেন ভূপ ॥
অন্নাশন কর্ণবেধ কাল মত সারি।
পড়িবারে দেন রায়ে পাঠশালা করি ॥
পারস্য আরব্য বাঙ্গলাদি যত শাস্ত্র।
ভোজবিদ্যা মল্লবিদ্যা আদি শাস্ত্র অস্ত্র ॥
হইলে এ সব বিদ্যা বিষয়ে পারগ।
রাজকার্য্যে মহারাজ করেন নিয়োগ ॥
স্বাধিকার পালে ধীর করি সুবিচার।
দস্যু চোর নাহি ছিল রাজ্যেতে তাঁহার
কালান্তক কাল সম দুষ্টজন প্রতি।
কহিবারে সেই গুণ নাহিক শকতি ॥

১। রামাগণ—সুন্দরী নারী।

মেঘেন্দ্র বজ্রেন্দ্র আর শীলেন্দ্র প্রভৃতি।
সর্ব্বগুণে গুণি সব রাজার সন্ততি॥
বিদ্যা বুদ্ধি হীনা আমি কি কহিতে পারি।
অবধান কর সবে ঘৃণা পরিহরি॥

ত্রিপদি।

চাপাগড় গ্রামে[১] ধাম, তাহে বজ্রধর নাম,
সর্ব্ব গুণান্বিত সুপণ্ডিত।
ইষ্ট নিষ্ঠ মিষ্টভাষী, কোন দোষে নহে দোষী,
ধনরত্ন যশেতে পূর্ণিত॥
তাঁহার কুমারী হন, ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন,
যাঁর নাম শ্রীশ্রীকামেশ্বরী।
ভূপাঙ্গজ আনি তাঁরে, রাখিলেন সমাদরে,
উদ্বাহ সমাধা নাহি করি॥
রাজার তনয় যত, সবকার এই মত,
পাত্রী আনি ঘরেতে রাখিল।
পূর্ব্ব রীতি অনুসারে, কেহ নাহি বিয়া করে,
শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী নিবেদিল॥

পয়ার।

বৃদ্ধরাজা পুত্র মিত্র বন্ধুবর্গ সঙ্গে।
অষ্ট চত্বারিংশৎ বৎসর কাটে রঙ্গে॥
বার্দ্ধক্যাবস্থায় শিবে করিতে দর্শণ।
শিবেন্দ্রে বজ্রেন্দ্রে করি রাজ্য সমর্পণ॥
সর্ব্বাঙ্গনা-মন্ত্রি যজ্ঞেন্দ্রাঙ্গজ সহিত।[২]
বর্ষ ত্রয়ে কাশীক্ষেত্রে হন উপনীত॥
সদালাপ সাধুসঙ্গ সৎ আচরণ।
নীলকণ্ঠ লিঙ্গ নিত্য করেন দর্শন॥

১। চাপগড়—জলপাইগুড়ির অন্তর্গত ময়নাগুড়ির নিকট অবস্থিত। বজ্রধরের পূর্ব্বপুরুষেরা কোচবিহারের মহারাজার অধীনে তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন। চাপগড় পরে ভূটীয়া কর্তৃক অধিকৃত হয়, ইংরেজ আমলে এঁরা রাজ্যহীন হন। বজ্রধরের বংশধরেরা বর্তমানে মাথাভাঙ্গার দক্ষিণ চকিয়ারছড়া গ্রামে বাস করছেন।

২। সমস্ত পত্নী, মন্ত্রী ও পুত্র যজ্ঞেন্দ্র সমভিব্যাহারে।

বহুকাল কালেশ্বরপুরে কাল কাটি।
একান্ত অন্তরে মুখে বলেন ধূর্জটি॥
শিবানী সহিত শিবে করিয়া স্থাপন।
মণিকর্ণী জীবনেতে জীবন অর্পণ॥
ভবভয়ে মুক্ত হয়ে মহারাজা যান।
অন্ত্যেষ্ট্যাদি ক্রিয়া করে যেমত বিধান॥
দ্বিতীয় দিবসে বেহারেতে লিখে পাতি।
অতীত দ্বিতীয় দিনে রাজ উর্দ্ধ গতি॥
পাত্র মিত্র পত্র প্রাপ্তে হয়ে এক চিত।
শিবেন্দ্র ভবনে সবে চলিল ত্বরিত॥
মহারাজ স্বর্গগত করিয়া শ্রবণ।
শোকেতে আচ্ছন্ন হয়ে করেন ক্রন্দন॥
ধীরগণ মন্ত্রিগণ প্রজাগণ যত।
সুস্থ করিবার হেতু বলে শত শত॥
শোকের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল যখন।
সিংহাসনারূঢ় হতে বলে সর্ব্বজন॥
এ প্রকারে তক্তখালি রাখিতে না হয়।
আজ্ঞা হলে আয়োজন করি সমুদয়॥
শ্রীযুত কুঙর রায় চিন্তিয়া মনেতে।
অনুজ্ঞা প্রকাশ করে বসিয়া সভাতে॥
মন্ত্রী কোতালেরে ডাকি করে আজ্ঞাপনা।
নগর মাঝারে দিতে মঙ্গল ঘোষণা॥
সেই গিয়া বাজাইল ভেরি মনোহর।
হাটে ঘাটে পথে মাঠে শুনিতে সুন্দর॥
শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী বলে শুন সর্ব্বজনা।
যে প্রকার নগরেতে দিলেক ঘোষণা॥

খর্ব্ব ত্রিপদী।

হয়ে এক মন, করহ শ্রবণ,
বেহার নিবাসি সবে।
কল্য শুভক্ষণে, রাজ সিংহাসনে,
শিব উপবিষ্ট হবে॥
এ লাগি সকলে, প্রভাতের কালে,
সাজাইয়া ঘর দ্বার।

করিয়ে সাজন, লয়ে উপায়ন,[১]
যাবে রাজ দরবার ॥
যত পুর নারী, দিব্য বস্ত্র ধরি,
সাজি রত্ন অলঙ্কারে ।
তাড়াতাড়ি করি, পূর্ণ কুম্ভ ধরি,
যাবে প্রভু বরাবরে ॥
আছে যেবা আর, রাজ পরিবার,
শুন সবে এক মতি ।
প্রত্যুষ কালেতে, যাইয়া সভাতে,
দেখিবেন ক্ষিতিপতি ॥

পয়ার ।

মঙ্গল ঘোষণা শুনি যত প্রজাগণ ।
আনন্দ সাগরে তারা হইল মগন ॥
একি সমাচার শুনি একি সমাচার ।
দীন নাথ নিধি বুঝি দিল মোসবার[২] ॥
রাজ্য অভিষেক এই মঙ্গল বন্যায় ।
আনন্দ অর্ণবে অদ্য ডুবায়ে ফেলায় ॥
বহুকাল আশা ছিল মোসবার মনে ।
দেখিব শিবেন্দ্র রায়ে রাজ সিংহাসনে ॥
দয়াময় বিধি অদ্য আশা পূর্ণ কৈল ।
এ মত ভাবিয়া সবে রজনী বঞ্চিল ॥
সর্ব্ব আয়োজন মন্ত্রি গণেতে রচিয়া ।
হাজিরী জানায় সবে আর্দ্দাশ[৩] করিয়া ॥
অন্তঃপুরের মুখ্য মুখ্য রাণী যত ছিল ।
মঙ্গল বিধান তারা আহ্লাদে করিল ॥
লগ্ন উপস্থিত আসি দেখি মহাজ্ঞানী ।
সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন তখনি ॥
উলু উলু উলুধ্বনি করে রামাগণ ।
জয় জয় জয় শব্দে পূরিল ভুবন ॥

১। উপায়ন—উপহার ।
২। মোসবার—মো—আমাদের ; সবার—সকলের । ৩। আর্দ্দাশ—অনুরোধ ।

টিকারা[১] দগড়া[২] কাড়া ঝাঝরী মহরি।
বাঁশি কাঁশি জয় ঢক্কা বাজে সারি সারি ॥
সানাই ভেউর তাষা কাংশ্য করতাল।
নবহত শত শত শুনিতে রসাল ॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজা বাজয়ে মুরুচঙ্গ।
ঢোলক তবলা বীণা সেতার সারঙ্গ ॥
ভাড়েতে ভাড়ামি কালয়াতে পূরে তান।
নৃত্যকীরা নৃত্য করে পাইয়া সম্মান ॥
কিবা চমৎকার দেখি কিবা চমৎকার।
বেহার বিহারিগণে আনন্দ বাজার ॥
নানা স্থানে নানা মত কিবা শোভা পায়।
বর্ণনা বর্ণনে বর্ণ কাল হয়ে যায় ॥
বাদ্যোত্তম শ্রবণে শ্রবণ রুদ্ধ হয়।
লিখনে লিখনী হতজ্ঞান হয়ে যায় ॥
সর্ব্ববজ্জি কহিবারে বাসনা কিঞ্চিৎ।
দুঃখ বারি মনে করি নেত্র বিগলিত ॥

ত্রিপদি।

পর্ব্বত যোয়ারে[৩] ঘর রাজেন্দ্র নারাণ বর,
ধনেশ্বর জিনি ধনপতি।
যশে সর্ব্বদেশ পূর্ণ, সবে করে ধন্য ধন্য,
শিষ্ট-শান্ত ধর্ম্মে মতিগতি ॥
সদা যাগ যজ্ঞ ধ্যান, বেদ বিধিমতে দান,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যাসিরে।
চিন্তা মাত্র নারায়ণে, বিধির বিধাতা জ্ঞানে,
অন্য আশা না ছিল অন্তরে ॥
তাঁহার নন্দিনী হই, জানিনা কো দুঃখ বই,
কারে কই কৈয়ে কিবা ফল।
জন্ম জন্মান্তরে কত, পাপ করি শত শত,
শোধ তার বিধি ভাল দিল ॥
জননী জনকবর, পালিত করি আদর,
চক্ষে চক্ষে রাখি সর্ব্বক্ষণ।

১। টিকারা—টিকারা, নাকাড়া জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
২। দগড়া—দগড়, ঢাক জাতীয় (আনদ্ধ) রণবাদ্য বিশেষ, দামামা।
৩। পর্ব্বত যোয়ার—গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত। জোয়ার<যোয়ার।

সে সব বিস্তার বড়, কৈতে আখি ঝর ঝর,
নেত্রবারি হয় যে পতন ॥
অবলা সরলা তাই, কহিতে সদা ডরাই,
লোকনিন্দা কেমনে সহিব।
বেহারেতে যে প্রকারে, আসিলাম রাজঘরে,
ব্যক্ত আছে তাহা কি কহিব ॥
অক্ষিনীর সম্বরিয়া, মনোদুঃখ বিস্মরিয়া,
কৈতে এবে হইলাম ক্ষান্ত।
শ্রীশ্রীকামেশ্বরী সহ, এ অভাগারে বিবাহ,
করে বেহারের ক্ষিতিকান্ত ॥
তাহে ঘটা যত হয়, লিখনে লিখনী ক্ষয়,
বুঝিবেন অনুমানি সবে।
কিছুকাল গেল ভাল, শেষকাল হল কাল,
পড়িলাম দুঃখময় কূপে ॥

পয়ার।

অতঃপর ঘৃণা ত্যজি করহ শ্রবণ।
যে প্রকারে দুঃখনীরে আমার পতন ॥
সপ্ত বর্ষ রাজ্যাধিপ রাজত্ব করিয়া।
সংসার মায়ার কূপ মনেতে ভাবিয়া ॥
তুচ্ছজ্ঞানে রাজ্য কার্য্য সব পরিহরি।
প্রকাশে ঔদাস্যভাব মনস্তাপ করি ॥
ইতিমধ্যে নিশাশেষে দেখিয়া স্বপন।
প্রত্যুষে সবারে ডাকি করায় শ্রবণ ॥
ভূমিতল মাঝে শত পড়িয়াছে ইন্দু।
সাগর মাঝারে যেন নাহি জলবিন্দু ॥
রাহু যেন দিবাকরে গরাস করিল।
জ্বলিত অনল যেন জলে নিভে গেল ॥
মহাপঙ্কে নিমগ্ন দেখিনু করিবর।
বিদীর্ণ হইল যেন হিম ধরাধর ॥
হেন সব স্বপ্ন যার দরশন হয়।
শাস্ত্র অনুসারে তার জীবন সংশয় ॥
অতএব রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
কিরূপে শিবানী শিবে করিব দর্শন ॥

কিন্তু এক দুঃখ মম নাহিক সন্ততি।
আমার অভাবে রাজ্যে কে হবে ভূপতি॥
চিন্তি চিত্তে নৃপমণি করিলেন ধার্য্য।
বজ্রেন্দ্র তনয়ে আমি সমর্পিব রাজ্য॥
ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রকে আনিয়া যতনে।
দত্তপুত্র করিলেন শাস্ত্রের বিধানে॥
আহ্লাদিত পোষ্য করি নৃপবর অতি।
এজেণ্ট-সমিপে শীঘ্র লিখিলেন পাতি॥
বাতে ক্লান্ত অধৈর্য্য নিতান্ত সর্ব্বক্ষণ।
বিশ্বেশ্বর দর্শনে হয়েছে মম মন॥
কাশীতে যদ্যপি গতি দেন বিশ্বপতি।
একান্ত দত্তকে মোর করিবে ভূপতি॥
করাঙ্কিত[১] প্রাপ্তে ফ্রাঙ্ক[২] সন্তোষ হৃদয়।
সম্মতি সুচকোত্তর সত্বরে পাঠায়॥
মন্ত্রিবর্গে আজ্ঞা দেন মধুর বচনে।
বারাণসী যাব দ্রব্য আন সযতনে॥
পরিবার সঙ্গে করি কারব গমন।
জ্যোতিষ দ্বারাতে দেখ দিন শুভক্ষণ॥
বিজয়া দিবসে দিন শুভক্ষণ দেখি।
এত্তেলা[৩] কবেন সবে মনে হয়ে দুখী॥
ক্রমে কালাতীত হয়ে লগ্ন উপস্থিত।
যাত্রা করি মহারাজ হন সুসজ্জিত॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল কবি নিরীক্ষণ।
কিঞ্চিৎ ভূপেব হয বিষাদিত মন॥
প্রভাশূন্য দেখিলেন দেব দিবাকর।
নৃত্য করে বাম অঙ্গ সভয অন্তর॥
অগ্নিমুখী হয়ে শিবা ঘোর রব করে।
আকাশে পেচক গৃধ্র বায়স[৪] বিহরে॥
এবম্বিধ অমঙ্গল করিয়া দর্শন।
নিশ্চয় চিন্তেন মনে হইবে নিধন॥
যে হয় হইবে যাই হর সন্নিধান।
মরণে মঙ্গল হবে পাইব নির্ব্বাণ॥

১। করাঙ্কিত—লিখিত বার্তা। ২। ফ্রাঙ্ক-ফ্রান্স—মেজর ফ্রান্সিস-জেন্‌কিন্স
। এত্তেলা—সংবাদ। ৪। বায়স—কাক।

এত চিন্তি নৃপ যান বারিযান[১] পরে।
স্মরি বৃন্দেশ্বরী ভাষে নয়নের নীরে ॥
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিবিধ প্রকার।
শুনিতে না পায় কেহ কাহার হাঁকার ॥
করের ভঙ্গীতে সবে বুঝে করে কায।
চলিতে লাগিল সব সেনার সমাজ ॥
জার যে বসন অঙ্গে মাথায় টোপর।
খড়্গ চর্ম্ম বন্দুক কামান বহুতর ॥
ধানকী পদাতি রায়বেঁশে আদি কত।
তিরন্দাজ গোলেন্দাজ চলে শত শত ॥
ইত্যাদি অনেক লোক করিল গমন।
উরুধু বাজার[২] তরি মধ্যে সর্ব্বক্ষণ ॥
মুন্সী বক্সী বৈদ্য আদি বিচক্ষণগণ।
কালী শিব তারা ত্রয়[৩] করিল গমন ॥
এইরূপে মহারাজ সকল সহিতে।
গমন করেন অতি হরষিত চিতে ॥
কপট[৪] করিয়া দেওয়ান গেল নিজালয়।
নরনাথ ক্রোধ তাহে হইল দুর্জ্জয় ॥
মন্ত্রিকর্ম্মে শিবপ্রসাদের নিয়োজিয়া।
সর্ব্বকর্ম্ম তাহা হতে লয়েন সাধিয়া ॥
শুভে শুভে সর্ব্বস্থান করিয়া লঙ্ঘন।
বারাণসী ক্ষেত্রে ভূপ উপনীত হন ॥
বিশ্বকর্ম্মকৃত পুরী অতি সুবিস্তার।
পঞ্চ ক্রোশ[৫] ব্যাপি ধাম কিবা চমৎকার ॥
প্রাসাদ উপরে শূল আছে স্থানে স্থানে।
যাহা লঙ্ঘিবারে নারে দেবাসুরগণে ॥
আনন্দ কানন নাম আনন্দ বাজার।
তথাতে আবাস হৈল রাজাধিরাজার ॥
নিত্য নিত্য বিশ্বেশ্বরে করেন দর্শন।
সর্ব্বদা থাকেন ভূপ প্রফুল্লিত মন ॥

১। বারিযান—জলযান। ২। উরুধু বাজার—দৈনিক বাজার। ৩। ত্রয়—কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, দেওয়ান, শিবপ্রসাদ বকসী, রাজমন্ত্রী, তারামোহন বকসী—দ্বারমোক্তার। ৪। কপট—কপটাচার। ৫। ক্রোশ—দূরত্বের পরিমাণ, দুই মাইলের কিছু বেশী।

এই মত কিছুদিন হইল অতীত।
দেওয়ান আসিয়া শেষে হল উপনীত ॥
অমাত্যের প্রতি আজ্ঞা করেন রাজন।
শিবলিঙ্গ শক্তিমূর্ত্তি করিব স্থাপন ॥
আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ হয়ে সুসজ্জিত।
দ্রব্য সব আয়োজন করেন ত্বরিত ॥
তবে শিবা শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন।
বহু সমারোহে রায় করেন অর্চ্চন ॥
প্রেমানন্দে অশ্রুনীরে বক্ষঃ ভাসাইয়া।
পড়েন স্বকৃত স্তব ভকতি করিয়া ॥
শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী সবে করে নিবেদন।
ভূপকৃত সেই স্তব করহ শ্রবণ ॥

ত্রিপদী।

শঙ্করায় নমো নম, গিরিসুতা প্রিয়তম,
বৃষভ বাহন যোগধারি।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন,
ত্রিগুণ ত্রিশূলি ত্রিপুরারি ॥
গলে দোলে হাড়মাল, পরিধান বাঘছাল,
হাতে মালা চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ, প্রেত ভূত অগণন,
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥
অতি দীর্ঘ জটাজুট, কণ্ঠে শোভে কালকূট,
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণি বালা ফণি হার, ফণিময় অলঙ্কার,
শিরে ফণি ফণি উপবীত ॥
যোগির অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে,
কিজানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া, দেহ যারে পদছায়া,
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান ॥
মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব,
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞানতা দূরে যায়, অনায়াসে জ্ঞান পায়,
যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥

লঘু ত্রিপদী।

কৌষিকী[1] কালীকে, চণ্ডীকে অম্বিকে,
প্রসীদ[2] নগ-নন্দিনী[3]।
চণ্ড বিনাশিনী, মুণ্ড নিপাতিনী,
শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী॥
মৃগেন্দ্র বাহিনী, মহিষ মর্দ্দিনী,
দুর্গে দুঃখ বিনাশিনী।
দিন মুখ রবি, কোকনদ চ্ছবি,
অতুল পদ দুখানি॥
রতন নূপুর, বাজয়ে মধুর,
ভ্রমর ঝঙ্কার মানি।
নানা আভরণ, অতি সুশোভন,
কনক কিঙ্কিনী বাজে।
কোটি শশধর, বদন সুন্দর,
চপলা হাসে বিবাজে॥
সিন্দূর চন্দন, ভালে সুশোভন,
রবি শশী এক ঠাই।
কিবা আছে সমা, কি দিব উপমা,
ত্রিভুবনে হেন নাই॥
শিরে জটা জুট, রতন মুকুট,
অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতী মালায়, বিজলী খেলায়,
ভ্রমর ভ্রময় লোভে॥
কহি যোড করে, এসো মা অন্তরে,
দাসেরে করিয়া দয়া।
শ্রীশিবেন্দ্র রায়ে, রেখো রাঙ্গা পায়ে,
অভয় দেহ অভয়া॥

পয়ার।

স্তব অন্তে মহারাজ অঞ্জলি করিয়া।
করেন অদৈন্য দীনে ধন বিতরিযা॥
এই মত নরনাথ আনন্দিত মনে।
হরণ করেন কাল সদা দান ধ্যানে॥

১। আদ্যাশক্তির রূপবিশেষ/চণ্ডিকা ২। প্রসন্ন হও ৩। দুর্গা।

দৈবাধীন একদিন সিংহের ষড়্দিনে[১]।
সম্রাট অসুস্থ ব্যস্ত ব্যাধির কারণে॥
পাত্রমিত্র যত ছিল চলিল সত্বরে।
দ্রুতগতি করে গতি দেখিতে নৃপেরে॥
ব্যগ্রচিত উপনীত ভূপতি সদনে।
রাজা বলে আন শীঘ্র চিকিৎসকগণে॥
ত্বরা করি যায় দূত অনুমতি মতে।
আনিলেক বৈদ্যরাজ ভেষজ সহিতে॥
কেহ বলে বাতশ্লেষ্মা ক্ষীণ অতি নাড়ি।
জ্যোতিষেতে গণে কেহ বলে গ্রহ বৈরি॥
স্বস্ত্যয়ন গ্রহ যাগে নাহি প্রয়োজন।
শান্তিদ্রব্য আন ত্বরা শান্তির কারণ॥
আসি বলে তদন্তে ডাক্তর একজন।
বৃং হিয়ার ওয়ান্ বটল্ গুড্ ডিকক্‌সন[২]॥
এ স্থানের দেখিতেছি অতি মন্দ হাওয়া।
উপযুক্ত হয় এক উদ্যানেতে যাওয়া॥
মনে মনে বিচারিয়া উত্তম বিধান।
হাওয়া বদ্‌লাইতে যান দেওয়ান্ উদ্যান্॥
চিকিৎসাদি যথাবিধি করে সর্ব্বজনে।
কিছুতে না হয় কিছু নিয়তি কারণে॥
ক্রমে ক্রমে পরাঙ্‌মুখ যত বৈদ্যগণ।
পঞ্চত্ব পাইয়া রাজা হন পঞ্চানন॥
ক্ষিতিতে পতিত ক্ষিতিপতি যেই জন।
উচ্চৈঃস্বরে বন্ধুগণ করেন ক্রন্দন॥

ত্রিপদী।

ধরণী তলেতে পড়ি, শিরে করাঘাত করি,
কান্দে যত রাজার সুন্দরী।
প্রাণনাথ কহ কথা, দিও না দিও না ব্যথা,
উঠি-বৈশ নিদ্রা পরিহরি॥
বুঝিলাম আমা হতে ভূমি তব নানামতে,
হইয়াছে প্রিয় বিলক্ষণ।

১। ষড়্দিনে—৬ই ভাদ্র।
২। Bring here one bottle good decoction.—এক বোতল পরিশ্রুত জল নিয়ে এস।

এ লাগি আমারে ছাড়ি, রহিয়াছ তাহে পড়ি,
বুঝি করি দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
যদি আমি মান করি, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহরি,
কত মত করিতে শান্তন।
আজি কান্দি ভূমে পড়ি, কত না করুণা করি,[১]
কেহ নাহি কহিছ বচন ॥
করি নাই কিছু পাপ, তবে কেন দেও তাপ,
মোরে ছাড়ি যাও যমবাসে।
তোমার উচিত কাজ, এ নহে হে মহারাজ,
ডাকি লও মোরে নিজ পাশে ॥
প্রাণাধিক পুত্র তব, হায় হায় করি রব,
কান্দে পড়ি তব পদতলে।
আঘ্রাণ লইয়া মাথে, আশীর্ব্বাদ করি সুতে,
তুলি লও নিজ বক্ষঃস্থলে ॥
বিধি কি করিল কাজ, মাথায় পড়িল বাজ,
বুঝি নাথ তোঁহে নিল হরি।
হায় হায় কি করিব, কোথা গেলে তোঁহে পাব,
প্রাণ যায় দেখ মরি মরি ॥
আর না তোমার সনে, বিহার করিব বনে,
আর না করিব মধু পান।
না শুনিব মিষ্ট ভাষ, না রব তোমার পাশ,
আর না করিব কভু মান ॥
তনয় বান্ধব জনে, ছাড়ি এ দুঃখিনীগণে,
তুমি নাথ করিলে গমন।
সব আশা দূরে গেল, দশদিক্ শূন্য হল,
কি করিলে ধার্ম্মিক রাজন্ ॥

পয়ার।

এইরূপে রাণীগণ করেন ক্রন্দন।
কালী শিব তারা তারা করয়ে শান্তন ॥
মহারাজ জন্য শোক না করিবে আর।
সম্প্রতি করিতে হয় উচিত আচার ॥
চিরদিন রাজা করি রাজ্যের পালন।
নানামত করিলেন ধর্ম্ম আচরণ ॥

১। করুণা করি—বিনীতভাবে।

ইহলোকে যত সুখ সব ভোগ করে।
সম্প্রতি হলেন শিব শ্রীকাশী নগরে॥
ইহাতে শোকের পাত্র তিনি নাহি হন।
শিব হয়ে শিবালয়ে আছেন রাজন॥
সংসারের ধর্ম্ম হয় জনম মরণ।
জন্মিলেই মৃত্যু হয় না হয় বারণ॥
সেই মৃত্যু কেবল দেহের মাত্র হয়।
জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধ জীবের কভু নয়॥
যেন ছিন্ন ত্যজি পরে নূতন বসন।
তেন পূর্ব্ব দেহ ছাড়ি নূতনে গমন॥
সেই দেহ অতি তুচ্ছ ক্ষণ ভঙ্গ তায়।
তাহার বিয়োগে শোক শোভা নাহি পায়
অতএব বৃথা শোক তবু তাহা করি।
যদি মৃত লোক আসে তাহাতে বাহড়ি॥
আর শুন যার বন্ধুলোকে করে শোক।
তাহে নষ্ট হয় সে জনার পরলোক॥
অতএব ক্রন্দন করিয়া অতিশয়।
নাহি কর আপনার পতি পুণ্য ক্ষয়॥
এইরূপ মন্ত্রিদের শুনিয়ে বচন।
ত্যজি শোক রাণীগণ কহেন তখন॥
বালকেরে সিংহাসনে দেহ অধিকার।
অন্ত্যেষ্টাদি ক্রিয়া সাঙ্গ করহ রাজার॥
আজ্ঞামাত্র দ্রব্য সব করে আয়োজন।
সিংহাসনে নরেন্দ্রেরে করিল স্থাপণ॥
তদন্তে অমাত্যে বলে রাজবালকেরে।
আজ্ঞা দেহ মহারাজ পিতৃ সংস্কারে[১]॥
বান্ধব কুটুম্ব আদি লয়ে বহুজন।
সিবিকায় মহারাজে করায় শয়ন॥
সগোত্র কুটুম্ব আর যত রাণীগণ।
সঙ্গে সঙ্গে সকলেতে করয়ে গমন॥
বিধিমত করি তবে দেহ সন্তর্পণ।
ফিরিয়া আইল সবে করিয়া ক্রন্দন॥

১। কোচবিহার রাজবংশে নতুন রাজার আদেশে মৃত রাজার দেহ সৎকার হয়ে থাকে।

তদন্তরে নরেন্দ্রেরে কাতর দেখিয়া।
বরুণাতে[১] যায় সবে মন্ত্রণা করিয়া ॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিংশৎ দিবস অন্ত হল।
অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ আদি আরম্ভ করিল ॥
বহুবিধ দান বিষ্ণু প্রীতির কারণ।
ভূমি জল পাত্র বস্ত্র প্রদীপ ওদন[২] ॥
তাম্বূল উত্তম ছত্র গন্ধমাল্য ফল।
শয্যা ও পাদুকা গাভী কাঞ্চন নির্ম্মল ॥
রৌপ্য আদি ষোল দান করি সমর্পণ।
আর দিলা বহু বহু বশন ভূষণ ॥
জানবাজি মাতঙ্গম স্বুরভী বৃষভ।
বহু দান হল তাহা গণনা দুর্লভ ॥
দক্ষিণা দিলেন আচর্য্যাদি বিপ্রগণে।
তুষ্ট হয়ে গেলা সবে স্ব স্ব নিকেতনে ॥
শেষে নানামত দ্রব্য করি আয়োজন।
সহস্রেক ব্রাহ্মণের হইল ভোজন ॥
যাচকগণের[৩] করি আকাঙ্ক্ষা পূরণ।
স্বদেশে যাইতে সবার হইলোক মন ॥
নাবিক গণেরে ডাকি আজ্ঞা প্রকাশিল।
সাজাতে তরণী শীঘ্র আর্দ্দাশ করিল ॥
সঙ্গ-সঙ্গি আমাদের জত লোক ছিল।
একে একে সর্ব্বজন নৌকাতে উঠিল ॥
জয় জয় শব্দ করি মাল্লা মাঝিগণ।
বারিযান খোলে তারা দেখি শুভক্ষণ ॥
কালী শিব প্রসাদ দুজনে দ্বন্দ্ব করি।
আপন নৌকায় চলে সব পরিহরি ॥
নানা মত প্রবোধিলে না মানে বারণ।
দেখি দুর্ঘটনা মোরা চিন্তি সর্ব্বক্ষণ ॥
রাজারে রক্ষণ করে দ্বারের মোক্তার।
শ্রীতারা মোহন ছোট বক্সী নাম তার ॥
নিদ্রাহার দেবার্চ্চনা সব পরি হরি।
হাজির থাকিত সদা যেমন প্রহরী ॥

১। বরুণাতে—বর প্রার্থনায়। ২। ওদন—অন্ন। ৩। যাচকগণের—ভিক্ষার্থীদের।

বত্তর্ম্মসব এই মতে উত্তীর্ণ হইল।
শুভে শুভে বেহারের ঘাটে তরি এল॥
হরি হরি ধ্বনি করে কাণ্ডারি গণেতে।
শুনি সর্ব্বজন শুভ লাগিল করিতে॥
চন্দন সলিলে পন্থা অভিষিক্ত করি।
দুইধারে কদলী রোপিল সারি সারি॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ ধান্য দধি মধু আদি।
বিপ্র বেদ পাঠ করে যথাশাস্ত্র বিধি॥
এবম্ভূত শুভ দ্রব্য করি নিরীক্ষণ।
বালক সহিত পুরে যাই সর্ব্বজন॥
রাজ্যের বৃত্তান্ত এবে কৈতে ইচ্ছা করি।
কিঞ্চিতংশ কব আর সব পরিহরি॥
অল্পকালে কাশীলাভ হইল রাজার।
আমাদের দুঃখ তারা হইল অপার॥
শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী বলে কোথা গো তারিণী।
ভবপারে পাই যেন চরণ তরণী॥

লঘু ত্রিপদী।

ব্রজেন্দ্র কুঙর, দেবর আমার,
রূপে যেন রতিপতি।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
করিত যতনে অতি॥
রাজা স্বর্গেগত, হয়ে অবগত,
নশ্বর তাবত জ্ঞানে।
রাজ্য কার্য্য ত্যাগি, হইয়া বিবেকী,
রহে যাগ যজ্ঞ ধ্যানে॥
সদা বলে কালী, কোথা গো কংকালী[১],
কালিকা করাল মুখি।
কালী কাল হরা, কালেশ্বর দারা,
দেখা দিয়ে কর সুখী॥
মন্ত্রিবর্গ যত, বলে নানা মত,
না শুনে সে সব বাণী।

১। কংকালী (কঙ্কালী) কঙ্কাল ধারিণী।

কোথা মাগো তারা, ওহে ভব দারা,
নিস্তারহে নিস্তারিনী ॥
দুষ্টবর্গ যারা, কাল পেয়ে তারা,
করে তাড়াতাড়ি তারা।
ছিল যত ধন, করিল হরণ,
কি করি রমণী মোরা ॥
সচিব যাঁহারা দ্বন্দ্বে মত্ত তাঁরা,
রাজ্যদিকে নাহি চায়।
প্রজার সর্ব্বস্ব, হরে সব দস্যু,
বিচার কে করে তায় ॥
সখী দুই জনে, ভাবি নিশিদিনে,
কতদিনে দুঃখ যাবে।
মোদের সন্ততি, অতি শিশুমতি,
বয়ঃপ্রাপ্ত হবে কবে ॥
দিনে শতবার, দেখি স্বকুমার,
নয়নে নয়নে রাখি।
বাল্য ক্রিয়া তার, অতি চমৎকার,
শুনিয়ে হইবে সুখী ॥

পয়ার।

রমণী মণ্ডলে একা রাজার কুমার।
বাল্য ক্রিয়া করি ফেরে অতি চমৎকার ॥
এক দিন মনোহর রূপ করি ভূপ।
সঙ্গি সঙ্গে খেলিছেন কিবা অপরূপ ॥
নৃত্তকী নর্ত্তক বেশ ভূষাদি করিয়া।
নাচে রঙ্গে ভঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রে মিল দিয়া ॥
কিবা তান মান তাল গানের মাধুরী।
শ্রবণেতে তৃপ্ত প্রাণ আহা মরি মরি ॥
রাজার জননী গণে আনন্দিত মনে।
চিকের আড়ালে থেকে দেখে সংগোপনে ॥
পূর্ব্ব শোক সন্তাপের হয়ে গেল নাশ।
বালক লইয়া সানন্দেতে করে বসে ॥
রূপ গুণ স্মৃতি মেধা ধীরতা তাহার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু না করি বিস্তার ॥

ত্রিপদী।

দ্বিজরাজ যেন, মুখের গঠন,
দশন মুকুতা পাঁতি।
লোচন তাহার, খঞ্জন আকার,
ভ্রূ শরাশন আকৃতি॥
কাঞ্চন জিনিয়া, বর্ণ চিকনিয়া,
অমৃত ভাষিত তায়।
বাহু সুললিত, কর সুরঞ্জিত,
বিকসিত পদ্মপ্রায়॥
তাহে তাড়বালা, কণ্ঠে রত্নমালা,
নানাবিধ অলঙ্কার।
কিবা অপরূপ, যেন সুধাকূপ,
দেখি মোরা সুকুমার॥
আকৃতি এমন, দেখে মম মন,
গোপ ঘরে যেন হরি।
সেইরূপ খেলা, সেইরূপ লীলা,
সেইরূপ গুণধারী॥
আনন্দেতে রাণী, বলিছেন বাণী,
বাছারে জীবন চোর।
নাচরে ভূপাল, আমার গোপাল,
জীবন জুড়াকু মোর॥

পয়ার।

এই সব আনন্দেতে থাকি সর্ব্বক্ষণ।
দৈবের বিপাক ঘটে শুন সর্ব্বজন॥
পূর্ণবাদী হোয়ে বিধি দুর্ঘট ঘটায়।
শোকনীরে একেবারে সবারে ভাষায়॥
ইংরেজী শিক্ষার জন্য করিয়া উল্লাস।
রাজারে লইতে তারা করিলেক আশ॥
মধুমাসে[১] আজেন্ট[২] হইল উপনীত।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহে বচন দুর্ণীত॥
বজ্রাঘাত সব বাক্য শুনি মন্ত্রিবর।
নেত্রনীরে ভাসি আসি কহিল সত্বর॥

১। মধুমাস—চৈত্রমাস। ২। আজেন্ট—Agent.

তন্ত্রে উনমত্ত হয়ে যত রাণীগণ।
অচৈতন্য ধরাসনে করয়ে শয়ন ॥
বিপদ উদ্ধার জন্য করয়ে মন্ত্রণা।
ফলোৎপত্তি নাহি হল দৈব বিড়ম্বনা।
অক্রূর[1] যেমন কৃষ্ণ চন্দ্রে হরি নিল।
প্রাণাধিকে সেই মত আজেণ্ট করিল
শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী বলে কি করি এখন।
ভাবরে নিদানে মন অভয়া চরণ ॥
নিতান্ত লইবে সুতে জানিলেন মনে।
কায়মনবাক্যে সুতে সঁপে দেবস্থানে ॥

ত্রিপদী।

সুতের মঙ্গল কর, নাশ বিঘ্ন লম্বোদর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু বৃষভ বাহন।
একাদশ রুদ্র ব্যূহ, আদিত্যাদি নবগ্রহ,
ইন্দ্র আদি দিক্‌পালগণ ॥
দেবতার সেনাপতি, কার্ত্তিকেয় মহামতি,
করিবেন রক্ষা সর্ব্বস্থলে।
সবারে করিয়া দয়া, ভগবতী মহামায়া,
তরাবেন বিপদ সকলে ॥
সিদ্ধ[2] সাদ্ধ[3] সমিরণ, বসু নক্ষত্রাদিগণ,
নাশিবেন বিপক্ষের বল।
সঙ্গে দেব বিদ্যামন্ত্র, পুরাণ আগম তন্ত্র,
সাধিবেন সতত মঙ্গল ॥
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি যত, রাজ ঋষি শত শত,
শ্রীনারদ বৈষ্ণব প্রধান।
ধৃতি স্মৃতি মেধা বুদ্ধি, লক্ষ্মী তুষ্টি ইষ্ট সিদ্ধি,
বাগ্‌বাদিনী করুণ কল্যাণ ॥
ঊর্দ্ধ-আদি দশদিশা, বর্ষ মাস দিবা নিশা,
সকলে হইবে শুভকর।
পিশাচ দানব যক্ষ, কৌণপ[4] গন্ধর্ব্ব সখ্য,
কেহ না হইবে বিঘ্নকর ॥

১। অক্রূর—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। ইনি কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ২। সিদ্ধ—যোগী, ৩। সাদ্ধ, (সাধ্য)—গণদেবতা, ৪। কৌণপ—রাক্ষস।

সিংহ ব্যাঘ্র মত্তকরী, বরাহ ঘোটক অরি,
গণ্ডার ভল্লুক আদি শিবা।
যত ঘোর রূপধারি, জল স্থল ব্যোমচারী,
কেহ সুতে দুঃখ নাহি দিবা॥
বৃন্দে কামেশ্বরী কয়, রেখো সবে সুনিশ্চয়,
সবকাল রেখো সুখচিতে।
ইংরাজেরে সন্তোষিয়া, অন্য সবে সুখ দিয়া,
নরনাথে আনিবে ত্বরিতে॥
গল লগ্ন কৃতবাসে, নয়ন নীরেতে ভেসে,
সর্ব্বদেবে সঁপি স্বকুমারে।
সে সমস্ত কাকু[১] বানী, শুনিয়ে বিদরে প্রাণী,
পশুপক্ষী ধৈর্য্য নাহি ধরে॥

ত্রিপদী।

হৃদয়ে বিষম ব্যস্ত, লইয়া মন্ত্রির হস্ত,
বালকে সঁপিছে কান্দি কান্দি॥
শুন শুন মন্ত্রিবর, পুত্রে লও দেশান্তর,
কিরূপেতে প্রাণ রাখি বান্ধি॥
তোকে প্রাণ ধন দিয়ে, রব পথ নিরীক্ষিয়ে,
চাতকিনী যেন বারি আশে।
গেল প্রাণ সুত সনে, আসিবেরে কত দিনে,
দেহমাত্র রহিল সকাশে॥
বিল্বদল জবা দিয়া, হর গৌরী আরাধিয়া,
পেয়েছিলাম নৃপমণি ঘরে।
সে ধন বিদায় দিয়ে, কেমনে ধরিব হিয়ে,
মা বলিয়ে কে ডাকিবে মোরে॥
মা বলে আর লক্ষ নাই, বালকে রাখিতে ঠাঁই,
দেখি নাই বেতিরেকে হৃদি।
বিধি হরি নিল প্রাণ, পাঠাইল অন্য স্থান,
অবিধি করিল কেন বিধি॥
শুন শুন মন্ত্রিবর, নেও নেও প্রাণ মোর,
রহিল হে জীবহীন কায়া।

১। কাকু—কাকুতি, মিনতি।

কি বলিব অধিকন্ত[১], বালকে করিতে শান্ত,
সঙ্গে সঙ্গে থেকো যেন ছায়া ॥
যোড় হস্তে মন্ত্রী কয়, এত কি বলিতে হয়,
বহুকালের হই খানেষাদ[২] ।
রাজা হতে ভয় কিবা, সুখেতে রাখিবে শিবা,
মাতৃগণ না কান্দিবে আর ॥

পয়ার ।

যাত্রাহেতু নৃপমণি করিল সাজন ।
কান্দিতে লাগিল রাজা ঝাপিয়া[৩] বদন ॥
জননীরে বলে রাজা করিয়া ব্যগ্রতা ।
সুতপ্রতি সদা মাগো করিও বারতা ॥
আমি অতি শিশুমতি কিছুই না জানি ।
বিস্মরণ হও পাছে শুন গো জননী ॥
এত বলি জননীরে প্রণাম করিল ।
চিকুরেতে[৪] রাণীগণ রক্ষা বান্ধি দিল ॥
মন্ত্রিবর নৃপবরে লইয়া তখন ।
দ্রুতগতি বাহিরেতে করিল গমন ॥
রাজ্যেশ্বরে নিয়ে যদি করিল প্রস্থান ।
খেদার্ণবে[৫] সব লোক হল হতজ্ঞান ॥
রাজার জননী সবে ব্যাকুলিত হয়ে ।
আলু থালু হয়ে কান্দে ধূলায় গড়িয়ে ॥
বিলাপ করিয়া রাণী কহে উচ্চরায় ।
প্রাণের অধিক পুত্র দূরদেশে যায় ॥
শোকেতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় গড়াগড়ি ।
ক্ষণে ক্ষণে বলে বাছা প্রাণে মরি মরি ॥
এবম্বিধা বাক্যে বহু করেন ক্রন্দন ।
বলিতে অসাধ্য হেতু না হল বর্ণন ॥

১। অধিকন্ত—অধিকন্তু (ছন্দের অনুরোধে উক্ত প্রকার প্রয়োগ ঘটেছে !)
২। খনেষাদ—পোষ্য ।
৩। ঝাপিয়া—আচ্ছাদিত কর। ৪। চিকুর—চুল। ৫। খেদ—আক্ষেপ, বিলাপ, দুঃখ ।

ত্রিপদী।

বেলা হলো অবসান, রবি অস্তাচলে যান,
চল মাগো গৃহে চল চল।
কি কায এখানে থেকে, বাঁচিনে এ সব দেখে,
দেবীবাড়ী রয়ে কিবা ফল॥
নয়ন নীরেতে অন্ধ, ধরিয়ে সখার স্কন্ধ,
রাণী যান কুঞ্জরগামিনী।
বিগলিত অঙ্গে বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
ধূলায় ধূসর পাগলিনী॥
চলিতে না চলে পদ, শোকে যেন মৃত্যুবত্,
মৃদু গতি অতি ধীরে ধীরে।
কি বলিব নিরানন্দ, শরীরে নাহিক স্পন্দ,
হৃদি ভাসে নয়নের নীরে॥
যায় যায় ফিরে চায়, কোথা রলি আয় আয়,
এইরূপে করেন গমন।
জ্ঞান শূন্য হয়ে রাণী, করে বাছা বাছা ধ্বনি,
শীঘ্র আয় রে অন্ধের নয়ন॥
দোলার ভিতরে মাতা, হইলেন মূর্চ্ছাগতা,
রোধ হল নিশ্বাস পবন।
সঙ্গিগণে তাহা দেখি, বলে মরি একি একি,
আই[১] বুঝি ত্যজিল জীবন॥
শীঘ্র নিয়ে রাজপুরে, কমল সিঞ্চন করে,
সুস্থ কিছু করিল যতনে।
আর যত রাজদারা, সবে হয়ে জ্ঞানহারা,
ধরাসনে রহেন শয়নে॥

ত্রিপদী।

আজেন্ট দেয়ানবর, রাজমন্ত্রী তদন্তর,
রাজায় তরিতে[২] নিয়ে যায়।
রাজা-বিনা রাজধানী, হইল ক্রন্দন ধ্বনি,
সব রাণী উন্মাদিনী প্রায়॥

১। আই—দেশজ শব্দ, মাতা ও মাতামহী ইত্যাদি। রাজ-পরিবারের মহিলাগণও "আই" বলে সম্বোধিত হয়ে থাকেন। ২। তরি—নৌকা।

সঙ্গে গতি বহুজন, আমলা বৈদ্যকগণ,
আশাসোটা[১] সহ চোপদার[২]।
যায় যত রাজ সঙ্গে, লিখনে লিখনী ভঙ্গে,
সিফাই সেবক পরিচার ॥
এই সবে সঙ্গে করি, চলে রাজ্য অধিকারী,
মহানন্দে দুর্গম এড়ায়।
স্থানে স্থানে কত শত, দেখিলেন অদ্ভুত,
শেষে তরী ঘাটেতে লাগায় ॥
তদন্তরে নৃপবর, উপনীত গবর্ণর,
জেনেরেল সাহেব সমীপে।
গাত্র তুলি গবর্ণর, করি অতি সমাদর,
হস্ত ধরি বসাইল ভূপে ॥

পয়ার।

সাহেবের যাম্যে[৩] স্থিতি চেড়েতে[৪] ভূপতি।
প্রথক্[৫] উপবিষ্ট মন্ত্রী পেয়ে অনুমতি ॥
উভয়ে উভয় ভদ্র জিজ্ঞাসয়ে পরে।
উভয়ে হইল হৃষ্ট দৃষ্টে পরস্পরে ॥
অমিয়া সমান ভাষা মৃদু হাসি তায়।
সাহেব অধিক তুষ্ট রাজার ভাষায় ॥
কমিটি হইল শেষে মিলি সভ্যজন।
কৃষ্ণনগরেতে যুক্তি বিদ্যা অধ্যয়ন ॥
তদন্তরে মন্ত্রি প্রতি করিল আদেশ।
কৃষ্ণনগরেতে যেতে কর তরি বেশ ॥
সুসজ্জিত করি তরি করয়ে গমন।
মালখানার তরি জলে হইল মগন ॥
রাজদ্রব্য কিছুমাত্র হানি নাহি হয়।
সুবেদার মাত্র যায় শমন আলয় ॥
শেষে কৃষ্ণনগরেতে হয়ে উপনীত।
কালেজে অভ্যাসে বিদ্যা বালক সহিত ॥
এ দিগেতে রাজত্বের শুন বিবরণ।
সমুদয় বিস্তারিয়া হবে না বর্ণন ॥

১। আশাসোটা—রাজদণ্ড। ২। চোপদার—আশাসোটা বাহক ভৃত্য।
৩। যাম্য—দক্ষিণ পার্শ্ব। ৪। চেড়—চেয়ার। ৫। প্রথক্—পৃথক্।

পয়ার।

দীর্ঘ পরবাসে রাজা করিল গমন।
দুর্ভিক্ষ মরক রাজ্যে উপস্থিত হন॥
অন্নাভাবে সব প্রজা করে হাহাকার।
দিনান্তরে কিছুমাত্র না মিলে আহার॥
জঠর জ্বালাতে মরে করিয়া হুতাশ।
ছাড়য়ে বনিতা নিজ পতিগৃহ বাস॥
আর যত মন্ত্রী ছিল বেহার নিবাসে।
চক্ষুঃ মুদে থাকে তারা নিজ কার্য্যবশে॥
সাহুকূল হৈল কেবল দেয়ান মোক্তার।
শুভদৃষ্টি করি প্রাণ বাচান প্রজার॥
তণ্ডুল আনিয়া রাখে পর্ণশালা কৈরে।
হুশিয়ারে পহরা বসায় দ্বারে দ্বারে॥
নানামতে রাজ্য নষ্ট হইল রাজার।
কৈতে ক্ষান্ত হইলাম করিয়া বিস্তার॥
ও দিগে সম্রাট করেন বিদ্যা অধ্যয়ন।
বহু দিনান্তরে হৈল মন্ত্রীর পতন॥
সেই বার্ত্তা শ্রুতমাত্র সাহেব সুমতি।
পুনর্ব্বার নৃপে নিল আপন বসতি॥
ইস্কুলে অভ্যাসে বিদ্যা বহু পরিশ্রমে।
ইংরাজীতে সুপারগ হন ক্রমে ক্রমে॥
স্বরাজ্য দেখিতে মনে করিলেন আশ।
গবর্ণসমীপে গিয়ে করেন প্রকাশ॥
মেলানী[১] পাইয়া রাজা অতি আনন্দিত।
তৎসম্বাদ রাজধানী করেন অঙ্কিত॥
রাজপত্র প্রাপ্তমাত্র আহ্লাদে অপার।
কামানে করিতে হুকুম চত্বারিং[২] ফয়ার॥
ওদিগেতে ইষ্টিং বোটে[৩] নৃপ আরোহণ।
ঢাকা হইয়ে গোয়ালপাড়ায় করেন গমন॥
তত্রস্থল হইতে রায় আসিল ত্বরায়।
সঙ্ক্ষেপেতে বলিলাম পুথি বেড়ে যায়॥

১। মেলানী—সাক্ষাৎকারে। ২। চত্বারিং—চত্বারিংশৎ, চল্লিশ। ৩। ইষ্টিং বোট—ষ্টিম বোট, বাষ্পীয় যান।

ত্রিপদী ।

রাজ্যবাসি সবে, বিদিত হইবে,
রাণীদ্বয়ের আজ্ঞাপন ।
ত্যজিয়া বিষাদ, কুশল সম্বাদ,
শুন হৈয়ে একমন ।।
চিরদিন পরে, আসিবেন ঘরে,
কুশলেতে নরপতি ।
অতএব শোক, ত্যজ সব লোক,
হও আনন্দিত মতি ।।
এ লাগি নগরে, বিবিধ প্রকারে,
কর সবে সুসাজন ।
নগরে যাবত, আছেন দৈবত,
কর এবে সুপূজন ।।

পয়ার ।

শুনি এই ঘোষণা নিনাদ ঘোররব ।
সুখী হৈল বেহারের রাজ্যবাসি সব ।।
যে সুখ উদয় হৈল ঐ সবাকার ।
ত্রিজগতে উপমান না দেখি তাহার ।।
স্থলে পড়ি যদি মৎস্যগণে দুঃখ পায় ।
যদি বন্যা তারে ভাসাইয়া নিয়া যায় ।।
তাহাদের হয় যেই সুখ অতিশয় ।
ইহার উপমা তাহে হইতে পারয় ।।
তবে তারা সকলেতে পেয়ে দেহে বল ।
করিতে লাগিল পুর সাজন সকল ।।

মল্লঝাপ ।

তবে, সর্ব্ব অগ্রে, প্রজাবর্গে,
ভগ্ন ঘুচাইল[১] ।
তাহে, যত উচ্চ, আর নীচ,
সমান করিল ॥

১। ভগ্ন ঘুচাইল—মেরামত করিল ।

কত, লক্ষ লক্ষ, রম্ভা বৃক্ষ,
গুবাক[১] শোভন।
পরে, দুই ভিতে, যতনেতে,
করিল রোপণ॥
তার, মূলস্থলে, পূর্ণ জলে,
হেম ঘটদ্বয়।
মুখে, তা সবার, পরিস্কার,
আম্র কিসলয়॥
যত, গৃহগণ, সুমার্জ্জন,
করি গন্ধনীরে।
স্বর্ণ, মণিময়, কুম্ভচয়,
দিল তার পরে॥
তবে, কত কত, নহবত,
বাজে স্থলে স্থলে।
তাহা, শুনি শুনি, সর্ব্ব প্রাণী,
ভাসে কুতূহলে॥
ছিল, সে পত্তনে, যত স্থানে,
দেবতা আলয়।
তার, সবিশেষ, সাজ বেশ,
সজ্জিত করয়॥
নানা, উপহারে, দেবতারে,
করিয়া পূজন।
তাহা, দের আগে, বর মাগে,
নরেন্দ্র দর্শন॥
শেষে, সৈন্যগণ, সুখি মন,
করয়ে সাজন।
তাহা, বর্ণিবারে, কেবা পারে,
পারে কোন জন॥
অগ্রে, কলেবরে, সানা[২] পরে,
কেহ জোড়া জামা।
শিরে, পাগ ধরে, কেহ পরে,
টুপি অনুপমা॥

১। গুবাক—সুপারি গাছ। ২। সানা—বর্ম্ম

পৃষ্ঠে, সুনির্ম্মাণ, তোজদান,
বন্দুক কি করে।
কক্ষে, ছোরা ছুরী, অসি ফরী[১],
বান্ধে থরে থরে ॥
যত, মন্ত্রি জন, গ্রজাগণ[২],
তারাও সকলে।
করে, দ্রব্য সাজ, নররাজ,
দৃষ্টি কুতুহলে ॥
পাগ, বান্ধে মাতে, শরীরেতে,
পেণ্টুলন পরে।
আটি, মধ্যদেশে, চিত্রবাসে,
ছন্দ করি ধরে ॥
এত, করি সাজ, তারা রাজ,
দ্বারেতে আইসে।
সবে, নরেন্দ্রেরে, দেখিবারে,
যাইছে হরিষে ॥

ত্রিপদী।

সবে সুপ্রভাত জানি, নগরে হইল ধ্বনি,
সাজ সাজ ভূপে দেখিবারে।
সেই রব শুনে যেই, আনন্দিত মনে সেই,
ধ্যায়ে আইসে নৃপতির দ্বারে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্য শূদ্র যত জন,
কুম্ভকার স্বর্ণকার মালী।
তন্ত্রবায় রঙ্গকর, বৈদ্যদাস সূত্রধর,
তাম্বুলিক মোদক কাপালী ॥
কাংস্যকর কাচকর, রজক ভূজঙ্গধর,
সুত নট গোয়াল গণক।
মদ্যকার চর্ম্মকার, বাজিকর কর্ণধার,
তৈলিক বণিক অসঙ্খ্যক ॥
ছত্রিশ বর্ণীয় যত, চলে তারা শত শত,
মহানন্দে পূর্ণিত হইয়া।
যার যে বসন পরি, দ্রুত যায় রাজবাড়ী,
ক্ষান্ত হৈলাম কৈতে বিস্তারিয়া ॥

১। ফরী (ফর)—ঢাল। ২। গ্রজাগণ—প্রজাগণ।

লঘু ত্রিপদী।

ঘোষণা শুনিয়া, উন্মত্ত হইয়া,
যত পুরনারীগণ।
ভূপে নিরক্ষিতে, গমন করিতে,
করে বেশ বিরচন॥
প্রথমে চিকুর, আঁচড়ি সুন্দর,
লোটন[১] বান্ধিল তায়।
বুকের উপরি, বিচিত্র কাচরি[২]
অপরূপ শোভা পায়॥
অতি সুচিক্বণ, সুরঙ্গ বসন,
পরিলেক কটিদেশে।
মুকুতা ঝালর, শিখি মনোহর,
বান্ধিল ললাট কেশে॥
কপালে সিন্দূর, বিন্দু মনোহর,
নাসাতে তিলক পরে।
গণ্ড দরপণে, কুঙ্কুম্ চন্দনে,
পত্রাবলী চিত্রকরে॥
নাসায় বেশর, মণি মনোহর,
কুণ্ডল পরিল কাণে।
গলে মতি দাম, পাদপ সুঠাম,
খচিত হিরার খানে॥
ভুজে মণিময়, তাড়ঙ্ক পরয়,
কনক কঙ্কণ করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, নিতম্ব উপরি,
বাজন্ত কিঙ্কিণী পরে॥
যারকের জল, দিয়া পদতল,
অধিক রঞ্জিত করি।
পাসুলী নূপুর, পঞ্চম ঘুঙ্গুর,
পরিলেক তদুপরি॥
এত বেশ করি, শুভ বস্তু ধরি,
সাজায় মঙ্গল থারি[৩]।
বৃন্দেশ্বরী ভণে, চলে ব্যাগ্র মনে,
উৎকণ্ঠিতা সব নারী॥

১। লোটন—কবরী বিশেষ। ২। কাচরি—কাঁচুলী। ৩। থারি—থালা।

পয়ার।

তদন্তরে প্রজাগণ করে আগমন।
নরেশ্বরে সর্ব্ব নরে করিতে দর্শন॥
মঙ্গলসূচক দ্রব্য হস্তেতে ধরিয়া।
কহিতেছে তারা সবে অঞ্জলি তুলিয়া॥
জয় জয় নরপতি শিবেন্দ্র নন্দন।
সুখেতে করিলা তুমি দেশে আগমন॥
গত ষষ্ঠ বর্ষ মোরা তব দৃষ্টি আসে।
জীবনে জীবিত আছি অনেক প্রয়াসে॥
আজি বিধি প্রসন্ন হইয়া মোসবায়।
পরিপূর্ণ করিলেন সেই ত আশায়॥
আজি শুভদিন হৈল আমা সবাকার।
দূর হৈল যাবদীয় দুঃখ পারাবার॥
তাহাদিগে যথোচিত বাক্য সম্ভাষণে।
সন্তোষিত করিলা কুশল জিজ্ঞাসনে॥
ভূপে নিরীক্ষণ করি সিমন্তিনী সব।
সুখিত হইয়া করে উলু উলু রব॥
অবশেষে অন্দরেতে মাতৃ সম্ভাষণে।
দর্শন করিতে যান উৎকণ্ঠিত মনে॥
নরেন্দ্র নারাণ রায় নিকটে আসিয়া।
প্রণাম করেন ভূমে সাষ্টাঙ্গ হইয়া॥
রাজার জননীগণে দেখি নরবরে।
গাবী যেন বৎস দেখি চিরদিন পরে॥
বাপধন এতদিন তোরে না দেখিয়া।
ছিলাম আমরা সবে জীবিতে মরিয়া॥
দশদিগ হোয়ে ছিল সব অন্ধকার।
দেখিতাম এ তিন জগৎ শূন্যাকার॥
আজি তোর চাঁদমুখ করি নিরীক্ষণ।
সব দুঃখ দূর হৈল জুড়াল জীবন॥
দেখিতে পাইব তোর এ চাঁদ বদনে।
ইহা বলি বিশ্বাস না ছিল কারু মনে॥
সানুকূল হোয়ে বিধি করিলেন বিধি।
দরিদ্র জনেরে যেন দেয় হারা নিধি॥
যুড়াইল নেত্র তোর বদন দেখিয়া।
শীতল করহ কর্ণ শুভ বার্ত্তা দিয়া॥

কহ রে কহ রে বাপ কিরূপে সেখানে।
অশন বসন ভ্রমণ করিতে কেমনে॥
বিস্তারিয়া তত্ত্ব সব কহে নরনাথ।
শ্রবণ করেন সবে করি অশ্রুপাত॥
রাজার আখ্যান সব সমাপ্ত হইল।
তদন্তরে রাণীগণ কহিতে লাগিল॥
ইংরাজের বাক্য বাছা করিলে পালন।
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সর্ব্বক্ষণ॥
আমরা মস্তকে ধরি রাজত্ব তোমার।
এতদিন সহিয়াছি ভার দুর্ণিবার॥
সম্প্রতি তুমিহ তব পিতৃরাজ্য নিয়া।
পালন করহ সদা সাবধান হৈয়া॥
এখন আপন দেশে করি আগমন।
দেখি লও আপনার রাজ্য প্রজাগণ॥
বহিতে না পারি মোরা এই মহা ভার।
সুবিচার কর এবে সকল প্রজার॥
এত কহি মহারাজে বিদায় করিয়া।
সচিবে ডাকিয়া কন সব বিস্তারিয়া॥
শুন শুন মন্ত্রিবর আমার বচন।
জ্যোতিষীকে ডাকি দেখ দিন শুভক্ষণ॥
বাছা মোর সুখে এলো আপন ভবনে।
পাইল পরমানন্দ সকলেই মনে॥
সে সুখের যে ন্যূনতা আছে যৎকিঞ্চিৎ।
পরিপূর্ণ কর তাহা সকলে ত্বরিত॥
এই সিংহাসনে বসাইয়া নরেশ্বরে।
আমোদ করহ সবে হর্ষিত অন্তরে॥
তাহাতেও নাহি হয় বিলম্ব যেমন।
তেমন করিয়া কর দিন নিরূপণ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী বাহিরে আসিয়া।
সবারে কহেন তত্ত্ব আনন্দে মাতিয়া॥
যে সুখ উদয় হৈল ঐ সবাকার।
তারা বিনে কেবা পারে কহিতে বিস্তার॥
আমার মনের ভাব কিছুমাত্র বলি।
কিঞ্চিতে অধিক ব্যাখ্যা করিবে সকলি॥
জন্ম অন্ধে চক্ষু পেলে যেন তুষ্ট মন।
বন্ধ্যায় যেমন তুষ্ট হইলে নন্দন॥

বধিরে পাইলে শ্রুতি যত হর্ষ হয়।
ততোধিক হৈল হৃষ্ট সবার হৃদয়॥
জ্যোতীষিকে আমি শুভ দিন করে ধার্য্য।
একাদশ দিনে সমর্পিতে ভূপে রাজ্য॥
আর সব ভৃত্য প্রতি করে আজ্ঞাপন।
নানা দ্রব্যে গৃহ দ্বার করিতে সাজন॥
দামামা তোপের ঘোর হইল নিস্বন।
জ্ঞাপন হইল তাহে রাজ্যবাসিগণ॥
শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী স্বল্পাক্ষরে কিছু কয়।
গৃহগণ যে প্রকারে সুসজ্জিত হয়॥
প্রথমে গৃহের সব ভগ্ন দূর করে।
নব্য বস্ত্র তদন্তরে আনে ভারে ভারে॥
ঐ বস্ত্রে চতুর্দ্দিগে গৃহের বেষ্টন।
কিবা অপরূপ তাহে হইল শোভন॥
তদন্তরে বেল্লরের[১] সাজ নানা মত।
স্থানে স্থানে স্থাপন করয়ে শত শত॥
লণ্ঠন দেওয়ালগির ঝড় বহুতর।
ফানুস বিচিত্র সেজ রাখে থরে থর॥
আবাহিত[২] বসিবারে শয্যা মনোহর।
প্রথমে বিছায় শতরঞ্চ মঞ্চোপর॥
গালিচা পাড়িল রঙ্গে কিবা মনোহারি।
স্থাপিল নবীন বাস তাহার উপরি॥
সিংহাসন সাজ শেষে করে আরম্ভন।
স্বরঙ্গরচিত হেমময় সিংহাসন॥
নানামত চিত্র তাহে অতি সুশোভিত।
ভুলয়ে মুনির মন দেখিয়া অঙ্কিত॥
চতুর্দ্দিগে শোভে কিবা সিংহ চতুষ্টয়।
তদূর্দ্ধেতে অষ্টমূর্ত্তি নায়িকা আছয়॥
হেন সিংহাসনে পাতি জড়ির আসন।
উপাদানত্রয় তাহে করিল স্থাপন॥
কার চুবি চন্দ্রাতপ দিল সর্ব্বোপরে।
ওদিগে রাজার সাজ শুন অন্তঃপুরে॥

১। বেল্লর—কাচ। ২। আবাহিত—নিমন্ত্রিত।

সিংহস্থিত দিনমণি রুদ্রমিত দিনে[১] ।
সার্দ্ধ দ্বিতীয় প্রহর পূর্ণিত যখনে ॥
মনোহরাম্বর ধটি[২] কটিতে ধারণ ।
সুচিত্র বিচিত্র গাত্র-বস্ত্র বিরচন ॥
তন্মধ্যে স্বর্ণের পুষ্প আছয়ে বিকাশ ।
মেঘের মাঝেতে যেন বিদ্যুৎ প্রকাশ ॥
কণ্ঠেতে লুণ্ঠিত মুক্তা শ্রেণী শত শত ।
কাঞ্চন সূত্রেতে কিবা হৈয়েছে গ্রন্থিত ॥
হিরা চুণি পান্না পাগে মতির ঝালর ।
তদূর্দ্ধে স্থাপিত জিকা কলগা[৩] মনোহর ॥
তরিৎ সদৃশ প্রায় মতির ঝলক ।
ভুলয়ে মুনির মন না ফিরে পলক ॥
বক্ষোপরে শোভা করে হিরা মতি দাম ।
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুক্তা অতি অনুপম ॥
রাজটিকা ভালে আহা কিবা সুশোভন ।
প্রথম দৃষ্টিতে জ্ঞান হয় ত্রিলোচন ॥
পেশ কবজ কটিপরে হিরায় খচিত ।
কর্ম্মির কর্ম্মের গুণ না হয় ব্যাখিত ॥
ভুষায় ভুষিত ভুপ কিবা মনোহর ।
একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে সর্ব্ব নর ॥
চৌদিগে চোপদারগণ হইল আগত ।
আসা ছোটা হনুমান দণ্ডাদি সহিত ॥
বল্লম লইয়া যায় বল্লম বরদার ।
হট্ ২ শব্দ তারা করে বারম্বার ॥
সর্ব্ব অগ্রে যেতে যাহা আছয়ে বিধান ।
বানডঙ্কা আদি করি চামর নিসান ॥
পাণিছত্র আড়ানি[৪] মরছুল আদি করি ।
ঘড়ি ধাবড়া আদি বহু থাড়া সারি ২ ॥
বন্ধুগণ বিপ্রগণ মন্ত্রীগণ আর ।
দ্বিধারে কাতার বন্দি হাজারে হাজার ॥
মঙ্গলাদি ক্রিয়া সব সমাপন করি ।
তান্‌জামে[৫] চড়িল ভুপ স্মরিয়া শ্রীহরি ॥

১। রুদ্রমিত দিনে—১১ই ভাদ্র। ২। ধটি—কটিবসন। ৩। জিকাকলগা—উষ্ণীষ বিশেষ। ৪। আড়ানি—বড় ছাতা। ৫। তান্‌জাম—মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ।

তদন্তরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।
মঙ্গলার্থে বাদ্যোদ্যম হৈল আরম্ভন ॥
আরম্ভিল বহুবিধ বাজিতে বাজনা ॥
বাঁকবাঁশি বেণু বীণা না হয় গণনা ॥
বাজে কাড়া যোড়া যোড়া কড় কড় করি।
ঝল্লক ঝর্ঝর ঝাজে ঝমক বল্লরী ॥
ডিণ্ডিম ডমরু ডম্ফ করি আড়ম্বর।
মধুর মদঙ্গ বীণা মন্দিরা মর্দ্দর ॥
ঢাক ঢোল ঢেমচা টিকাড়া যোড় ঘাই।
সুমধুর তাস তুড়ি অপূর্ব্ব সানাই ॥
অগণিত নাগড়ার গভীর গর্জ্জণ।
গ্রীষ্মঅন্তে ঘোর গর্জ্জে জলদ যেমন ॥
ধামসার[১] ধ্বনিতে ধশয়ে ধরাধর।
মাঝে মাঝে বাজয়ে মুরজ বহুতর ॥
রণসিঙ্গা বাজে ভেড়ী ভেঁও ভেঁও করি।
কাহাল কর্ত্তাল কাঁসি থমক থঞ্জরি ॥
বাদ্যের দুর্দ্দুর নাদে দশদিগ্ কাঁপে।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রবে দশদিগ ব্যাপে ॥
সেই শব্দ শুনি আশি রাজ্যবাসিগণ।
সিংহাসনে মহারাজে করয়ে দর্শন ॥
অনন্তর রাজা কহে মৈত্রের[২] নন্দনে।
ধন বিতরণ কর বিপ্র দুঃখিগণে ॥
সুহৃদ সেবক যত আছে মোসবায়।
সকলেরে ধন দেও যে ইচ্ছা যাহার ॥
অন্ধ পঙ্গু দরিদ্রাদি আনি দুঃখিজন।
সকলেরে সমর্পণ করে বহুধন ॥
অবিরত বস্ত্র বসুন্ধরা বিতরণে।
জীয়াইল যুথে যুথে যাজক জীবনে ॥
সে সব বর্ণনা করা সাধ্য নাহি হবে।
ভূপগুণ রাজ্য সুস্থ কহি শুন এবে ॥
কিবা স্থৈর্য্য ধৈর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য আকার।
অস্ত্রশস্ত্রে সুপারগ গুণ চমৎকার ॥

১। ধামসা—বাদ্যবিশেষ। ২। কালীকমল মৈত্র—ইনি রাজসাহীর অধিবাসী ছিলেন।

বহুবিধ শাস্ত্র হয় বিপুল বিদ্বান্‌।
সতত নিগূঢ় তত্ব করেন সন্ধান ।।
প্রজার পালন করেন অতি সাবধানে।
যেন সাবধানে পাতা রাখয়ে নয়নে ।।
রাজার রাজ্যেতে কেহ নাহিক দুঃখিত।
অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট নষ্ট বান্ধব সহিত ।।
সত্যবাদি লোক সব ধর্ম্মেতে তৎপর।
গর্ব্বশূন্য সর্ব্ব নর রাজ্যের ভিতর ।।
চুরি ডাকা মিথ্যা বাক্য কেহ নাহি কয়।
শুদ্ধবুদ্ধি সর্ব্বনর ধর্ম্মের আশ্রয় ।।
ত্রেতাযুগে রামরাজ্য যেই মত ছিল।
নরেন্দ্রের সুবিচারে সেই মত হল ।।
যশোগুণ সর্ব্বত্রেতে পাইল প্রকাশ।
দেখিতে এজেণ্ট এলো করিয়া উল্লাস ।।
রাজ্যের নিয়ম দেখি প্রফুল্লিত মনে।
গবর্ণরে লিখি পাতি যান নিকেতনে ।।
তদন্তরে উদ্বাহার্থে পাত্রীর কারণে।
মন্ত্রিতে মন্ত্রণা করে একচিত্ত মনে ।।
ঘরে আছে লক্ষ্মীরূপা তারে না চিনিয়া।
পাত্রী অন্বেষণে লোক বেড়ায় ভ্রমিয়া ।।
না পাইয়া সুলক্ষণা পাত্রী একজন।
নিরানন্দে গৃহে ফিরে এলো দূতগণ ।।
পাত্রীতত্ত্ব না পাইয়া সকলে চিন্তিত।
ভীত হৈয়ে নৃপস্থানে করায় বিদিত ।।
একদিন অন্তঃপুরে জান নরপতি।
গৃহে দেখে বড়কন্যা অতি রূপবতী ।।[১]
তপ্ত স্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্ক বিহীন কলানিধি মুখ আভা ।।
বিহঙ্গম চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন মুকুতা পাতি সুমধুর ভাসা ।।
কামের কামান যিনি তার যুগ্মভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রাম রম্ভা উরু ।।
কুরঙ্গ নয়নী সে চামর তুল্য কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ ।।

১। এই কন্যা মহারাণী নিস্তারিণী আই দেবতা। ইনি কোচবিহারের উত্তর গোপালপুরের গোরাচাঁদ কার্য্যীর কন্যা ছিলেন।

রূপের সমান হয় গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি নীতি শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা ।।
কদাচ নাহিক অন্য মতি ধর্ম্ম বীণা।
নানাবিধ শিল্প কর্ম্মে অতি সে প্রবীণা ।।
শুনেছিল পূর্ব্বে রূপ দেখিল সচক্ষে।
অনিমিসে সর্ব্বস্থান আনন্দে নিরক্ষে ।।
লক্ষণা লক্ষণ দেখি প্রফুল্লিত মনে।
বিস্তারিয়া পাত্রবর্গে কহেন যতনে ।।
শুনি সবে হরষিত হইল অতিশয়।
জ্যোতিষী আনিয়া করে দিবস নির্ণয় ।।
বৃষমাসে গ্রহদিনে[1] বিবাহ বিধান।
ভক্ষ ভোজ্য ব্যয় দ্রব্য করে আয়োজন ।।
ক্রমে বিবাহের দিন হৈল উপস্থিত।
আশ্চর্য্য করিল সবে সভার নিম্মিত ।।
কি কব সভার শোভা বর্ণনা না হয়।
দেখিলে মোহিত হয় যোগীর হৃদয় ।।
বিবাহের ঘটা পরে হইলেক যত।
বর্ণিব কি আমি তাহা সবে আছে জ্ঞাত ।।
নীতি অনুসারে বিভা হৈল শুভক্ষণে।
পুথি বৃদ্ধি ভয়ে তাহা রৈল মনে মনে ।।
নারী জাতি অল্পমতি বর্ণিতে না পারি।
হরি হরি বলি ক্ষান্ত হৈল বৃন্দেশ্বরী ।।
একদিন সিংহাসনে বসিয়া রাজন।
সভায় ডাকিয়া সবে করান জ্ঞাপন ।।
মোর মন হয় কলিকাতা যাইবার।
তরণী আনহ ভাল অতি সুবিস্তার।
গৃহ কর্ম্মে লিপ্ত হয়ে আছি সর্ব্বক্ষণ।
নাহি হয় কিছুমাত্র বিদ্যা অধ্যয়ন ।।
তোরা সবে রাজকার্য্য কর সাবধানে।
যে পর্য্যন্ত আমি ফিরে না আসি ভবনে ।।
এত শুনি মন্ত্রিবর্গ হেট করি মাথা।
মৃদুস্বরে কহে বাণী মর্ম্মে পেয়ে ব্যথা ।।
হেন ক্রুর বাক্য কেন শুনি পুনর্ব্বার।

১। বৃষমাসে গ্রহদিন—৯ই জ্যেষ্ঠ।

স্বর্ণরাজ্য পুনঃ বুঝি হবে ছারখার ।।
এবম্বিধ বহু বাক্য সকলে কহিল ।
সে সকল বাক্যে রাজ মন না ফিরিল ।।
চিন্তিয়া আকুল সবে না দেখি উপায় ।
দ্বারীর দ্বারাতে বাক্য অন্দরে জানায় ।।
হলাহল তুল্য বাক্য রাণীগণ শুনি ।
আইল আকুল হৈয়ে যথা নৃপমণি ॥
আলুথালু বেশভূষা পাগলিনী প্রায় ।
কহিতে না পারে বাক্য আড় হয়ে যায় ॥
নেত্রে বারি ঝর ঝর ঝরিতে লাগিল ।
বহু যত্নে শেষে রাণী বাক্য আরম্ভিল ॥
অশনি সদৃশ ধ্বনি চেড়ি মুখে শুনি ।
জ্ঞানে হতজ্ঞান হয়ে নাহি সরে বাণী ॥
সত্য কিরে ওরে বাপ যাবে দেশান্তরে ।
কিকায বিরাজ করে আর মোর ঘরে ॥
সুবুদ্ধি সুধীর তুমি জ্ঞানী শিরোমণি ।
কেমনে দুর্ব্বাক্য বল কান্দাতে জননী ॥
যে দুঃখে কেটেছি কাল বলিব তা কত ।
অদ্যাবধি বক্ষেস্থিত আছে শেলমত ॥
কালকূট কৃমি বাপু যেন কষ্টে থাকে ।
তদ্রূপ জীবিত ছিলাম দেখিয়া তোমাকে ॥
অবলা সরলা হই স্থিত অন্তঃপুরে ।
ধনলোভে রাজ্য নষ্ট করে দুষ্ট নরে ॥
যশ দোষ ব্যক্ত হয় যত্র তত্র স্থলে ।
গুণ হরি অর্পে দোষ আমার কপালে ॥
পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দুঃখে ক্ষেপণ করিয়া ।
যাইতে চাহ রে বাপ মনস্তাপ দিয়া ॥
হারানিধি দিল বিধি ছেড়ে কেন দিব ।
চন্দ্রানন অদর্শনে কেমনে বাঁচিব ॥
প্রাণধন বাছা মোর প্রাণের অধিক ।
তোরে ছাড়ি তুচ্ছ প্রাণ রাখা ধিক্ ধিক্ ॥
একবার দুঃখনীরে করিয়া স্থাপন ।
দগ্ধ করেছিলে মোরে অঙ্গার যেমন ॥
তব আগমনে সুখ দুঃখ নাই মনে ।
পুনর্দগ্ধ প্রাণ চূর্ণ ইচ্ছা কর কেনে ॥

শুভ আগমন তোর যেদিন হয়েছে ।
এ দেশের প্রজাদের দুঃখ দূরে গেছে ॥
দুষ্টবর্গ দুর্ব্বল প্রবল সাধুজন ।
দস্যু চোর সর্ব্ব গর্ব্ব করেছ দমন ॥
দণ্ডে দণ্ডি দোর্দ্দণ্ড পাষণ্ড দুষ্টগণে ।
কষ্ট নষ্ট ধনী হৃষ্ট কৈলে দীনহীনে ॥
রীতিনীতি স্থাপন করিলে বহুতর ।
বাহুল্য বর্ণিতে গুণ লিখিতে বিস্তর ॥
আবাল বৃদ্ধের মুখে তব যশ শুনি ।
পীযূষ সাগরে ভাসি দিবসযামিনী ॥
মহানন্দে আছি বাপ নিরানন্দে ছেদি ।
অর্পিবে কি হলাহল পুনঃ হয়ে বাদী ॥
নষ্টে কষ্ট দিয়ে সুস্থ করেছিলে ক্ষিতি ।
পুনর্ব্বার রাজ্যদুষ্ট করিবে দুর্গতি ॥
সকলি জান রে বাছা জানাইব কত ।
বামাজাতি অল্পমতি তাহে জ্ঞান হত ॥
নিজ রাজ্য ধর সদা বসি সিংহাসনে ।
পালন করহ ক্ষিতি মৈত্র মন্ত্রি সনে ॥
যেও না বিদেশে বাপ সদা কাছে থাক ।
যুড়াও তাপিত প্রাণ মা বলিয়া ডাক ॥
নিষেধ করিরে বাপ যেও না যেও না ।
অভাগীর প্রাণে কষ্ট এখন সবে না ॥
তুমি যদি নিতান্ত যাইবে যাদুমণি ।
অনলে অথবা জলে ত্যজিব পরাণী ॥
কিম্বা বিষ পান করি পরাণ ছাড়িব ।
মাতৃহত্যা অপরাধ তব পরে দিব ॥
তাহে যদি প্রতিবাদী প্রতিবাসী হয় ।
পদব্রজে অরণ্যেতে পসিব নিশ্চয় ॥
এ ছার জীবন রেখে নাহি প্রয়োজন ।
বারম্বার কলঙ্কেতে হব না পতন ॥
যে হবার হইয়াছে হবে নারে আর ।
ভুলিব না মধুমাখা বচনে তোমার ॥
শিশুকালে রাজগৃহে এসেছি যেমন ।
অল্পদিনে বহু কষ্ট পেয়েছি তেমন ॥
দুঃখে তনু জর জর কহিতে না পারি ।
স্থিরচিত্তে আছি মাত্র স্মরিয়া শ্রীহরি ॥

খর্ব্ব ত্রিপদী।

তোরে স্নেহ যত, বর্ণেছি কিঞ্চিত,
ওরে বাছা যাদু মণি।
তোর সভাসদ, করে নানামত,
প্রবঞ্চনা[১] এ লেখনি॥
যার মনে যেই, ভাবিবেরে সেই,
তাহে ক্ষতি কিবা হবে।
ভয় নাই আর, যে হয়েছে হবার,
দুঃখ নাহি তাহে এবে॥
যাইতে বারণ, করিতেছি শোন,
তার বিবরণ বলি।
গেলি দেশান্তরে, রাজ্যে রেখে মোরে,
সঁপে কলঙ্কের ডালি॥
যেরূপ লাঞ্ছনা, লোকের গঞ্জনা,
জানাইতে নারি বাপ।
সেই দুঃখে মন, করে জ্বালাতন,
মনে হলে বাড়ে তাপ॥
ঘৃণা হয় চিতে, না পারি কহিতে,
মনোখেদ মনে সই।
দেখ ওরে ধন, কার্য্যে নাহি মন,
মনস্তাপে কোণে রই॥
কোন বিষয়েতে, বাঞ্ছা নাই চিতে,
তুষ্টে রুষ্টে নাহি ভয়।
সুখ দুঃখ মম, হইয়াছে সম,
চিন্তামাত্র বিশ্বময়॥
এ ধন সম্পদ, কেবল আপদ,
অন্তিমেতে কেবা যাবে।
তুচ্ছ এ সংসার, কেবল অসার,
চরমে কে কোথা রবে॥
শাস্ত্রেতে বর্জ্জিত, ধর্ম্মে নাই চিত,
বর্ণিবারে সাধ্য নাই।
কেবল ভাবনা, শ্যামা ত্রিনয়না,
ঐ পদ সদা চাই॥

১। প্রবঞ্চনা—এস্থলে অক্ষম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বোধ হয়।

মনের বিকার, ক্ষান্ত নাই আর,
বৃথা দিন চলি যায় ।
শ্রীবৃন্দেশ্বরীর, যেন এ শরীর,
লিপ্ত হয় রাঙ্গা পায় ॥

অষ্টাদশ শতে কাশী শকের নির্ণয় ।
মৃগেন্দ্রের পক্ষ দিনে[১] লিপি সাঙ্গ হয় ॥
স্বল্পাক্ষরে বেহারোদন্তাঙ্কিত করি ।
গুণিগণ সমাজেতে দিতে এবে ডরি ॥
যত্ন পত্ন অসাধ্য যে শুদ্ধ করিবারে ।
কবিতে অকবি জ্ঞানে ক্ষমিবে আমারে ॥
স্বশ্রুস্মৃত তদ স্মৃতা দিব বিবরণ ।
জন্ম মৃত্যু কীর্ত্তিগুণ না হয় বর্ণন ॥

সমাপ্ত ।

১। মৃগেন্দ্রের পক্ষ দিন—২রা ভাদ্র ।

মহারাজ বংশাবলী
(কোচবিহার)

রিপুঞ্জয় দাস ও
অন্যান্য

সম্পাদনায় ঃ

নৃপেন্দ্রনাথ পাল, এম, এ
গবেষক, কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীমতী হেলেনা পাল
হাজরা পাড়া,
কোচবিহার।

মুদ্রক :
প্রণব মজুমদার
ইঙ্ক-ও-প্রিণ্ট
এন. এন. রোড, কোচবিহার

প্রথম প্রকাশ :
রাস পূর্ণিমা, ১৩৮৩

মূল্য :
দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

পরিবেশক :
সঞ্চয়ন (পুস্তক বিক্রেতা)
সুনীতি রোড, কোচবিহার।

কয়েকটি কথা

কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার বিশেষ প্রবণতা ছিল না। তাই দেখা যায় কোচবিহারের রাজইতিহাস কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। রাজানুকূল্যে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাতে কোচবিহার রাজবংশের বিশ্বাসযোগ্য বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই মতের এবং তথ্যের বিভিন্নতা আমাদের বিহ্বল করে। রাজানুরোধে ও আনুকূল্যে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার মধ্যে 'রাজখণ্ড','বিশ্বসিংহ চরিতম্','রাজোপাখ্যান', 'সঙ্গীত শঙ্কর', 'হরিভক্তি তরঙ্গ', 'বেহারোদন্ত', 'মহারাজ বংশাবলী' প্রভৃতি প্রথম দিককার রচনা। এগুলি পুঁথি আকারে ছিল। পরে কিছু মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে অনেকগুলিই সহজ প্রাপ্য নয়। এই সমস্ত ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা থেকেই আমাদের বর্তমানে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তৎকালীন লেখকেরা তাঁদের নিজেদের মতকে ব্যক্ত করার জন্য অনেক সময়েই লোকশ্রুতি, লোকপ্রবাদ, লোকবিশ্বাসকে আশ্রয় করেছেন। তার সাথে পুরাণ কাহিনীও যুক্ত হয়েছে। আজকে কোচবিহারের ইতিহাসের কোন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে এদের রচনা ভিত্তি করলে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরেই সমস্ত আলোচনা পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কালে ছাপার অক্ষরে অনেকগুলি ইতিহাস রচিত হয়েছে, তবে দুঃখের বিষয় একটিও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়! কোচবিহার রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাসের সঠিক রূপ দেবার বিষয়ে ভাববার বিরাট অবকাশ রয়েছে এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও আছে।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল (১৭৮৩—১৮৩৯) সাহিত্য রচনার এক স্বর্ণ যুগ। রাজা স্বয়ং সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। তাঁর সভাকবিরা তাঁর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বহু প্রাচীন গ্রন্থ 'মানুষী ভাষায়' অনুবাদ করে সাধারণের মধ্যে কাব্যরস ও লোক-শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই অধ্যায়ে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাও ছিল। দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীর আজ্ঞায় এই সময়েই মুন্সী জয়নাথ ঘোষ 'রাজোপাখ্যান' নামে একটি বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন। শিব বংশীয় রাজাদের আবির্ভাব, রাজ্য গঠন এবং রাজ্য পালন ইত্যাদি নিয়ে রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল অবধি এই ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে। কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও একেবারে নির্ভুল নয়। পরে গ্রন্থটি রবিনসন সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। প্রত্যেকটি খণ্ডের বিবরণগুলি রাজকর্ম্মচারী হিসেবে প্রত্যক্ষদর্শীর ঐতিহাসিক বিবরণ বলা যায়। এই ইতিহাস রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ পাঠ করে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালও এই ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থটি কোচবিহার ইতিহাস আলোচনায় সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ স্থান গ্রহণ করার যোগ্য বলে অনেকে মনে করেন।

এর পরেই উল্লেখযোগ্য নাম 'বেহারোদন্ত' অর্থাৎ 'বেহারের ঐতিহাসিক বিবরণ।'

হরেন্দ্রনারায়ণ-পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ-পত্নী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবী এই ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। পরে কাকিনা এবং সাহিত্য-সভা কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি তৎকালীন যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার কতকগুলি বিশেষ দিকচিহ্ন নির্দেশ করে। সেই সঙ্গে রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদের কাব্য অনুরাগের এক অপূর্ব স্মৃতিচিহ্ন বহন করে। যদিও এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। নিরুপমা দেবীর আলোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা 'মহারাজ বংশাবলী'। এ যাবৎ এ গ্রন্থ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের লাল কাপড়ের বাঁধনে পুঁথি আকারেই সযতনে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ থাকলেও আজ অবধি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। কোচবিহার বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে অনুসন্ধিৎসু যে কোন মননশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তুলট কাগজে লেখা এই পুঁথিটি। পুঁথির আকার ১৩½×৪ ইঞ্চি। পুঁথির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫, চিহ্নিত পৃষ্ঠা সংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্ক ৩ এবং ৫ হতে ৩৫ পর্যন্ত দেখা যায়। পৃষ্ঠাঙ্ক চিহ্নিত না থাকার কারণ জানা যায় না। তবে মুদ্রিত বইতে যে ভাবে অনুক্রম বিন্যস্ত রয়েছে, তাতে সঠিক পথ অনুসরণ করা হয়েছে বলেই মনে করি। কয়েকটি পত্র মলিন হওয়ায় পাঠে অসুবিধে হলেও হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন। এটি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় কৃত পুঁথি তালিকার ৪নং পুঁথি। ইহা কোচবিহারে রচিত প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের বলিষ্ঠ উদাহরণ। এই গ্রন্থটি শিবেন্দ্রনারায়ণের সভাকবি রিপুঞ্জয় দাস এবং সংস্কৃত চর্চার প্রাণকেন্দ্র দিনহাটা মহকুমার গোবরাছড়া নিবাসী বিদ্যারত্ন উপাধিধারী পণ্ডিত কৃত গদ্যে রচিত। এই পুঁথি রচনায় রিপুঞ্জয় দাসের নাম সম্পর্কে কোন দ্বিমত না থাকলেও অন্য নাম বিষয়ে ভিন্ন মত দেখা যায়। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ কোচবিহারের ইতিহাসে দ্বিতীয় কবিকে বিদ্যারত্ন বলে উল্লেখ করেছেন অথচ ডঃ দাশগুপ্ত গৌর দাস-এর নাম সন্দেহ নিয়েই উল্লেখ করেছেন। তবে এই পুঁথিটি রিপুঞ্জয় দাসের বলেই বিশেষ পরিচিত। পুঁথির নাম বিষয়ে ডঃ দাশগুপ্ত 'রাজ বংশাবলী' বললেও 'মহারাজ বংশাবলী' নামটিই সঠিক মনে করা হয়। কারণ লেখকের নিজের মতেই শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরেই এই মহারাজ বংশাবলী (রাজ বংশাবলী নয়) রচিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। রচনাকাল বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করা যায় যে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর (১৮৪৭ খৃঃ) পরেই এই পুঁথি রচিত হয়েছিল, কারণ এখানে নরেন্দ্রনারায়ণের উল্লেখ করেই সমাপ্ত করা হয়েছে। লিপিকারের ও লিপিকালের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় গ্রন্থটি মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণী কামেশ্বরী দেবীর (ডাঙ্গর আই) আজ্ঞায় রচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে এই কালেই অনেকগুলি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল; কিন্তু লক্ষণীয় এগুলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এই বংশ বৃত্তান্তও সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস নির্ভর নয়। পৌরাণিক কাহিনীর সংযোগ এবং প্রভাব এখানে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বংশের উৎপত্তি সম্পূর্ণভাবে পুরাণ কাহিনী নির্ভর। এই পুঁথিটি যতদূর জানা যায় একখানাই আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশনায় লিপিকর প্রমাদ মূল রচনা

অনুসরণ করেই প্রকাশ করা হল। কেননা আমি মনে করি এ বিষয়ে চিন্তা এবং আলোচনার অবকাশ আছে। তাই পুঁথিতে যেরূপ বানান আছে অনুরূপ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সঙ্গে কিছু শব্দার্থ দেবার চেষ্টা করা হল। কামরূপী ভাষার সাথে সংস্কৃত শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আমাদের মনে হয় লেখক বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ভাষা, ছন্দ, উপমা বিষয়ে সবিশেষ দখল ছিল। গদ্য লেখার মধ্যেও কাব্যিক ছন্দ অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে। উপমা ব্যবহারে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। সন্ধিযুক্ত শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে স্থানীয় প্রচলিত কথ্য ভাষার প্রভাবও মাঝে মধ্যে দেখা যায়, যেমন ভয়ত>ভয়ে, হয়া>হইয়া, ছাওয়া>ছেলে ইত্যাদি। বিস্ময় হইয়া, প্রবেশ হইয়া বিশেষ্য পদের ক্রিয়া রূপে ব্যবহার এখানকার ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য।

পুঁথির মধ্যে কোন যতি চিহ্ন না থাকায় সেগুলি দেবার চেষ্টা করেছি।

পুঁথির শেষের দিকে বংশীনাথ দ্বিজ-কৃত 'শানিত্যাগামৃত' নামক একটি পুঁথির উল্লেখ থাকলেও তার সংবাদ লোকচক্ষুর অন্তরালেই আছে বলে মনে করি।

রাজ চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই পুঁথিকার মহাভারত কাহিনীকে তুলনা হিসেবে ব্যবহার করে রাজ মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। এখানে ইতিহাস ও পুরাণ কাহিনী যেন গঙ্গা-যমুনার মত মহা সঙ্গম ঘটেছে। এতে অনুমান করা যেতে পারে তৎকালে কোচবিহারে ধর্মগ্রন্থগুলি লোকমানসে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবার এও বলতে পারি যে নিরস ইতিহাসকে সরস করার প্রচেষ্টায় কিম্বা প্রসঙ্গক্রমে ধর্মীয় কাহিনীকে প্রচারের উদ্দেশ্যে কিম্বা কোচবিহারের বিভিন্ন মহারাজাদের চরিত্রকে মহিমান্বিত করার প্রচেষ্টা থেকেই হয়তো এরূপ রচনা বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব।

মহারাজা চন্দনের সময় থেকে এই রাজত্বের কথা অন্য ইতিহাসে পেলেও এখানে বিশ্বসিংহ থেকেই বংশ পরিচিতি আরম্ভ হয়েছে। সন তারিখ দেওয়া নেই। বিশ্বসিংহের জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তারপর বীরত্বগাথা, যুদ্ধ জয়, রাজধানীর নাম, পত্নী এবং পুত্রদের নাম এই পুঁথিতে উল্লেখ আছে। তবে এই নামের তালিকার সঙ্গে প্রচলিত ইতিহাসের অমিলও দেখা যায়।

এই বংশ তালিকায় দেখা যায় মোদনারায়ণের পর মহীন্দ্রনারায়ণের নাম আছে, কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ মোদনারায়ণের মৃত্যুর পর বাসুদেবনারায়ণ দু বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। মহীনারায়ণের পুত্রেরা ভুটিয়াদের সাহায্য নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করে রাজা বাসুদেবনারায়ণকে নিহত করেন এবং রাজপরিবারের অনেকের প্রাণ নাশ করেন। এই সংবাদ রায়কতগণ প্রাপ্ত হয়ে দ্রুত রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে তাদের পরাজিত করে প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র পাঁচ বৎসরের শিশু মহীন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসান। সুতরাং এখানে তালিকাটি এরূপ হওয়া উচিত ছিল—মোদনারায়ণের পর বাসুদেব বা বসুদেবনারায়ণ তারপর মহীন্দ্রনারায়ণ।

আর একটি স্থানেও রাজবংশ তালিকায় অনুরূপ অসামঞ্জস্য আমাদের চোখে পড়ে। রাজেন্দ্রনারায়ণের নাম এখানে উল্লেখ করা হয় নি। ইতিহাস মতে দেবেন্দ্রনারায়ণের পর ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু ভূটিয়া রাজ তাঁকে বন্দী করেন এবং মহারাজের দ্বিতীয় ভ্রাতা কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে তাঁরা সিংহাসনে বসান। তিনি মাত্র দু বৎসর রাজত্ব করার পরেই বিবাহের এক সপ্তাহ কাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন এবং পিতা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে উদ্ধার করেন। তবে মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করার পর অকাল মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করে। তখন ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ আবার রাজা হন। এই পুঁথিতে ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু বিষয়েও ভিন্ন মত দেখা যায়। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ লিখিত কোচবিহারের ইতিহাসে দেখা যায় যে রাজেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের সাত দিন পরে মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু এই পুঁথিতে আছে যে ধরেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের পর মৃত্যু হয়। মোট কথা আমরা ভেবে পাই না কিভাবে বা কেন উক্ত রাজাদের নাম এই পুঁথিতে তালিকাভুক্ত হয় নি।

এই পুঁথি থেকে জানা যায় মহারাজা নরনারায়ণ যে আদমসুমারীর ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে রাজ্যের লোক সংখ্যা ছিল 'সপ্তদশ লক্ষ'। তিনি এই পরিসংখ্যান দর্শনে খুশী হয়েছিলেন এবং জাতি ভেদে সুযোগ সুবিধের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা নরনারায়ণের সময় থেকেই যে শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ এখানেও পাওয়া যায়। এখানে যেমন পুরুষোত্তমের 'রত্নমালা' ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় অনুরূপ ভাবে মহারাজার সকৃত 'মল্লদেবী' নামে অভিধানের নতুন তথ্যও জানতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে ইহা দুষ্প্রাপ্য। এখানে নরনারায়ণকে রাজা ভরতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণের দিল্লীশ্বরকে জয় করার অভিনব কাহিনী এবং চারি পুত্রের অসীম বীরত্ব গাথা এতে আছে। এই তথ্যের ঐতিহাসিক সত্যতা বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগেও 'বেহার' নামটি সুপ্রচলিত ছিল তা এই গ্রন্থ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায়। হরেন্দ্রনারায়ণের আবির্ভাব বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক সুন্দর একটি ভাব প্রকাশ করেছেন। এতে দেখা যায় তিনি পূর্ববর্তী রাজাদের শুভ গুণ, শুভ লক্ষণ এবং বীরত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ধারণ করেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

মহারাজ বিশ্বসিংহ প্রথম পুত্রের মহাবল পরাক্রম দর্শন করে নাম দেন মল্লনারায়ণ এবং দ্বিতীয় পুত্রের বাহুদ্বয় শুক্ল হওয়াতে শুক্লধ্বজ নাম রাখেন। মল্লনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ নামকরণ কিভাবে হল তারও অভিনব তথ্য এই পুঁথি থেকেই জানতে পারি।

কোচবিহারে পূজিত ভগবতীর রূপ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে এখানে নতুন তথ্য আমাদের চোখে পড়ে। কিভাবে এই রূপ হল তা এখানে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে। দেবী মাহাত্ম্যও বাদ পড়ে নি। তারপর যুগচ্ছেদ, নিশাপূজা ইত্যাদি বিষয়েও জানতে পারা যায়। এমনকি খঞ্জন পাখীর কথাও বলা হয়েছে।

বানেশ্বর শিবলিঙ্গ উদ্ধার এবং তার সাথে সাথে বিভিন্ন রাজাদের আমলে শিবমন্দির বা শিবলিঙ্গ স্থাপনের তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। অনেক সময়ে রাজা, রানী, রাজপুত্র

সবাই মিলে বিভিন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছেন। কামাখ্যা মন্দির বিষয়ে যে প্রবাদ চালু আছে তারও উল্লেখ এখানে বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। দেবমন্দির স্থাপন বিষয়ে রাজাদের বিশেষ উৎসাহের সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি। হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে সুন্দর শোভন রথ তৈরী করে যে রথযাত্রা হত তারও উল্লেখ আছে।

নরনারায়ণের সময় থেকেই এই বংশ 'নারায়ণ' উপাধি খ্যাত হয়।

নরেন্দ্রনারায়ণকে শিবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র বলা হয়েছে কিন্তু তিনি ছিলেন পোষ্য পুত্র।

ত্রিশ্রতা (ত্রিস্রোত—তিস্তা) নদীর উৎপত্তি বিষয়ে এখানে একটি নতুন তথ্য পাওয়া যায়। 'বান রাজা মহাদেব মহাদেবীকে সাধনায় সন্তুষ্ট করার পর ভগবতী বলিল জে বৎস বান জে স্তন ক্ষির পান করিয়া গণপতি কার্ত্তিক সর্ব্বত্র জয় হইল, তাহা তুমি পান কর। এমত বলাতে দৈত্যেন্দ্র পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া স্তন পানাকাঙ্ক্ষি হইয়াছেন। স্তন নিষ্পিরণ করাতে পর্ব্বত ভেদ হৈয়া বানের মুখে ক্ষির ধারা পতন হওনে তার এক ধারা পর্ব্বত ভেদ করিয়া ত্রিশ্রতা নামক নদী প্রবাহযুক্ত হৈয়াছে।' কালিকা পুরাণের সাথে এই তথ্যের মিল আছে।

কোচবিহারের আলো বাতাসের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। কোচবিহারকে তাই ভালবাসি। ভালবাসি কোচবিহারের মাটী আর মানুষকে। শ্রদ্ধা করি কোচবিহারের ঐতিহ্যকে আর গৌরবময় ইতিহাসকে। তাই ক্ষ্যাপা যেমন খুঁজে ফেরে পরশ পাথর, আমিও খুঁজতে বেরিয়েছিলাম ইতিহাসের উপাদান আর সংস্কৃতির হারিয়ে যাওয়া পরশ পাথরকে। সেই পথের এক সংগ্রহ এই পুঁথি। এই পুঁথি যাতে হারিয়ে না যায়, তাই প্রকাশনার দায়িত্ব নিলাম আমি। দায়িত্ব নয় কর্তব্যই বলা চলে। শ্রদ্ধা বিনম্র এই প্রচেষ্টায় হয়তো অনেক ত্রুটি আর অসম্পূর্ণতা থেকে গিয়েছে, কিন্তু আপনাদের সকলের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টির আলোকে প্রথম সশ্রদ্ধ প্রচেষ্টার মাপকাঠিতে আশা রাখি ক্ষমা পেয়ে যাব।

আমার এই প্রচেষ্টায় অনেকের কাছ থেকেই সহৃদয় আশীর্বাদ এবং সাহায্য পেয়েছি। সবার নাম উল্লেখ না করলেও কয়েকজনের নাম না বলে পারছি না। সর্বপ্রথমেই বলতে হয় সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকারদ্বয় ডঃ ভবতোষ দত্ত, ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় এবং দিনহাটা কলেজের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু দে মহোদয়গণের কথা। এঁদের পরামর্শ, আশীর্বাদ এবং উৎসাহ আমাকে সব সময়েই এগিয়ে যাবার সাহস জুগিয়েছে। তারপর প্রবীণ পণ্ডিতবর শ্রীজগদ্বন্ধু পাঠক, পঞ্চতীর্থ মহোদয় আমার পাশে বসে থেকে পুঁথি পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেন। এই বয়সেও তিনি যেভাবে আমার জন্য উৎসাহ দেখিয়েছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। পুঁথি প্রকাশে এবং নানা সুযোগ দানে ও অনুমতি দানে ভারপ্রাপ্ত সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীনিখিলকুমার মানী, গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শীল এবং শ্রীরাণুচন্দ্র দে আমায় অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। নাগরিক পত্রিকা সম্পাদক শ্রীতরুণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং কোচবিহার সমাচার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কোচবিহার বিষয়ে আমার নানা লেখা তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করে যে উৎসাহ দিয়েছেন তার জন্য আমি ধন্য। সাহিত্যিক বন্ধু ডঃ দিগ্বিজয় দে

সরকার এবং বন্ধুবর গবেষক শ্রীমৃণালকান্তি দাম ও শিক্ষক শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ আমার এই পুঁথি প্রকাশ বিষয়ে যে ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। পাণ্ডুলিপি বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি স্নেহাস্পদ শ্রীরতনকুমার ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। তুলনামূলক আলোচনায় এবং প্রসঙ্গ বিন্যাসে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ লিখিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। মুদ্রণ বিষয়ে অনেক ধন্যবাদ জানাই ইঙ্ক-ও-প্রিন্ট-এর পরিচালক শ্রীপ্রণব মজুমদার ও অন্যান্য সহৃদয় বন্ধুদের।

সর্বশেষে আমার পরমপূজ্য মা, বাবার আশীর্বাদ নিয়ে আর আমার ছোট্ট মেয়ে মুক্তার আবদারে যে প্রচেষ্টা নিয়েছি তা যদি সার্থক হয়, তবে এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

'স্নেহলতা'
হাজরাপাড়া,
কোচবিহার।

নৃপেন্দ্রনাথ পাল

আমাদের ইতিহাস চর্চা, গদ্য চর্চা এবং মহারাজ বংশাবলী

১

প্রাচীন ভারতবর্ষে বহু রকম বিদ্যার চর্চা হয়েছে, জ্যোতিষ, ছন্দ, ব্যাকরণ, গণিত, দর্শন, জ্যামিতি, ভেষজ, শল্যবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা ইত্যাদি আরও কি। কিন্তু যে শাস্ত্রের চর্চা করে নি বলে আমরা বিস্মিত হই তা হল—ইতিহাস। যে ধরনের মনীষী ভারতবর্ষে ছিলেন না তা হল হেরোডটাস বা যুকিদিদেসের মত মনীষী।

ব্যুৎপত্তিসূত্রে ইতিহাস নাকি 'ইতি হ আস'—যার অর্থ 'এইরকমই ছিল'। ঘটনবর্ণনের এ ব্যাখ্যা আধুনিক। কারণ এ রকম ঘটনবর্ণনের কোনও নিদর্শন আমরা কখনও পাই নি। 'এইরকমই ছিল' বলে যা বলা হত, তা স্থান পেয়েছে পুরাণে। পুরাণই তাই প্রাচীনকালের ইতিহাস। পুরাতন কাহিনীর স্থান রয়েছে বলে—কিন্তু সেই অর্থেই শুধু নয়, পুরাণে বর্ণিত ইতিহাসের ধরনটাই ছিল অন্যরকম বলে। আধুনিক পরিভাষায় methodology ছিল এর আলাদা। এতে মীথ (myth) যেমন আছে—যাকে আধুনিক পণ্ডিতেরাও মিথ্যা মনে করেন না, মনে করেন মানবসভ্যতার শৈশবসত্য বলে—তেমনি আছে বংশানুচরিতও।

সবাই জানেন পুরাণের পাঁচ ভাগ। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। সর্গ অংশে পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব বা cosmology, প্রতিসর্গ অংশে প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি, বংশ মানে দেবতা ও ঋষিদের বংশবর্ণনা, মন্বন্তর হল মনুগণের শাসনকাল এবং বংশানুচরিত মানে রাজাদের বংশের ইতিহাস অর্থাৎ বিভিন্ন রাজবংশের বিভিন্ন পুরুষের নামের তালিকা এবং তাঁদের কার্যাবলীর বিবরণ। সে কার্যাবলী যতই অলৌকিক ঘটনা ও কীর্তিতে খচিত হোক না কেন। পুরাণে লৌকিক ও অলৌকিক, স্বপ্ন ও বাস্তব, সত্য এবং কাল্পনিকতা এগুলির পার্থক্য মানবশিশুর জগতের মতই একাকার ছিল।

বংশানুচরিত বর্ণনে পুরাণকারগণ যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তা আধুনিক পণ্ডিতদের কাছেও প্রশংসনীয় এই কারণে যে লিপিবদ্ধ ইতিহাস না থাকলেও কেবল শ্রুতিপরম্পরায়, বংশ পরম্পরায় বাহিত হয়ে আসা এই নামের তালিকা ও ক্রম মোটের উপরে খুব একটা এদিক ওদিকও হয় নি। সগর রাজার ছেলে অসমঞ্জ, অসমঞ্জের ছেলে অংশুমান, অংশুমানের ছেলে দিলীপ, দিলীপের ছেলে ভগীরথ—এই ক্রম যেমন রামায়ণে তেমনি মৎস্যপুরাণেও বর্ণিত হয়েছে। যদু বা সাত্বত বংশের ক্ষেত্রেও তেমনি। বৈবস্বত, ইল, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ, যযাতি তারপর যদু। যদুর ৫৭তম পুরুষ পরে জন্মেছিলেন বৃষ্ণি, তার ১১শ পুরুষ পরে মধু, তার ৫ম পুরুষ পরে সত্বত, সত্বতের পুত্র অন্ধক, অন্ধকের ১০ম পুরুষ পরে বসুদেব, বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, তার পুত্র অনিরুদ্ধ। অবশ্যই কৃষ্ণের জীবিত কালেই যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সব

নামগুলি লিখলাম না—কেননা তার কোনও দরকার নেই। কিন্তু আসল কথা সব জায়গাতেই একই নাম ও ক্রম।

এমন ক্রম বর্ণনা সেমেটিক জাতির আদি পুস্তক বা Old Testament বা পরবর্তীকালে প্রটেষ্টাণ্টদের বই New Testament-এও প্রযোজ্য। যেমন Son of David, Son of Abraham, Abraham begat Jacob, and Jacob begat Judas, and Judas begat Phares, and Phares begat Es-ram, and Es'ram begat A'-ram এইভাবে বহু পরে গেলাম E-li'-ud begat, E-le-a-zar, and E-le-a-zar begat mat'than and mat'-than Jacob; And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ—এই রকম তিন চোদ্দং বেয়াল্লিশ পুরুষের নাম মনে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। নিশ্চয়ই শ্রুতিবাহিত হয়ে অসংখ্য প্রজন্ম পেরিয়ে এই ক্রম রক্ষা করা প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে সাধাবণ একটা প্রবণতা ছিল। অতি প্রাচীনকালের ইতিহাস এই গল্প ও ক্রমের মধ্যেই রয়েছে।

এই রকম পৌরাণিক ক্রমের মধ্যে তাই লুকিয়ে আছে ইতিহাসের জড়। ঐতিহাসিকেরা সেজন্য পুরাণকথা, লোককথা, কিম্বদন্তী কোনটাকেই উপেক্ষা করেন না। বরং কী পদ্ধতিতে সেগুলির মধ্যে থেকেও সত্য নিষ্কাশন করা যায় সেইটাই তাদের নিয়ত চিন্তার বিষয় হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে বাহিত হয়ে আসা এই প্রবণতার জন্য আমরা পুরাণ পাই, পৌরাণিক অনুষঙ্গ পাই, কিন্তু বিশুদ্ধ বাস্তব ঘটনার বিবরণ বা বর্ণনাপূর্ণ ইতিহাস আমরা পাই না। অল্প সংখ্যক বিবরণ যা আছে কল্হনের রাজতরঙ্গিনী, বাণভট্টের হর্ষচরিত, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা বাকপতিরাজের গৌড়বহো ইত্যাদি সবগুলির মধ্যেই ইতিহাস এবং কিম্বদন্তী, সত্য ও মিথ্যা, ঘটনা ও চাটুকারিতা, কল্পনা ও অতিশয়োক্তি সবই একাকার। তবু এগুলির মধ্য থেকেই কাজ চালাবার মত সত্য বার করে নিতে হয়—প্রথমত অন্য কোনও পাথুরে প্রমাণ এর সহায়ক কিনা দেখে; দ্বিতীয়ত পরস্পর-নিরপেক্ষ অন্য কোনও গ্রন্থে একই বস্তু বা ঘটনার উল্লেখ আছে কি না মিলিয়ে।

২

সারা ভারতবর্ষের মত প্রাচীনকালে বাংলাদেশেও আমরা এমনি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হতে দেখি নি। দেখলে—রাজা শশাঙ্ক কিংবা তাঁর আগে-পরে অন্য কারা ছিলেন সে সম্বন্ধে জানতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শশাঙ্কের যুগ, মাৎস্যন্যায়ের পর্ব, গোপাল থেকে আরম্ভ করে সেন রাজাদের পর্ব পর্যন্ত এমন সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ কেউ লিখে রাখেন নি। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান আমলেই এই ঐতিহাসিক চেতনা তাদের রচিত বিবরণীগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। আকবরনামা বা আইন-ই-আকবরি, কিংবা ময়ের-উল-মতাক্ষরীণ, তবাকত-ই-নাসিরী ইত্যাদি গ্রন্থাবলী এর প্রমাণ।

বাংলাদেশে পাল আমলে, সেন আমলে শুদ্ধ ইতিহাস কেউ লেখেন নি। কিন্তু পার্শ্ববর্তী অহোম রাজ্যে অনেক আগের থেকেই 'বুরুঞ্জী' লিখবার প্রথা ছিল। 'বুরুঞ্জী'

প্রকৃতপক্ষে গদ্যে লিখিত রাজবংশাবলীর কীর্তিকাহিনী। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা যে আমলে সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করছি—মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণব সাহিত্য; নাথযোগী সিদ্ধাদের কাহিনী বা বিভিন্ন অনুবাদ কাহিনী যেমন ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত; আরাকান-রোসাঙ্গ রাজসভার ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক প্রণয় কাহিনী বা আরবী-পারসিক কথা বস্তু; যে আমলে আমরা গদ্যে লেখার কথা ভাবি নি —সে আমলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তাঁরা লিখে গেছেন বিভিন্ন 'বুরঞ্জী'গুলি। গদ্যে বর্ণনা করে গেছেন রাজাদের পরম্পরার কীর্তিকাহিনাগুলি।

অন্যদিকে এই সূত্রে আসামে গদ্যচর্চার যে সুস্থিত ধারা গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে তা হতে অনেক দেরি হয়েছিল। আমাদের ধারণা বাংলা গদ্যের বিকাশ অনেক আগেই হতে পারত যদি কোনওভাবে ইতিহাস রচনার কোনও বাসনা এদেশে জাগত। কিন্তু আত্মবিস্মৃত এই জাতি সে রকম কোনও চেষ্টাই করে নি।

৩

এই সার্বিক ইতিহাস-বোধহীনতার মধ্যে কামতা-কামরূপ-'বেহার' (কোচবিহার) বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। কী প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শনে ব্যবহৃত চিঠিতে, কী সংস্কৃত-চর্চা, সংস্কৃত-পৌরাণিক ভাবের চর্চা এবং কী ইতিহাস রচনায়—এই অঞ্চলের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। নিঃসন্দেহে এই ভূমিকা পালিত হয়েছে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কখনও বা nobles বা রাজপাদোপজীবী অভিজাত ব্যক্তি অথবা রাজপরিবারভুক্ত কারও পৃষ্ঠপোষকতায়। এই সঙ্গে অবশ্য স্মরণ করা প্রয়োজন যে ইতিহাস-চর্চা এ অঞ্চলে হয়েছে তা কিন্তু খুব বেশি আগেকার আমলের নয়। ···রাজার দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীর আদেশে মুনসী জয়নাথ ঘোষ 'রাজোপাখ্যান' লিখেছিলেন; হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী বৃন্দেশ্বরী দেবী লিখেছিলেন 'বেহারোদন্ত'। একই সময়ে, হয়তো বৃন্দেশ্বরী দেবীকে ইতিহাস রচনা করতে দেখে উৎসাহিত হয়ে, হয়তো বা ঈর্ষান্বিত হয়ে শিবেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী (ডাঙ্গর-আই, ডাঙ্গর অর্থে বড়ো এবং আই মানে মা; অর্থাৎ বড়-মা—বড়রাণীকে আদরে ও শ্রদ্ধায় প্রজাসাধারণ যা বলে ডাকত) কামেশ্বরী দেবী ইতিহাস রচনার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে জনৈক রিপুঞ্জয় দাস 'মহারাজ বংশাবলী' রচনা করলেন। এমনি রচিত হয়েছিল 'রাজখণ্ড', শ্রীনাথ ব্রাহ্মণকৃত সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'বিশ্বসিংহ চরিতম্' এছাড়া 'সঙ্গীতশঙ্কর' দুর্গাদাস রচিত 'হরিভক্তি তরঙ্গ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও ঐতিহাসিক উপাদান সমাহরণের জন্য উল্লেখ্য।

আমরা অবশ্য কেবল 'মহারাজ বংশাবলী'-র কথাই আলোচনা করব। পূর্বোক্ত ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র প্রকাশিত হয়েছিল 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থখানি। কিন্তু 'মহারাজ বংশাবলী' ছিল হাতের লেখা পুথিতে নিবদ্ধ। এই গ্রন্থখানি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথিসমূহ থেকে উদ্ধার করে এবং ছাপিয়ে বার করে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ পাল সকল বিদ্বানদের ধন্যবাদ ভাজন হলেন। ইতোপূর্বে 'গোসানী মঙ্গল' সম্পাদনা করে শ্রীপাল প্রশংসনীয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। মহারাজ বংশাবলী গ্রন্থ প্রকাশও তাঁর

'অবিচল বিদ্যোৎসাহিতার প্রকাশ। কেননা পুরানো হাতের লেখা পুথি থেকে পাঠ উদ্ধার করে তাকে মুদ্রণযোগ্য করার কাজটা খুব শক্ত। আমি নিজেও নৃপেনবাবুর সহায়তায় পুথিটি সম্পূর্ণত দেখেছি আর তাই বুঝেছি প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত এই পুথির সম্পূর্ণ শুদ্ধপাঠ গ্রহণ করা কত কঠিন। অথচ শ্রীপাল সত্য ও শুদ্ধ পাঠের জন্য সর্বদা অতৃপ্তচিত্ত। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রদত্ত এই পরিবর্তিত পাঠই তার প্রমাণ।

৪

রিপুঞ্জয়ের নিবাস ছিল দিনহাটা মহকুমার গোবরাছড়া গ্রামে। কিন্তু 'মহারাজ বংশাবলী' খুব বেশি পুরাণো বই নয়। কেননা যে মহারাজার মহিষীর অনুরোধে রিপুঞ্জয় দাস এই রাজোপাখ্যান লিখেছেন, সেই মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ১৮৩৭ থেকে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অতএব এই গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এ কাল থেকে তা খুব বেশি আগে রচিত না হলেও এর সর্বাঙ্গে আমাদের প্রাচীন পুরাণেতিহাসের ছাপ রয়ে গেছে। আর রয়ে গেছে একশো দেড়শো বছর আগেকার বাংলা গদ্যের পরিচয়। কিম্বদন্তী, অলৌকিক আখ্যান, কলিযুগ সনের উল্লেখ, পৌরাণিক অনুষঙ্গ, দেবতাদের সংযোগ ইত্যাদি আমাদের দেশীয় ইতিহাস রচন-প্রণালীর বা Indigenous methodology of History-র সাক্ষ্য বহন করছে—অন্যদিকে এর মধ্যে রয়েছে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্বের অন্বয়গত অস্বস্তি।

৫

বাংলা গদ্যের সন-তারিখযুক্ত প্রাচীনতম নিদর্শন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের অহমরাজ চু-কাম্-ফা স্বর্গদেবের কাছে প্রেরিত চিঠি। 'অথন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে'... এই গদ্যের অস্বস্তি ১৮৩৭-৪৭ খৃষ্টাব্দে কেটে যাওয়া উচিত ছিল। আড়াইশো-তিনশো বছর কি গদ্য বিকশিত হবার পক্ষে যথেষ্ট সময় নয়? কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় নি। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যিক ভাষার মূলে কোনও বিশেষ অঞ্চলের উপভাষার দান থাকে। আমাদের গদ্য কিন্তু মধ্যবাংলার কামরূপী উপভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি। আমাদের প্রধান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র স্থানান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে চলে এসেছে তোরষা-মহানদী পেরিয়ে গঙ্গা-ভাগীরথীর কূলে বেহার-গৌড়-মুরশিদাবাদ ছাড়িয়ে কলকাতার আশেপাশে। পাদ্রী মানো এল দ্য আস সুম্পসাম্ রচিত 'ক্রেপার শাস্ত্র অর্থ, ভেদ' (১৭৩৫) খৃষ্টীয় ধর্মান্তরিত দোম আন্তোলিও-র 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (মুদ্রণ ১৭৪৩) না হয় লিসবন-কেন্দ্রিক, কিন্তু শ্রীরামপুরে ইংরেজ ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের প্রেস এবং ওধারে (১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখা গদ্য গ্রন্থগুলি তো কলকাতাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। এই সব গদ্য গ্রন্থে সর্বত্র যে বাংলা বাক্রীতি শুদ্ধভাবে অনুসৃত হতে পেরেছিল তা নয়—তার জন্য রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রতিভার প্রযোজন ছিল—প্রয়োজন ছিল দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত এদের সকলেরই যৌথ প্রয়াস।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বেদান্তসার রচিত হয়েছে। তারপর ১৮৩৩ পর্যন্ত ক্রমাগত লিখে গেছেন রামমোহন। ১৮১৮-তে শ্রীরামপুর থেকে সমাচার দর্পণ বেরিয়েছিল—তারপর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল অজস্র সাময়িক পত্র। গদ্যকে অর্থভূয়িষ্ঠ নির্দিষ্ট রূপে নিয়ে আসতে এদের দানও তো কম নয়। বস্তুত তোরষা-র পারে কোচবিহারে 'মহারাজ বংশাবলী' যখন রচিত হয় (১৮৩৭-১৮৪৭) তখন দক্ষিণ বাহিনী নদীর মোহানার কাছে, ভাটির দিকে, অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। সে সব পরিবর্তন উজানবাহিনী হয়ে কোচবিহারে রচিত ইতিহাস গ্রন্থের গন্তকে যে প্রভাবিত করে নি, তা বইটি পড়লেই বোঝা যাবে। টানা লাইনগুলি আলাদা আলাদা বাক্যে ভেঙে দেখাচ্ছি :

১ একদিগে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ভস্মলেপন অন্যদিকে রক্তসাটী আগরচন্দনে ভূষিত

২ এইরূপ নলনার লক্ষণে লক্ষিত অতুল মৃতুন স্থললিত জ্ঞান হয়

৩ অন্য অর্দ্ধভাগ দিব্যপুরুষকার স্থদৃঢ় বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর বিস্তার বক্ষ

৪ সকল লোকের হিত অর্থে হৈমবতী

৫ সতী হরের দেহর অর্দ্ধহরণ করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া হিমাচলের প্রস্থতে বিবিধ বিহার করিতেছে

৬ জে আদ্যা সনাতনি ব্রহ্মমই রাধারূপা লক্ষীরূপা বাকৃরূপা সাবিত্রীরূপা তাহার পাদপদ্মে প্রণাম করি

৭ ভবসমুদ্রে গম্ভীরতরণতরণীরূপ বিপ্রপাদপদ্মে প্রণতপূর্ব্বক বলি

৮ শ্রীশ্রীকামেশ্বরী কমতেশ্বরীতি নামে শিবেন্দ্রনৃপবনিতা মহামন্ত্রীস্থানে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে আমার শ্বশুর বংসের আদিঅন্ত তারা সকলের যশস্যা কিৰ্ত্তি কি প্রকার তাহা বল

৯ এমত আদেশ করাতে শ্রীভগবান ব্রহ্মা হৈতে পুত্র লইয়া মহারাজ বংস ও তাহার যশস্যা শুকৃর্ত্তি বিস্তারিত রূপে জে বলিয়াছে তাহা পদবন্দে বলি

১০ খির সকল শ্রবণ কর

১১ সেই জগতকল্যাণদায়িনীর অংশ শ্রী মাধবি নাম নায়িকা একদিবস বসন্ত ঋতু যোগে এক স্বরবনে শিবের সেবা করাতে চঞ্চল বাত্যায় গাত্র পর্শ হওাতে দেবদেব নায়িকা প্রতি কামভাব প্রদর্শন করিলে পতি ('পত্নী' হবে নিশ্চয়ই) সান্নিধানে পুর্ব্বে মহাদেব অন্য স্ত্রী সঙ্গ করিবে না এমত প্রতিজ্ঞা করে এহেতু অঙ্গ-সঙ্গ হৈল নাম

১২ (কামভাব ?) দর্শন করিয়া মাধবি নায়ীকা প্রতি বলিল তুমি নরযোনি প্রাপ্তে মহাদেবের অংস ঈসান সহিত অঙ্গসঙ্গ হও

১৩ গনপত্তি পুত্রের অংস বিশ্বসিংহ নৃপতি জন্ম হবে

১৪ পরে মাধবি ঈশ্বরীর আজ্ঞানুসারে পশুরাম ভরত খেতৃশংকোচ যোনি পাইয়া হিরা নাম খ্যাত হয়া ঈশান সঙ্গ হয়া

১৫ জদ্যপি হিরা মহাদেবির অংশ না হয় তবে শিবের প্রতিজ্ঞা সত্য কি প্রকারে থাকে

১৬ অপর কুশানুয়ে তার রেত কি প্রকারে ধারণ করিবে

১৭ যে শিব রেতস ধারণে অগ্নি অসমর্থ হৈয়া গঙ্গাতে ত্যাগ করেন তিনি বহুদিন ধারণ করিতে না পারিয়া শস্ত বনে ত্যাগ করিয়াছেন

১৮ অতএব ঈশ্বরীর প্রধানাংশ না হইলে কুসাম্বুয়ে তার রেতশ কুসাম্বুকে ধারণ করার ক্ষমতা কি

১৯ জদ্যপি গনপতির অংস বিশ্বসিংহ না হয় তবে নৃপসিংহ সকলের অগ্রগণ্য ধীর সকল কি কারণে গণনা করে

২০ সেই ঈশান ঔরসে হিরা গর্ব্বে সিংহ পরাক্রমি নৃপ বিশ্বসিংহ চিকিনা পর্ব্বতে জন্মধারণ করিয়া বালক্রীয়া কিসোর বএশ পর্য্যন্ত করিতেছিল

২১ কলিযুগে চতুর্থ সহস্র ছয়শত দশ (৪৬১০) গতাব্দার মধ্যে কোন এক দিবস মদন বৃক্ষতলে ক্রিয়া করাতে ঐ স্থানে ঈশ্বর ঈশ্বরী সাক্ষাত হৈয়া অনস্ত নাম আসন কপিধ্যজ নাগফণা সেতছত্র ময়ুরপুচ্ছ নিম্মিত ব্যেজন ধবলচামর দেববাদ্য দুন্দুভি ডিমডিম পতাকা ও বেত্র এই সকল রাজচিহ্ন প্রদান করিয়া গঙ্গা পূর্ব্বপারাবধি উদয়াচল প্রর্য্যন্ত অভিষেক করিয়া রাজা করিয়াছে

পাঠকগণ ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই পৌরাণিক অনুষঙ্গ এবং অগূঢ়বদ্ধ গদ্য এই দুইয়ের জন্যই ইতিহাস পাঠের ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু আগেই বলেছি দেশীয় ইতিহাস রচনার প্রণালীই এই রকম। আর গদ্য তো তখনও পর্যন্ত অপুষ্ট হাতিয়ার।

৬

রাজা বিশ্বসিংহ যে তথাকথিত আর্যক্ষত্রিয় বংশের নন অথচ তাঁকে যে ভারতীয় মনের কাছে গ্রহণযোগ্য শুধু নয় শ্রদ্ধার যোগ্য করে তুলতে হবে এজন্য পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণা ও দেবদেবীর আগমন দেব অংশে জন্মগ্রহণ বার্তা শোনাতে হয়েছে। —Divine origin of the state কি একেই বলে? অবশ্য ব্যাপারটা নতুন নয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রথমে ব্যাধ ও পরে রাজা কালকেতুর জন্মের পশ্চাতে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের ঘটনাকে আনতে হয়েছিল। বিশ্বসিংহের জন্মকে দৈবসংস্পর্শযুক্ত করার জন্যও সুনিপুণ ভাবে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বর্ণনা দিয়ে মহারাজ বংশাবলী সুরু হল। [বাক্য ১-৫]। অতঃপর বিশ্বসিংহের মাতা 'হিরার' মহাদেবীর অংশে জন্ম বলে জানানো হল। [বাক্য ১৪-১৫]। তথাকথিত ক্ষত্রিয় বংশে না জন্মানোর কারণ পরশুরামের ভয়? [বাক্য ১৪]। বিশ্বসিংহ তেমনি গণপতির অংশে জন্মেছেন বলা হল [বাক্য ১৯]। স্বয়ং মহাদেবের ঔরসে জন্মেছেন বিশ্বসিংহ অতএব 'হিরা' মহাদেবীর অংশ না হয়ে যান কোথায়। এ বিষয়টি সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্য বিপরীত প্রশ্ন করা হচ্ছে [বাক্য ১৬-১৮]। প্রশ্নগুলি নিশ্চয়ই পৌরাণিক আবহাওয়া ও অনুষঙ্গ বহন করছে।

কেননা বামন পুরাণে আছে অগ্নি মহাদেববীর্য ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর ত্বগস্থি মাংস রক্ত মেদ মজ্জা রোম কেশ সবই হিরণ্যবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এইজন্য অগ্নি হিরণ্যরেতা। পরে অগ্নি সেই বীর্যধারণে অসমর্থ হলে তা শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়। এখন যদি হীরা না মহাদেবীর অংশ হন তবে তিনি কীভাবে মহাদেববীর্য ধারণ করলেন? লক্ষণীয় যে

মহাদেবই যে বিশ্বসিংহের পিতা এটা আগে ধরে নিয়ে তবেই প্রশ্ন করা হয়েছে 'জদ্যপি হিরা মহাদেবির অংশ না হয় তবে শিবের প্রতিজ্ঞা সত্য কি প্রকারে থাকে (বাক্য ১৫) ? কেননা পূর্বে শিব 'অন্য স্ত্রী সঙ্গ করিবে না এমত প্রতিজ্ঞা করে' এবং পত্নী সন্নিধানে এই প্রতিজ্ঞার জন্যই তো হরগৌরী অর্ধনারীশ্বর 'এ হেতু অঙ্গসঙ্গ হৈল নাম' (বাক্য ১১)।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে আসামের বুরঞ্জীগুলিতেও বিশ্বসিংহের এই তথাকথিত divine origin স্বীকৃত ও বর্ণিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় অংশটি কৌতূহলী পাঠকের মিলিয়ে দেখার সুবিধার জন্য উদ্ধৃত করছি :

…পাছে কোঁচানৰ অথচ কোঁচবেহাৰ বিশ্বসিংহ ৰাজা, ঐ বিশ্বসিংহ ৰাজা বংশসম্ভূত তদবিৱৰণ সংক্ষেপ মতে লিখা গ'ল। ৬৯ ॥

বিশ্বসিংহৰ বংশ—

কোচবেহাৰত হাড়িয়া নামে একজন কছাৰী আছিল। তেওঁৰে হীৰা ও জীৰা নামেৰে দুইটি স্ত্রী আছিল। ঐ হাড়িয়া কছাৰী পৰ্ব্বতত কপাহ খেতি কাৰণ নিত্যে প্রাতসে যাই কোদাল পাৰে। দু প্রহৰ সময় হলে, ঐ দুই স্ত্রী মধ্যে হীৰা বা জীৰা এটা চৰুৰ মধ্যে পঁইতা ভাত, মদ্য, মাংস লৈ ঐ পৰ্ব্বতে যাই দিয়ে। তাকে ভোজন কৰে, আৰু স্ত্রী ভাণ্ড লৈ গুচি ঘৰলৈ আহে। হাড়িয়া পৰ্ব্বতত কোদাল পাৰি থাকে। সন্ধ্যা সময় আপোন ঘৰে আহে। ৭০ ॥

মহাদেৱৰ মোহ—

একদিন হীৰা ঐ মত পঁইতা ভাত, পোৰা মাছ, মদ মূৰতকৈ গৈছিল। মধ্যে বাটতে ঈশ্বৰ মহাদেৱ ঐ হাড়িয়াৰ ৰূপ ধৰি এক গছৰ তলে আছে। হীৰা যাই আপোন স্বামী হেন জানি তেওঁকে ঐ খাবৰ সামগ্ৰী দিয়াত ভোজন কৰিলে। তাৰ পাছে ঐ হীৰা সহিত কামকৌতুক শৃঙ্গাৰ কৰি গ'ল। ও হীৰাও ভাণ্ড লৈ আপোন গৃহে গ'ল। কিন্তু হাড়িয়া দুই প্ৰহৰ সময় ভাৰ্য্যাক মদ্য ভাত না পাই ক্ষুধাতুৰ হৈ আপোন পত্নীৰ প্ৰতি অত্যন্ত ক্ৰোধ হ'ল। কিছোক্ষণ কোদাল পাৰি পৰ্ব্বতে আছিল। পৰে ক্ষুধাতে আতুৰ হৈ আপোন গৃহে দুই ভাৰ্য্যাক অনেক তৰ্জ্জন গৰ্জ্জন কৰিলে। পৰে হীৰা নাম্নী স্ত্রী উপনীত হৈ কলে, "অমুক গছৰ তলে তুমি বহি আছিলা। মই মদ, ভাত লৈ যাওঁতে তাতে বহি খালা, আৰু মোৰ সহিতে সম্ভোগো কৰিলা। এতিয়া কিয় মিছা মাতা ?" এই মত কোৱাতে হাড়িয়া অত্যন্ত কোপিত হৈ কোনোৱা লোকৰ সহিত সম্ভোগ কৰিলি বুলি মাৰিবৰ জন্যে খেদি গ'ল। তাৰ পাছে হীৰা পতিৰ ক্ৰোধ দেখি পলাই স্থানান্তৰ হ'ল। ৭১ ॥

হাড়িয়াৰ সপোন—

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সময় হোৱাতে হাড়িয়া মনত দুখেৰে ৰাতি শয়ন কৰি থাকিল। নিদ্ৰা অহাতে ঈশ্বৰ মহাদেৱ সপনত দেখা দি কলে, "মই মহাদেৱ, তোৰ ভাৰ্য্যা হীৰাই মদ্য, মাংস ও ভাত লৈ গৈছিল। অমুক গছৰ তলে তোৰ ৰূপ ধৰি মই খালোঁ; আৰু তোমাৰ ভাৰ্য্যাকো ৰমণ কৰিছোঁ। তাইৰ গৰ্ভত ল'ৰা এটি জন্ম হব। সেই বাহুবলী ৰাজা হব। তই তোৰ ভাৰ্য্যাক ঈৰ্ষা নকৰিবি।" এই বুলি মহাদেৱ অন্তৰ্ধ্যান

হ'ল। হাড়িয়াও এই কথা নিশ্চয় জানি ঈর্ষা পৰিত্যাগপূৰ্ব্বক প্ৰাতঃকালে বিচাৰি হীৰাক আপোন ঘৰে আনিলে। ৭২ ॥

বিশ্বসিংহৰ জন্ম—

পাছে কালক্ৰমে প্ৰসৱ হৈ ল'ৰা এটি জন্মিল। সেই সময় অনেক সুমঙ্গল বাদ্যভাণ্ড হৈছিল। সেই বালকৰ নাম বিহু ৰাখিলে। তাৰ পাছে হাড়িয়া মণ্ডল হ'ল। এই কাৰণে হাড়িয়া মণ্ডল বোলে। অতঃপৰ ঐ বিহু ক্ৰমে কৌমাৰ কাল প্ৰৱেশ হোৱাত গৰু চাৰিবৰ কাৰণে গোৰক্ষক হৈ অল্প কালৰ মধ্যে বৰগৰখীয়া নাম খ্যাত হ'ল। তাৰ পাছে মণ্ডল, আৰু তাৰ পাছে কয়েক গ্ৰামৰ অধিপতি, আৰু তাৰ পাছে দেশাধিপতি হৈ বিশ্বসিংহ নামে ৰাজা খ্যাত হ'ল। ৭৩ ॥[১]

আশা করি এ অংশের মানে আলাদা করে লিখে দিতে হবে না এবং মহারাজ বংশাবলীর বিবরণ ও বুরঞ্জীর বিবরণ সবাই মিলিয়ে দেখে নিতে পারবেন।

৭

এ সব গল্পের একটিই উদ্দেশ্য—তাহ'ল পৌরাণিক আবহাওয়া এনে রাজবংশের মর্যাদা বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে বুরঞ্জীগুলির মধ্যেও 'হিরাজিরা'-র কাহিনী বা মহারাজ বংশাবলীতে প্রদত্ত বিবরণ দুইয়ের মধ্য থেকে শুধু ঐতিহাসিক নন, একজন সমাজতাত্ত্বিকও তাঁর সত্যকে বুঝে নিতে পারবেন।

বোঝা যেতে পারবে আদিবাসী সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উচ্চতর বর্ণের আওতায় আনার জন্য পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতিটি কতটা জনগ্রাহ্য ছিল। যে কোনও কার্য সম্পাদনের জন্য দেবীর স্বপ্নাদেশ হয়েছে বললে কাজটি অনায়াসে লোকের কাছে যৌক্তিক বলে চালানো যেত। আর, সবাই এখন বুঝতেই পারছেন যে চালানো যাওয়ার কথায় খানিকটা ছলনা আছে—। বস্তুত পক্ষে লোকে এ সব ছলনা সত্য সত্যই বিশ্বাস করত।

কামাখ্যা দেবী আদেশ করলেন যে কামাখ্যা নিবাসী ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রমন্ত্র ত্যাগ করে বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক হয়ে শঙ্করদেব, হরিদেব ও মাধবদেব পন্থাশ্রয়ী হয়েছে, অতএব তন্ত্রমন্ত্র প্রকাশের জন্য শ্রীক্ষেত্র কান্যকুব্জ দেশের ব্রাহ্মণ নিয়ে এস—রাজা তাই করলেন—। এতে ধর্মীয় বিরোধের কৌতুহলজনক চিত্র আছে। চিলাখানার কাছে আঠারোকোটা থেকে রাজাবাস স্থাপনের হেতু। 'মাথালিপৰ্ব্বতে দৈবী উৎপাৎ উপস্থিত হওনে মহাদেবী আদেশ করিলেন, তুমি এ আবাস ছাড়ান দিয়া অন্য স্থানে বাস কর।' কামাখ্যাতে নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের মূর্তি আছে দ্বারপাল রূপে। তাছাড়া রাজবংশের কারও ঐ মন্দিরে যাওয়ার কোনও প্রথা কেন নেই—সে সম্পর্কে কাহিনী এতে আছে। এ ছাড়া বাণেশ্বর লিঙ্গ উদ্ধার; শুক্লধ্বজকে দোরং রাজ্যে প্রেরণের পশ্চাতে দেবীর ক্রোড়ে নরনারায়ণের অবস্থিতি দর্শন; কোচবিহারের দুর্গাপ্রতিমার রূপ কেন স্বপ্নযোগে অন্যরকম; চন্দ্রবংশে ভরতের উৎপত্তি বিষয়ে জনমেজয় রাজা বৈশম্পায়ন ঋষিকে প্রশ্ন করার পর,

১। অসম বুৰঞ্জী: স্বৰ্গীয় কাশীনাথ তামুলী-ফুকনৰ "আসাম বুৰঞ্জী পুথি"ৰ পৰিবৰ্দ্ধিত সংস্কৰণ, গৌহাটী, ১৯৬২। পৃঃ ২৬-২৮

মরিচী—কাশ্যপ—সূর্য—বৈবস্বত—ইলা—তাঁর সঙ্গে চন্দ্রপুত্র বুধের বিবাহ—পুত্র আয়ু—নহুষ—যযাতি—যদু—পুরু ইত্যাদি ক্রমে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীসূত্রে ভরতের কথা এবং উক্তি : নরনারায়ণ চন্দ্রবংশে ভরততুল্য কীর্তিমান। গল্পের একটানে সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের মহাভারত শোনার কাহিনীর মধ্য দিয়ে বৈশম্পায়নের মুখ দিয়ে নরনারায়ণকে চন্দ্রবংশজ ভরততুল্য করে দেওয়া এতটুকু অসম্ভব হল না। লক্ষ্মীনারায়ণ ও বীরপুত্রের মদমত্ত হস্তী নিধন, লৌহগণ্ডার ছেদন ইত্যাদি রূপকথা সুলভ কাহিনী রাজবংশের গৌরববর্ধক। এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। লক্ষ্মীনারায়ণের পর প্রাণনারায়ণের আমলে জল্পেশ মন্দির, মধুপুর মন্দির ইত্যাদি ছাড়া গোসানি চণ্ডী উদ্ধার সেই সূত্রে শেন বা খেন বংশ এবং তাদের অল্পকাল ব্যাপী রাজত্বের কারণ হিসাবে 'কাজিলিকুণ্ডে' ডুব দিয়ে একটি সাপের পুচ্ছ ধারণ; অর্জুন-ভগদত্তের যুদ্ধে নিহত ভগদত্তের কবচ যে শ্যেন ভক্ষণ করে কাজিলিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল তা শোল মাছ খেয়ে ফেললে সেই শোল মাছের জালে ধরা পড়া; শশীপাত্রের পুত্রকে হত্যা করে তার মাংস রেঁধে খাওয়ানো ইত্যাদি যে সমস্ত 'গোসানীমঙ্গল'-ধৃত কাহিনী, তার বর্ণনা এবং প্রসঙ্গত সর্বত্র নগর গ্রামের নামকরণের কাহিনীও বলা হল। বাংলাদেশের স্থান-নাম নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হোক।

ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনায় রিপুঞ্জয় যে একেবারে অনধিকারী পৌরাণিক কথক মাত্র, তা নন। লক্ষ্মীনারায়ণ—প্রাণনারায়ণ—মোদনারায়ণ ইত্যাদি বর্ণনার পর তিনি মহীন্দ্রনারায়ণের নাম করে বলছেন :

'এ নৃপতির নাম অন্য বংশাবলীতে বলে নাহি। রাম সরস্বতি নাম ব্রাহ্মণকৃত ভিষ্ম পর্বের পদে পাওা গেল।'

বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির স্থাপন করে যাগযজ্ঞ করেছেন যে সব রাজা ও তাঁর বিভিন্ন মহিষী, তাঁদের বিবরণ দিয়ে যজ্ঞশালী বিষ্ণুশালীর পৌরাণিক গল্প ইত্যাদি বলে শেষ পর্যন্ত শিবেন্দ্রনারায়ণের কালে পৌঁছে গেলেন রিপুঞ্জয়। বাণেশ্বর মন্দির প্রসঙ্গে উষা-অনিরুদ্ধ ও বাণাসুর কাহিনী বর্ণনায় কিছু কালাতিপাত করে নিলেন তিনি। সে আমলে কে-ই বা গল্পের আশেপাশের কাহিনী বাদ দিয়ে মূল অংশ শুনতে চাইত? শেষ পর্যন্ত 'কুমারসম্ভব' সমাপ্ত হল নরেন্দ্রনারায়ণের কথা বলে।

সব ধর্মগ্রন্থের শেষে থাকে এ সব ধর্মকাহিনী শ্রবণ করার ফল কি। একেই বলে 'ফলশ্রুতি'। মহারাজ বংশাবলীর জীর্ণ শেষ পাতাতে তার ইঙ্গিত আছে :

'রামায়ণ পুরাণ ভাগবত শ্রবণ করিলে জে ফল প্রাপ্ত হয় এই…'

৮

মহারাজ বংশাবলীর গদ্য সম্পর্কে কিছু না আলোচনা করলে ঠিক হয় না। যেহেতু এ গ্রন্থপাঠে আধুনিক কালের মানুষদের অনীহার মূল এর অস্ফুট গদ্যে নিহিত।

অন্য বাক্য না ধরে আমাদের উদ্ধৃত বাক্যগুলি ধরা যাক। দেখা যাবে ১, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৫, ১৯, ২০ সংখ্যক বাক্যগুলি মোটের উপর স্বচ্ছন্দ। [একটু কষ্ট করে পিছনের পাতাগুলি উলটিয়ে মিলিয়ে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করি।] তার মধ্যে আবার

১, ৫, ৬, ১০ মোটের উপর পূর্ণাঙ্গ বাক্য। কিন্তু ১৫ সংখ্যক বাক্যে 'কি প্রকারে' এই প্রশ্ন—বিশেষণমূলক বাক্যাংশের পর কর্ম 'সত্য' থাকলে বাক্যটি আধুনিক হত। কিন্তু যা হয়েছে তাতে অনভ্যস্ততা ছাড়া অন্য কোন দোষ নেই। ১৯-এও তাই। 'তবে'-র পরে 'নৃপসিংহ' শব্দটি কর্ম হলেও বিভক্তিচিহ্নরহিত। অন্যদিকে 'ধীরসকল' কর্তা এবং 'অগ্রগণ্য' ২য় কর্ম, 'সকলের' কর্মের বিশেষণ এবং 'গণনা করে' ক্রিয়া; কাজেই বিন্যাসটি এই রকম:

কর্ম (—বিভক্তি চিহ্ন) + কর্মের বিশেষণ + ১ম কর্ম + ২য় কর্ম + কর্তা + প্রশ্নসূচক অব্যয় + ক্রিয়া

অথচ যা হওয়া উচিত ছিল তা এই:

কর্তা + কর্ম (+ বিভক্তি চিহ্ন 'কে') + প্রশ্নসূচক অব্যয় + ২য় কর্মের বিশেষণ + ২য় কর্ম + ক্রিয়া

'ধীরসকল নৃপসিংহকে কি কারণে সকলের অগ্রগণ্য গণনা করে?' অনুরূপভাবে দীর্ঘতর বাক্যগুলি খুবই ত্রুটীপূর্ণ। অসমাপিকাতে বাক্য শেষ হওয়ার নিদর্শন ১৪ সংখ্যক বাক্য। ৮ সংখ্যক বাক্যের সম্ভ্রমার্থক-'ন' অনুপস্থিত। শিবেন্দ্র নৃপবর্ণিতা কমতেশ্বরীর উল্লেখে জিজ্ঞাসা 'করিয়াছেন' হওয়া উচিত ছিল। ঐ বাক্যে 'তারা সকলের' বদলে 'তাহাদের সকলের' হলে সম্বন্ধপদটি স্পষ্ট হত। যেহেতু 'তারা' মানে 'তাহারা' প্রথম পুরুষের ১মা-র বহুবচন মান। 'সকলের' সঙ্গে অন্বিত করবার জন্য সম্বন্ধপদের বিভক্তি চিহ্ন'-এর' বা '-দের' সংযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল।

বানানে সবই প্রায় গণ্ডগোল। ও লিখে তারপর া (= আ-কার) যোগ করে 'ওয়া' করা হয়েছে—যেমন পাওা ('পাওয়া')। কে বলে প্রাচীনকালের লোক ভুল করত না? কিন্তু এর মধ্যে 'কমতেশ্বরীতি' শব্দটি 'কমতেশ্বরী + ইতি' এই দুটি শব্দের সন্ধির মধ্য দিয়ে নিষ্পন্ন করার কোনও প্রয়োজন ছিল (৮ সংখ্যক বাক্য)? বাংলায় এ জাতীয় সন্ধি সাধারণত কথ্য বাক্‌রীতিতে অনুসৃত হয় না।

১২ সংখ্যক বাক্যের গঠন খুবই ত্রুটীপূর্ণ। যেহেতু এক বাক্য শেষ করতে না করতে অন্য বাক্য লেখকের চিন্তায় এসে যাচ্ছে সে জন্যই এই ত্রুটী। অন্বয় করা কঠিন। ব্যাপারটা এ রকম:

মাধবী শরবনে শিবের সেবা করছে। এমন সময় বসন্ত ঋতুর চঞ্চল বাতাসের মধ্যে তার অঙ্গ স্পর্শ হওয়াতে দেবদেবের কামনার ভাব জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু ইতোপূর্বে শিব তাঁর পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অন্য স্ত্রী সঙ্গ করবেন না। (কোচরমণীর প্রতি শিবের আসক্তির কথা অন্য মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বারেবারে বলা হয়েছে)। তাই অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে অঙ্গসঙ্গ হয়েছিলেন, নামও অঙ্গসঙ্গ হয়েছিল। এই এতগুলি বক্তব্য এক বাক্যে আনার চেষ্টা হয়েছে অথচ গুছিয়ে তুলতে পারেন নি।

বস্তুতপক্ষে কামরূপীয় উপভাষা ভিত্তিক গদ্য রচিত হলে অন্বয়কার্যে কি বিশেষ সুবিধা পেতাম—অথবা এক্ষেত্রেও অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের মত প্রতিভার প্রয়োজন ছিল, সেটা ভাবা যেতে পারে। বিশ্লেষণ করলে এমন অনেক ত্রুটী বেরোতে পারে, কিন্তু তার

প্রয়োজন কি? ১৮৪৭-এ যখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রথম বই বার করলেন তার আগে পর্যন্ত সমগ্র বাংলা গদ্যে কি নিপুণ ছন্দঃস্পন্দ, বাক্যের উচ্চাবচতাপূর্ণ লয়, সুদৃঢ়বদ্ধ অন্বয় দেখা গেছে? এই গ্রন্থেও বাংলা বাক্‌রীতির কথ্যভাষার স্পন্দন শোনা যায় নি।

তথাপি 'মহারাজ বংশাবলী'র মূল্য অনেক। আমাদের সাধারণভাবে ইহলোকের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক মনোভাবের বিরুদ্ধে এই ইতিহাস বর্ণন একটি ব্যতিক্রম। এর সমস্ত পৌরাণিক আবহাওয়া ও অনুষঙ্গ সত্ত্বেও গোবরাছড়া গ্রামের অনতিখ্যাত রিপুঞ্জয় দাসের এই চেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। কেননা একজন সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এর পৌরাণিক উল্লেখের ও সমাজতত্ত্বগত ব্যঞ্জনা আছে। নতুন গবেষকগণ এই নতুন দৃষ্টিতে এর গদ্য, এর ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃ-তাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত যেন। আর সমগ্রভাবে ভবিষ্যত গবেষকদের এসব উপকরণ যুগিয়ে দেবার কাজ করে ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল যে স্বার্থবুদ্ধিহীন জিজ্ঞাসা ও অতন্দ্র পরিশ্রমের উদাহরণ রাখলেন তা অন্য সকল জাড্যতাবিলাসী, পরিশ্রমবিমুখ অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ গবেষকদের আদর্শ হোক।

ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

মূল গ্রন্থ

.....জমঙ্গম ভূষণে ভয়ানক দর্শন হয়। একদীগে ব্যাঘ্র চর্ম্ম ভস্ম লেপন অন্যদিগে রক্তসাটী[১], আগর চন্দনে ভূষিত এইরূপ নলনার[২] লক্ষনে লক্ষিত অতুল মৃদুন[৩] সুললিত জ্ঞান হয়। অন্য অর্দ্ধভাগ দিব্য পুরুষকার সুদৃঢ় বলিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর বিস্তার বক্ষ সকল লোকের হিত অর্থে হৈমবতী সতী এইরূপে হরের দেহর অর্দ্ধ হরণ করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া হিমাচলের প্রস্থতে বিবিধ বিহার কম্বিতেছে। জে আদ্যা সনাতনি ব্রহ্মমই রাধারূপা লক্ষী-রূপা বাকরূপা সাবিত্রিরূপা তাহার পাদ-পদ্মে প্রণাম করি ভবসমুদ্র গম্ভীর তরণ[৪] তরণীরূপ বিপ্রপাদপদ্মে প্রণত পূর্ব্বক বলি শ্রীশ্রীকামেশ্বরী কমতেশ্বরীতিনামে শিবেন্দ্র নৃপ বনিতা মহামন্ত্রীস্থানে জিজ্ঞাসা করিয়াছে জে (১) আমার শ্বশুর বংসের আদিঅন্ত তারা সকলের যশস্যা কির্ত্তি কি প্রকার তাহা বল এমত আদেশ করাতে শ্রীভগবান ব্রহ্মা হৈতে সুত্র লইয়া মহারাজ বংস ও তাহার যশস্যা সুকুর্ত্তি বিস্তারিত রূপে জে বলিয়াছে তাহা পদবন্দে বলি। ধির সকল শ্রবণ কর জে অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে হিমাচল প্রস্থবস্থিতে বিহার করিতেছিল সেই জগতকল্যান দায়ীনির অংস শ্রীমাধবি নাম নায়িকা দিবস বসন্ত ঋতুযোগে এক স্বরবনে[৫] শিবের সেবা করাতে চঞ্চল বাত্যায় পরিধান বস্ত্রাঞ্চল গাত্র পর্স হওাতে দেবদের নায়ীকা প্রতি কামভাব দর্শন করিলে পতি সন্নিধানে পূর্বে মহাদেব অন্য স্ত্রী সঙ্গ করিবে না এমত প্রতিজ্ঞা করে। এহেতু অঙ্গ সঙ্গ হৈল নাম। (২) দর্শন করিয়া মাধবি নায়ীকা প্রতি বলিল তুমি নবযোনি প্রাপ্তে মহাদেবের অংস ঈসান সহিত অঙ্গ সঙ্গ হও। গনপতি পুত্রের অংস বিশ্বসিংহ নৃপতি জন্ম হবে। পরে মাধবি ঈশ্বরীর আজ্ঞানুসারে পশুরাম[৬] ভয়ত খেতৃ শংকোচ যোনি পাইয়া হিরা নাম খ্যাত হয়া ঈশান সঙ্গ হয়া জদ্যপি হিরা মহাদেবির অংশ না হয় তবে শিবের প্রতিজ্ঞা সত্য কি প্রকারে থাকে অপর কৃশানুরে তার রেত কি প্রকারে ধারণ করিবে যে শিবরেত ধারণে অগ্নি অসমর্থ হৈয়া গঙ্গাতে ত্যাগ করেন তিনি বহুদিন ধারণ করিতে না পারিয়া শস্তবনে ত্যাগ করিয়াছেন অতএব ঈশ্বরীর প্রধানাংশ না হইলে কৃসানু রেতার রেতশ কৃসানুকে ধারণ করার ক্ষমতা কি জদ্যপি গনপতির অংগ বিশ্বসিংহ না হয় তবে নৃপসিংহ সকলের অগ্রগন ধীরসকল কি কারণ গননা করে সেহি ঈশান ঔরসে হিরা গর্ব্ভে সিংহ পরাক্রমী নৃপ বিশ্বসিংহ চিকিনা[৭] পর্ব্বতে জন্ম ধারণ করিয়া বালক্রয়া কিসোর বএশ পর্য্যন্ত করিতেছিল। কলিযুগে চতুর্থ সহস্র ছয়শ ও দশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক দিবস মদন

১। শাড়ী, শাড়ি। ২। ললনা। ৩। মৃদুল, কোমল। ৪। ভেলা। ৫। নলখাগড়া। ৬। পরশুরাম—জামদগ্নি ঋষির পুত্র, বিষ্ণুর অবতার, একত্রিশবার ক্ষত্রিয়-কুল-নির্মূলকারী কুঠারধারী রাম। ৭। বিশ্বসিংহের পিতা হরিদাস মণ্ডলের সময়ে 'চিকনা' নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। গোয়ালপাড়া জেলায় সরল ভাঙ্গা এবং চম্পামতী নদীর মধ্যস্থলে 'চিকনা' নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। বিশ্বসিংহের সময়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

বৃক্ষতলে কৃপা করাতে ঐ স্থানে ঈশ্বর ঈশ্বরী সাক্ষাত হৈয়া অনন্ত নাম আসন কপিধ্বজ নাগফেনা সেতছত্র ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত ব্যেজন ধবল চামর দেববাদ্য দুন্দুভি ডিমডিম পতকা ও বেত্র—এই সকল রাজচিহ্ন প্রদান করিয়া গঙ্গা পূর্ব্বপারাবধি উদয়াচল প্রর্য্যন্ত অভিষেক করিয়া রাজা করিয়াছে। পরে ( ) আশ্বীনী মহষ্টমি যোগে ঐ মদন বিটপিতলে ঈশ্বরীর অর্চ্চন করাতে মহানিসা সময় নরবলি প্রদান করিয়াছে তাহারে নিসা পূজা[১] বলে। ভগবতিকে নানা পুরাহুক্ত নানাবিধ স্তোত্রে তুষ্ট করিয়াছিল। বিদায় সময় অভিসেক করিয়া কৈলাস গমন করিয়াছে তদবধি মহাদশমি দিবসে অভিসেক হয়। পাট হস্তির মস্তকে পদ্ম ও পদ্মপত্র অব্যাদন দিয়া খঞ্জন পাখি উড্ডিমান করে তাহাতে সম্বৎসরে রাজত্তে স্বভাস্বভ দর্শন হয়। পূর্ব্বে গৌরেশ্বরের স্বাধিন তুরকা নামে এক কোতওাল তাহার এতৎদ্দেশ অধিকার ছিল। বিশ্বসিংহ নরবলি দিয়াছে এমত শ্রবণ করিয়া তাহাকে ধরিতে উর্যোগ করাতে তাহার সহিত ঘোর যুদ্ধ হওনে কোতওালকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া কোতওালের অধিকার রাজ্য সমূহ দখল করিয়া রণজয়ী খড়্গ চেক নদীর[২] পূর্ব্ব কালজানির উত্তর বেহার আবাসের ঐশন্যকোনে স্থাপন করিয়া খাড়াচণ্ডী নাম প্রকাশ করেন। তাহার সেওাইত[৩] নিযুক্ত করিয়াছে। ঐ স্থানের নাম চণ্ডীর ঝার বলিয়া কয়। এহিক্ষন ভোটের দখলে আছে। পরে মাখালী নাম মাটিয়া পর্ব্বতে ভগবতীর আদেশক্রমে পূরনির্ম্মান করিয়া বাস করিয়া থাকাতে সোমর পিষ্ট[৪] গৌর দখল করিয়াছে। মহারাজাকে কামখ্যাদেবী আদেশ করিল যে আমার কামখ্যা নিবাসিয় ব্রাহ্মণ সমূহ আমার তন্ত্রমন্ত্র ত্যাগ করিয়া সকলি বিষ্ণু মন্ত্র উপাসক হইয়া শঙ্করদেব ও হরিদেব মাধবদেব পন্থাশ্রয়ী হইয়া আমার সেবা পূজা দ্দেশ[৫] করেন। তুমি শ্রীক্ষত্রনিবাসীয় কান্যকুব্জ দেশস্থ বাসুদেব আচার্য্য সপুত্র বাস করিয়াছেন। তাহাকে আমার এথানে আইশার আদেশ করিলাম। তিনি নিজে না য়াশিয়া তাহার পুত্র বল্লভাচার্য্যকে আনাইয়া আমার তন্ত্র প্রদান করায়া আমর (১) অর্চ্চনা কর, তদানুসারে ঐ ব্রাহ্মণকে আনিঞা কামখ্যার তন্ত্রমন্ত্র প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মন সকলেক দেবীর মন্ত্রোপসনা করিয়া রাজনুসাসন করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহ নৃপতির দুই রানি, বিবাহিতা মধুমতি, অপর নাম সুদন্নি,[৬] অবিবাহিতা নিলাবতি[৭]। স্বামি অঙ্গ সঙ্গে পুত্র প্রসব করিয়াছে গননা করিয়া নরসিংহ নামকরন করিছিল। বিবাহিতা মধুমতিরানি গর্ব্ভে অষ্টাদশ পুত্র জন্ম হৈয়াছে। তাহার নাম বলি মল্লদেব, শুক্লধ্বজ, গোসাঞি কমল,

---

১। মহাষ্টমীর দিন দেবী বাড়ীতে মহাসমারোহ। সন্ধিপূজা, বলি প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু মহানিশা-মুহূর্তে নিশাপূজা নামে একটি আনুষঙ্গিক গুপ্তপূজা সম্পন্ন হয়। এ প্রথা এখনো চালু আছে। ২। বর্তমান খোগটা তালুকের পূর্ব পার্শ্বে প্রবাহিত যে ক্ষুদ্র নদীদ্বয় কালজানিতে মিশেছে তার মধ্যে একটি ধারা 'চেক' নামে পরিচিত। বর্তমানে এই নদীর নাম আলাইকুমরী। ৩। সেওাইত—পূজারী। ৪। পুথির প্রথমে "অপর নাম সমর সিংহ ৪" এই কথা কয়টি লেখা আছে। প্রসঙ্গত শুক্লধ্বজের অন্য নাম সমর সিংহ। ৫। দ্বেষ। ৬। মতান্তরে সুদাম্নী। ৭। মতান্তরে লীলাবতী।

মইদানব[১], রামচন্দ্র, স্থরসিংহ, মানসিংহ, গোসাঞিমেচা, বৃষকেতু, রামনারায়ণ, অনন্তসোভন, দ্বীপসিংহ, হেমধর, মেঘন্নাল[২], জগতা, রূপচন্দ্র, হরীনসিংহ, গোসাঞিসূর্য্য[৩] এহি সকল মহাদেবের পৌত্র। নরসিংহ উত্তর রাজ্যে পর্ব্বত পরিভাগে ধর্ম্মরাজ খ্যাত হইয়া অদ্যাপি বিরাজমান হইয়া উত্তর নিবাসি প্রজা সকলেক পালন করিতেছে। মধুমতি সতির প্রথম পুত্র জন্ম হৈলে পর মহারাজ দর্শন করিলেন সুন্দর শ্যামবর্ণ জানুলম্বিত বাহুদ্বয় বিকশিত পদ্ম পরে মহাদেব মহাদেবী প্রমথগন ও যোগিনীগন সহিত বেষ্টীত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়া আকাশীবানী দ্বারা মহারাজাকে আদেশ করিল জে এই পুত্র বংশধর যশস্যাবান বসুন্ধরা সাসন করিবেন। ইহার মহা যশস্যা চীরকাল প্রকাশ থাকিবেক। ইহার নাম নরনারায়ণ। পরে কীয়ৎ দিবসান্তরে ভ্রমণসক্তি হইয়া সপ্তদশ ভ্রাতা সহিত একত্রে বাস করিয়া থাকাতে এহেতু আঠারো কোটা খ্যাত হইয়াছে। ঐ আঠারোকোটা বেহারের পূর্ব্ব চারসি[৪] নদীর পূর্ব্ব পারে চিলাখানার সন্নিধানে আছে। পরে নরনারায়ণ সিংহ, ব্রাঘ্র, ভল্লুক, মহিস, গণ্ডা এহি সকল বনজন্তুকে বন্ধন করিয়া জীবমানে আনিয়া পিতাকে দেখায় এবং পৃষ্ঠে আরোহণ করে। ঐসকল দ্বার খেলা করেন কারণ পাত্রমিত্র পুরুহিত জ্ঞাতিবর্গ সহিত মহারাজ বিশ্বসিংহ আত্মপুত্রকে মহাবল পরাক্রমি দর্শন করিয়া সুবিচারপূর্ব্বক মল্লনারায়ণ নাম রাখিলেন, দ্বিতীয় পুত্র জন্ম হইলে দেখিল তাহার বাহুদ্বয় শুক্ল। একারণ শুক্লধ্বজ (২) নামকরণ করিয়াছে পরে বিশ্বসিংহের স্বর্গারোহণ হইলে পর নরনারায়ণ রাজা হৈয়া প্রজাপালন করিতে মাখালি পর্ব্বতের আবাসে দৈবী উৎপাৎ উপস্থিত হওনে মহাদেবী আদেশ করিলেন, তুমি এ আবাস ছাড়ান দিয়া অন্যস্থানে বাস কর। এমত আদেশ পাইয়া ঐ আবাসের কিছু ব্যবধান নতুন আবাস করিলে পরে ভগবতি কপালের সিন্দুর দ্বারা প্রাশাদ প্রাচীর হেঙ্গুল বরন করিয়াছে, এহেতু হেঙ্গুল আবাস[৫] খ্যাত হইল। অদ্যাপি ঝারগ্রামে প্রকাশ আছে তাহার আজ্ঞামতে রত্নমালা ব্যাকরণ পুরুষোত্তম নাম বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে রচিয়া বহুসিষ্যেক অধ্যাপন করায়। অপর মহারাজার সকৃত মল্লদেবী নামে অভিধান প্রকাশ করে। ঐ পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ দ্বারায় তপস্যা করায়া আত্মনগরস্থ আবাল যুবা বৃদ্ধ ইতর স্ত্রী-পুরুষের মুখে দৈবী-ভাসা প্রদান করায় অদ্যাপি ঐ গ্রন্থ চলিত আছে। পরে মল্লদেব নৃপতি বড় সচীব বৃদ্ধমন্ত্রী দুই জনেক ডাকিয়া বলিয়াছে আমার রাজ্যে কত প্রজা তাহা লিখিয়া সিগ্র আন, রাজ আজ্ঞা মতে আপনার রাজ্যে যত লোক আছে তাহা লিখিআছেন। তাহাতে শপ্ত দশ লক্ষ প্রজা হইয়াছিল। নৃপতি কাগজ দৃষ্টী করিয়া বৃদ্ধমন্ত্রী বড় সচীবেক অনেক প্রসংসা করিলেন। পত্র চাহিয়া নৃপতি পোণ্ডা[৬] নিরুপিত করাতে চারিলক্ষ

১। মদন বা ময়দান। ২। মেঘনারায়ণ। ৩। বিশ্বসিংহের রানী ও পুত্রদের নাম সম্পর্কে কোচবিহারের ইতিহাস ও বর্তমান পুঁথির মধ্যে মতভেদ। ৪। গদাধর নদীর উচ্চ অংশের পূর্ববর্তী নাম। নিম্নাংশের নাম খোরা। সঙ্কোশ নদীতে পতিত হওয়ার পূর্ববর্তী অংশের নাম। ৫। আলিপুরদুয়ার মহকুমায় মহাকালগুড়ির নিকটে হিঙ্গুলাবাস অবস্থিত। ৬। পোণ্ডা = পোয়া = $\frac{1}{8}$ অংশ।

পছিস হাজার হইয়াছে। খেত্র পতি তিন পুরা[১] নিষ্কর করিয়া দিয়া পদাতি করিয়াছেন তেলি, মালি, ধোবা, কাহার, কামার, নট, ভাট, সোনারি, নাভীক, চামার এহি সকল ত্যাগ করিয়া পোওা বন্দ করিছিল। পরে উত্তর রাজ্য আজাম[২] পর্য্যন্ত দখল করাতে গৌরেশ্বরে পুনরায় পূর্ব্বভোগ রাজ্য আক্রমন করাতে গৌরেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করার কারণ ঋশকেতু কুঙর সেনাপতিকে চতুরঙ্গ দল সহিত প্রেড়ন করাতে ঐকালে দিল্লীশ্বর দীর্ঘ শশ্রুযুক্ত ভীশন নানাবিধ আয়ুধযুক্ত গৌর জয় করার কারণ প্রেড়ন করিয়াছে। উভয় শৈন্যে গৌরবেশ্বরেক নষ্ট করিয়া গঙ্গা ভাগিরথী সিমা নিরুপণে অর্দ্ধ বাদশা হৈয়া অর্দ্ধ মুদ্রা বন্ধ করে। আমুরি হাউদা আশা শোটা হস্তী ঘোটক পৃষ্ঠস্থিত ডিমডিম ডঙ্কা এহি সকল মনছব প্রাপ্ত হয়। অপর তদবিধ সেলাম হয় এহেতু শিব বংশ নৃপতি রাজা বাদশা খ্যাত। (৩) ঋশকেতু কুঙরেক পাঙ্গা মোকামে রাজা করিয়াছে। ঐ গৌর গড় মালদহ সন্নিধানে আছেন। পরে ভ্রাতা দিগর পূর্ব্ব রাজ্যসমূহ দখল করাতে আসাম দেশীয় ইন্দ্র বংশ নৃপতিকে যুদ্ধে পরস্থ করিয়া যুদ্ধ জয়ী চিন্ন ইন্দ্রছত্র নামক হরণ করিয়া আনিয়াছে তখন তাহারে বাড়িছত্র বলে। পরে ভ্রাতাদিগর নিলাচল পর্ব্বতে উৎথিত হইয়া পিতার প্রকাশীত কামখ্যা মহাদেবীর স্থান জঙ্গলা দর্শন করিয়া ঐ সকল বন নষ্ট করিয়া মঠ তৈয়ারী করিয়া দিয়া আত্মমূর্ত্তি ভ্রাতা শুক্লধ্বজের মূর্ত্তি দ্বারপাল রূপে রাখিয়াছেন। পরে কেন্দুকালাই নামে দেবীর পরিচারক ব্রাহ্মণ তিনি জন্ত্র বাদ্য করে ভগবতি সাক্ষাৎ হৈয়া নিত্য[৩] করে। কোন এক দিবস কেন্দু শর্ম্মাকে সাক্ষাৎ আনার বিষয় রাজার আজ্ঞা হওাতে কর্ম্ম সর্থে গৌণ হওনে রাজা ক্রোধযুক্তে অগ্রস্থিত কেন্দু শর্ম্মাকে বলিল অতি গর্ব্বযুক্ত হৈয়া আমার শাসন গ্রহণ করনা। এমত বলাতে কেন্দু শর্ম্মা নৃপতিকে বলিল আমি জন্ত্র বাদ্য করি ভগবতি নিত্য করে। একারণ গৌন হৈয়াছি ইহা বই অবজ্ঞা করি নাহি। রাজা বলিল তাহা দেখাইতে পার? কেন্দু বলিয়াছে আমি দেখাইতে পারি। তোমরা গোপনে দর্শন করিবা। এমত বলিয়া গোপনে দর্শন হওয়ার স্থলে রাজাকে রাখিয়া জন্ত্রবাদ্য করাতে দেবী উলঙ্গ হৈয়া নিত্য করিতে রাজাকে গোপন স্থানে দর্শন করিয়াছে যাহার সর্ব্বত্র চক্ষু তাহার অগোচর কি আছে। পরে ভগবতী ঘনঘোর গম্ভীর নিশ্বনে হুঙ্কার ছাড়াতে কেন্দুর মস্তক ছেদন হৈয়া দ্বারের সম্মুখে পতন হয়। ঐ সময় ভগবতী রাজাকে বলিয়াছে আমি তোমারদিগের ইষ্টদেবী, উলঙ্গ অবস্থা দর্শন করিতে আসিআছ। অতএব অদ্যাবধি এই নিলাচল দর্শন করিলে মস্তক শতখণ্ড হইয়া পতন হইবে। এমত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় প্রযুক্তে বাসস্থান গমন করিল তদবধি নিলাচল অদর্শন বিষয় আড়ানী নামক এক উপছত্র করে যে কালে মহারাজার গমন হয় তৎকালে ঐ আড়ানী দ্বারায় নিলাচল আর করিয়া গমন করে। পরে আসাম নৃপতি এই ছিদ্র অন্বেশন করিয়া রম্ভা গাছের তন্তুর যজ্ঞসূত্র বনাইয়া অনেক সৈন্য বৃষভারোহনে যুদ্ধে প্রেড়ন করাতে নরনারায়ণ (৪) নৃপতি সৈন্য সকল যুদ্ধ স্থল প্রবেশে আসামস্ত সৈন্য যজ্ঞসূত্র যুক্ত বৃষভারোহন দর্শন করিয়া রাজাকে ঐ তত্ত দেওনে রাজা

১। পুরা=বিঘা। ২। আসাম। ৩। নৃত্য

বলিল হেটেগো উপরে ব্রাহ্মণ ইহাকে বধ করিলে অপবাদ থাকিবেক জে শিববংসি নৃপতি হইয়া রাজ্যলোভে গোব্রাহ্মণ নষ্ট করিয়াছে। এমত বিবেচনা করিয়া রাজ্য ছারান দিয়া নিজপুর হেঙ্গুল আবাসে প্রবেশ করে। চউরিয়া নামে এক গৃহস্থ ছিল তাহার একটা গাভি বনে প্রবেশ হইয়া একস্থানে দাড়াইতে দুগ্ধ আপনে শ্রবে। গৃহস্ত দুগ্ধ না পাওাতে এক দিবস অন্বেশন করিল। গাভি স্বয়ং রর্জু ত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ হয় একস্থানে দাড়াইতে ক্ষির আপনে শ্রবে এমত দর্শন করিয়া নৃপতির নিকট গোচর করিল পরে নৃপতি মৃগয়াছলে ঐ বনে গিয়া প্রবীন কতেক শুক্লবর্ন বৃষভ সন্দর্শনে মহারাজ বিস্ময় বোধ করিয়া পদাতিক সকলেক ঐ বৃষভ সকলেক ধরিতে আজ্ঞা করিলেন। পদাতিরা ধরার মানসে ঘেরাও করাতে নিমিশ মধ্যে বৃষভ সকল অদর্শন হইল। মহারাজ বিস্ময় হইয়া ঐ বনে রাত্রে প্রবাস করাতে নিদ্রাযোগে স্বপ্নে বানেশ্বর লিঙ্গ আদেশ করিল যে আমি বাণেশ্বর লিঙ্গ মৃত্তিকাশ্চাদিত হৈয়াছি বৃষভ রূপে তোমাকে দর্শন দিয়াছিলাম। তুমি আমাকে প্রকাশ কর। আমার উত্তর জলেশ্বর লিঙ্গ কোটেশ্বর লিঙ্গ আছেন এবং আমার পুরির অগ্নি কোণে দামেশ্বর বংসেশ্বর অনলেশ্বর ইত্যাদি সেহ মৃত্তিকাচ্ছাদিত হইয়াছে। তাহাকে উদ্ধার করিয়া সেওাইত নিযুক্ত কর। তোমার শুভাশুভ সকল প্রমাণ আমাতে হবেক। তাহার পর দীবস মহারাজ ঐ সকল মৃত্তিকা খোদিত করিয়া প্রকাশ করিয়া বৃত্তি সেওাইত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, গোচর প্রযুক্ত চউরিয়াকে বলিল অদ্যাবধি গৃর্দ্ধ চহরা এই স্থানের নাম হইলেন তদবধি গৃদ্ধচহরা লিখে। পরে শুক্লধ্বজ রাজা হওা বিসয় মনে কল্পনা করিয়া ভাবিতেছে এই নরনারায়ণ নৃপতিকে নষ্ট না করিলে আমি রাজা হইতে পারিব না। অতএব ইহাকে নষ্ট করিতে হইয়াছে। এমত আলোচনা চিত্তে করিয়া রাত্রিযোগে খড়্গ হস্তে ধারণপূর্ব্বক নরনারায়ণের নিদ্রাগারে প্রবেশ হইয়া দেখিল মহীশির[১] হস্ত রাজার কন্দদেশে আছে এমতে নৃপতির কন্দ ছেদিতে সাহশ না পাইয়া রাজার শয়নাগারের স্বম্ভ ছেদন করিয়া খড়্গ কোশ মধ্যে রাখিয়া বাহের হইল। ভগবতীর ইৎসাতে[২] ঐ কাটা স্তম্ভ পূর্ব্বভাবে আছে। রাজা নিদ্রা হৈতে উৎথিত হৈয়া স্তম্ভ ছেদন বোধ (৫) করিয়া প্রহরার লোক সকলেক জিজ্ঞাসা করিল এখানে শুক্লদ্ধজ আশীয়াছে কিনা। প্রহরী সকলে বলিল আশীয়াছে প্রহরির বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ কাটাস্তম্ভ ধাকা দেওাতে স্তম্ভ পৃথিবীতে পতন হৈয়াছে। পরে রাজা আমাত্যবর্গ সহিত সভা করিয়া বৈশাতে শুক্লদ্ধজ তাহা শ্রবণ করিয়া কাটার মানসে খড়্গ কোশ মুক্ত করিয়া সভা আশীয়া দেখিল দশভূজা রূপে নারায়ণী নৃপতিকে ক্রোড়ে করিয়াছে। কেবল শুক্লদ্ধজ দেখে অন্যে দেখিতে পাএ না। এমত অশম্ভব দর্শনে বিস্ময় হৈয়া জেষ্ঠ নরনারায়ণ নৃপতি পদাব্জে পতন হইয়া বলিল আমি দুর্ভাগ্যযুক্ত যাহাকে জগত জননী রক্ষা করে অল্প বুদ্ধিক্রমে তাহাকে ছেদন করার মানস রাখি এমন বলাতে রাজা বলিল হে ভ্রাতা কি কারণ আমাকে ছেদন করার মানস রাখ। ভগবতির ক্রোড়স্থিত কিরূপ দর্শন করিলা তাহা বল। যাহাকে মহাযোগ দ্বারায় যোগী সকলে দেখিতে পাএ না তাহা তোমার চক্ষুর গোচর হইল। অতএব তোমা

১। মহিষীর। ২। ইচ্ছাতে।

হৈতে ভাগ্যবান মন্য কেহ নহে আমি দুর্ভাগ্যযুক্ত যোগীর আরাধ্য বস্তুর ক্রোড়ে থাকিয়া দেখিতে পাইলাম না। রাজা এ প্রকার বলাতে শুক্লধ্বজ বলিল আমি ভব-ভোগ বাঞ্চাতে রাজা হওার মানসে তোমাকে ছেদন করার কারণ রাত্রিযোগে খড়্গ লইয়া তোমার শয়নাগাঢ়ে প্রবেশ হইয়া দর্শন করিলাম। রাজমহীশির হস্ত তোমার কন্দদেশে আরোপিত আছে। স্ত্রি হত্যা ভয় ছেদন করিতে না পারিয়া স্তম্ভ ছেদন করিয়াছি। অথন তোমাকে ছেদন করার হেতু খড়্গ হস্ত সভায় প্রবেশ হইয়া দেখিলাম যোগীর যোগাগম্য বস্ত অতশীকুসুমাকার বর্ন্নে দশভুজারূপে তোমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছে। এমত বলিলে পর মহানুভাবে অশ্রুপূর্ন্ন আখি তদগতে শুক্লধ্বজেক আলিঙ্গন করিয়া পূর্ব্ব রাজ্যে দোরং[১] দেশে অভিসেক করিল। তাহার পুত্র পরিক্ষিত দেব[২] তাহার বংস পূর্ব্ব রাজ্যে আছে। পরে মহারাজ নরনারায়ণ আশ্বিনী মহাষ্টমিযোগে শারদীয় পুজা করার মানষে শ্রাবণের চন্দ্রের শুক্লাষ্টমি যোগে রাজার নিজহস্ত প্রমানে নবমুট পরিমিত মদন বিটপির সাখাশক্তি ছেদন করিয়া মহাযত্ন পূর্ব্বক গৃহাগত করায় তাহারে যুগচ্ছেদ বলে। (৬) ভাদ্রের শুক্লাষ্টমি যোগে শক্তি পাটস্থিত করায় তাহারে ধর্ম্মপাট বলে। আশ্বিনী শুক্ল দ্বিতীয়াতে শক্তিতে নিম্মিত ভগবতির দর্শন উপহার বস্ত প্রদান তাহাকে দেওদেখা বলে। ঈশ্বরীর ঘরের পূর্ব্ব কিছু উত্তর বস্ত্রাচ্ছাদিত স্তম্ভ তাহা নৃপতির কর্ন্ন প্রমান তাহার প্রমান কান সেওাইত তাহারে অথন কাম সেওাইত বলিয়া কয়। তদন্তর নৃপতি অতসী কুশুমাকার বর্ন্ন দর্শন করিয়া মনে কল্পনা করিল যে ভগবতি রক্তিমা বর্ন্ন হৈলে ভাল হয়। অপর দক্ষিণ হস্তে সিংহে গ্রাষ করিআছে। বাম বাহু গ্রাষযুক্ত একটা ব্যাঘ্র হৈলে ভাল শোভা হয়। এমত কল্পনা করাতে ঐ রূপে স্বপ্নে দর্শন পাইয়া প্রতিমনে স্বপ্ন দর্শনরূপে মৃন্ময়ী ভগবতির মূর্ত্তি চিত্রকর দ্বারায় প্রস্তুত করাইয়া লক্ষ হোম পরিমিতে পূজা করিতেছিল এ পর্য্যন্ত স্বপ্ন দর্শনরূপে ভগবতির সারদীয় পূজা হয়। মহারাজ নরনারায়ণ প্রজা প্রতি অনুগ্রহ এতাদৃশ অনুগ্রহ কারক কোন নৃপতি হয় নাহি। রূহিচা নামে এক প্রজা প্রতি সনে শাল তামামী রাজস্য যথার্থ দিয়াছে। রাজার সহিত সাক্ষাৎ কখন করে নাহি। এমতে তাহাকে সাক্ষাৎ আনার কারণ অনেক উর্য্যোগ করিল কোন প্রকারে বিদ্যমান হইল না। অদৃশ্য বৎস প্রতি গাভী সকল অন্বেশনে সাক্ষাৎ প্রার্থনা রাখে। ঐ রূপে প্রজার সাক্ষাৎ করার কারণ রূহিচা প্রজার বাটীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় রূহিচা প্রজা নৃপতিকেশরী আইসার কথা শ্রবণ করিয়া বাটী সহিত সপরিবারে খাতরূপে জলাসয় হইল। পরে প্রজাখাত রূপে জলাসয় দর্শন করিয়া রূহিচার দর্শন আশায় মন্ত্রী সহকারে খাতরূপে জলাসয় হইলেন। এমত তত্বাবধানে রানী যেখানে নৃপতি খাতরূপে জলাসয় হয় ঐ স্থানে গমন করিয়া হাতী ঘোড়া সন্য সহিত ডোবা হৈয়াছে। অদ্যাপী রূহিচার ডাবরি মধ্যে রাজা ডোবা, রানী ডোবা, মন্ত্রী ডোবা, হাতী ডোবা, ঘোড়া ডোবা এহি সকল

১। বর্তমান দরং, আসাম রাজ্যের একটি জেলা। ২। এখানে পুত্র পরীক্ষিৎ দেব আছে। কোচবিহার ইতিহাস মতে পৌত্র।

নাম খ্যাত হইয়া ঝারগ্রামে প্রকাশ আছে। এহি প্রকারে নৃপতি অদৃশ্য হইল। অতএব এ বিশয় এক ইতিহাস বলি। পূর্ব্বে জনমেজয় নৃপতি বৈশম্পায়ন ঋশীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে চন্দ্র বংশে ভরতের উৎপতি কিরূপে হইল। জনমেজয়ের (৭) বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈশম্পায়ন ঋশী বলিতেছে ভরত আখ্যান বলি। ব্রহ্মার পুত্র মরিচী তাহার পুত্র কাশ্যপ মুনি তাহার পুত্র সূর্য্য তাহার পুত্র বৈবশ্যত[১] তাহার পুত্র ইলা নামে নৃপতি কোন এক দিবস মৃগয়া করাতে মহাদেবের ক্রিড়া স্থান গিয়াছিল। ঐ স্থানের প্রতি মহাদেবের সাপ ছিল যে পুরুষ এই স্থানে প্রবেশ করিবে তিনি তৎক্ষনাৎ নারীরূপা হইবেন একারণ বন প্রবেশ মাত্র ইলা নারীরূপা হৈয়াছে। অন্য বনে গমন করিলে পর ঐ স্থানে চন্দ্রের পুত্র বুদ তপস্যা করিতেছিল। ঐ সময় ইলা কন্যারূপে নিকট জাওাতে পরমশুন্দরী দর্শন করিয়া কাম মোহিতে উপভোগ করিয়াছে। তাহার পুত্র আয়ু নামে, তাহার পুত্র নহুশ[২] দেবরাজ্যে রাজা হৈতে ব্রহ্মশাপ হৈয়া শর্প[৩] হয়। তাহার পুত্র জর্জ্জাতি[৪] তাহার শ্রেষ্ঠ ভার্য্যা[৫] দেবজানি[৬] শুর্ম্মিষ্টা[৭] দেবজানি গর্ব্ভযাত যদু ও উর্ব্বসু শুর্ম্মিষ্টার গর্ব্ভযাত দ্রহ্যু অনু ও পুরু। সাপত্নি দোসে স্বশুরের সাপে জর্জ্জাতি জরা যুক্ত হয়, ঐ জরা ধারণ করিতে যদু, উর্ব্বসু, দ্রহ্যু, অনু, এহি চারি পুত্রেক বলিয়াছে। জরা ধারণে অশক্ত হওাতে রাজা সাপ[৮] দিয়াছে। পুরু প্রতি ভারার্পনে ধারণে শক্তবান হইলে পর পুত্র প্রতি রাজ্য অর্পন করিয়া বন যাত্রা করিয়াছেন। দ্বিসহশ্র বর্ষ তপস্যা করিয়া দেহত্যাগে দিব্যবিমান আরোহণে ইন্দ্রের সভায় গমন করিয়াছিল। দশলক্ষবর্ষ ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পুনরায় দেবলোকে আশীলে পর ছলক্রমে দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছে মহারাজ তুমি পুরুকে রাজা করিয়া কি নিতি শিক্ষা পন করায়াছ। নৃপতি জর্জ্জাতি বলিয়াছে বেদ অনুসারে পুরু পুত্র প্রতি রাজছত্র প্রদানে রাজা করিয়া যাহা শিখায়াছি তাহা বলি। ক্রোধ করাইলে ক্রোধ হবে না। গালি দিলে কিছু বলিবে না। পর দুখে দুখি হইবা। পর উপকারি হইবা। মধুর কোমল বাক্য বলিবা। সদা শুদ্ধাচারি হইবা। মর্ম্ম ভেদ কথা পরেক কদাচ বলিবা না। কপট বুদ্ধি ত্যাগ করিবা। সত্য শুদ্ধ হবা। আত্ম দুখ করিয়া পরেক ত্রান করিবা। পরত্রান কারক সমান পৃথিবীত শ্রেষ্ঠ কেহ নহে। পুত্রবতে প্রজা পালন করিবা। (৮) দুঃখি জনের দুঃখ ধনে নিবারিবা। বহুদানে মান্যমানে ব্রাহ্মণক তুষ্ট করিবা। উৎসব করিবা বন্ধুগনেক তুষিবা। চোর ভণ্ড দুষ্ট লোকে রাজ্যে রাখিবা না। অনাথ বৃদ্ধজনে দয়া করিয়া পালন করিবা। অতিথী সেবনে অবহেলা করিবা না। অবশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্রে রার্য্য[৯] ভারার্পন করিয়া বনে ফলমুলাহারে তপস্যা করিবা। এহি প্রকার নিতি শিক্ষাপন করাআছি। জর্জ্জাতি নৃপতি এহি মত দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিয়াছে ঐকালে জনমেজয় বৈসম্পায়নেক বলিল চারিপুত্র প্রতি রাজা সাপ দেওয়াতে তারা সকল কি কর্ম্ম করিয়াছে। বৈসম্পায়ন বলিল জদু বংশে

১। বৈবস্বত। ২। নহুষ। ৩। সর্প। ৪। যযাতি। ৫। ভার্যা—স্ত্রী। ৬। দেবযানী। ৭। শর্মিষ্ঠা। ৮। শাপ। ৯। রাজ্য।

রাজা হৈল না। যাদবের উৎপত্তি হৈয়াছে তাহারে হরিবংশ বলে। উর্ব্বসুর বংশে জবনের পতি হইল। দ্রহ্য[১] হৈতে ভোজ বংশ বৃদ্ধি হৈয়াছে। অমুর ঔরশে ম্লেচ বংশ হইল। পুরুর পুত্র পৌরর্ব্ব, পৌরর্ব্বের পুত্র তিনজন। তাহার মধ্যে প্রধান পুত্র প্ররাব। তিনি রাজ্যেশ্বর। তাহার পুত্র মহুব্য। তাহার পুত্র তিনজন। তাহার মধ্যে সিংহানন রাজা। তাহার পুত্র দশজন। তাহার মধ্যে মতিনার নামে রাজা। মতিনারের পুত্র ত্রিষু আদি করিয়া চারিজন। ত্রিষুর পুত্র ইলিল। ইলিলের পঞ্চ পুত্র মধ্যে দুস্মন্ত রাজা। শকুন্তলা তাহার বনিতা বিশ্বামিত্র মুনির ঔরশে মেনকা অপসরি গর্ব্ভে জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। পরে অপ্সরা বিশ্বামিত্র মুনিকে পরিত্যাগ করার কালিন কন্যা বনে প্রশব করিয়া আকাস পথে গমন করিয়াছে। শকুন সকলে ঐ কন্যাকে নালন করিয়াছিল। কর্ণ[২] মুনি তাহাকে পাইয়া আশ্রমে আনিঞা[৩] শকুন্তলা নামকরণ করিয়াছিলেন। কোন এক দিবস দুস্মন্ত নৃপতি বিপিনে মৃগয়া করিতে পিপাসা যুক্তে কর্ণ মুনির আশ্রমে গিয়াছে। মুনি কুশ ও ফল পুষ্প পত্র যজ্ঞ কাষ্ঠ আনার কারণ বনে গিয়াছিল। কন্যা একা আশ্রমে থাকাতে রাজা সেই সময় উপস্থিত হৈয়া আশ্রমে ঐ কন্যাকে দর্শন করিয়াছে। পরম সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তুমি কাহার কন্যা। আশ্রমে বা কেন বাস কর। কন্যা বলিয়াছে আমি মুনির কন্যা। রাজা বলিল মুনি ফলমূল, জলাহারি, দ্বারা[৪] ত্যাগি, ইহার কন্যা কি প্রকারে হইয়াছে। কন্যা বালল আমি বিশ্বামিত্র মুনির ঔরশে (৯) মেনকা নামা অপসরি গর্ব্ভে জন্ম হৈয়াছি। আমাকে শকুনে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিল। এহেতু শকুন্তলা আমার নাম। আপনেরা কে কি কার[৫] আশ্রমাগত হৈয়াছেন। রাজা বলিল আমি চন্দ্র বংশদ্ভব দুস্মন্ত নৃপতি। মৃগয়া করিতে বনে আশিয়াছি। পিপাসাযুক্তে আশ্রমাগত হইলাম। কন্যা এমত শ্রবণ করিয়া আপন অর্ঘ্য জলপ্রদান করিয়াছে। কন্যার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মন্মথে মথিত চিত্ত হৈয়া গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া অঙ্গসঙ্গ করিয়াছে। পরে রাজা রাজধানীতে গমন করিল। মুনি আশ্রম আসিয়া যোগবলে সকল জ্ঞাত হইলেন। কতক দিবশান্তরে কন্যার গর্ব্ভে এক শন্তান হইল। সর্ব্ব সুলক্ষন দর্শন করিয়া মুনি সকলে সুবিচারপূর্ব্বক ভরত নামকরণ করিয়াছে। পরে ভরত কুমার মুনির আশ্রমে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের প্রায় বৃদ্ধি হইয়া মহাবনে গমন করিয়া সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডা[৬] এহি সকল বনজন্তুকে বর্ম্ম দ্বারায় বন্ধন করিয়া আশ্রমে মুনি সকলেক দরশন করায়। মহাপরাক্রম দরশন করিয়া অপর দমনক নাম মুনি সকলে রাখিয়াছে। পরে ভরত কুমার পিতার নিকট রাজধানী গমন করিয়া পিতৃ কালাবসানে রাজা হইয়া যাগযজ্ঞ দান করিয়াছে। অদ্যাপি ভরতের পালীত ভারতবর্ষ খ্যাত আছেন। এমতে মহারাজ নরনারায়ণ চন্দ্র বংশে ভরত তুল্য কির্ত্তিবান এই চন্দ্র সাপত্ন দোষে দক্ষ প্রজাপতি শশুরের সাপে ক্লেষ যুক্ত হৈয়া মহাদেবের শরণাগত হইলে পর শরণপিঞ্জর মহাদেব চন্দ্রের ক্লেষ মুক্ত করিয়া চুড়ায়ে ধারণ করাতে চন্দ্রচূড় নাম খ্যাত হইল। নরনারায়ণ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতি স্বপ্নে আদেশ করিল জে তুমি রাজা হৈয়া

১। দ্রহ্যু। ২। কণ্ব। ৩। আনিয়া। ৪। দারা। ৫। কি কারণে। ৬। গণ্ডার।

প্রজা পালন কর। আদেশক্রমে রাজা হৈয়া রাজনীতি মতে প্রজা পালন করিয়াছে। সেই ভূপাল প্রবল মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণকে নিজে অনন্তে কৃপাযুক্ত হইয়া অনন্ত নাম শালগ্রাম দিয়াছিল। অদ্যাপি ঐ অনন্ত বিরাজমান আছে। সুলক্ষন হেতু লক্ষ্মীনারায়ণ নাম খ্যাত। শিশুকালাবধি হরিভক্ত পরায়ণ নৃপতির অষ্টাদশ পুত্র। তন্মধ্যে (১০) বীরনায়ায়ণ ও সুরনারায়ণ, পবননারায়ণ, বজ্রনারায়ণ এহি চারি পুত্র সহকারে দিল্লীশ্বরেক জয় করার কারণ দিল্লী গিয়াছে। দিল্লীশ্বরের সহিত যথাযোজ্ঞ সম্ভশা[১] হওাতে তাহার পুত্র চারিজন বাদশাকে কোন সম্ভশা করিল না। বাদশা দর্শন করিল ঐ চারি পুরুষ মহাভুজ সুঠান এমতে মহামল্ল বোধ করিয়া উত্তম আলয়েত বাসস্থান দিয়াছে মনে বিবেচিয়া দিল্লীবাসী লোক কখন আরোহণ করিতে পারে নাহি। এহি প্রকার অন্য বহু লোকে কথমপি সভা মধ্যে আনাইয়া সভাস্থ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতি বলিল মহারাজ ঘোর সোওার কেহ তোমার কাছে আছে কিনা? ঐ কালে পবননারায়ণ বলিল আমার সঙ্গে প্রতদ নাহি। এমত বলাতে চাঁছকের ভাণ্ডারে জাইতে বলিল। ভাণ্ডারে প্রবেশ হইয়া পরিক্ষা করাতে সমূহ প্রতদ নষ্ট করিলেন। পরে নিজ প্রতদ ধারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে কোথা গেল কেহ নিদর্শন করিতে পারিল না। প্রহরান্তে যে স্থানে আরোহণ হৈয়াছিল ঐ স্থানে আশীয়া অশ্ব হৈতে ভূমিষ্ট হওাতে অশ্ব পৃথীবি তলে পতন হৈয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। দিল্লীশ্বর ইহা দর্শন করিয়া বিস্ময় হৈয়াছেন। দিল্লীশ্বর লৌহময় স্থুলকায় এক ছাগ কারিগর দ্বারায় তৈয়ার করায়া সভায় আনায়া সভাস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ নৃপতিকে বলিল তোমার কাছে সুর কেহ আছে কিনা। এমত বলাতে সুরনারায়ণ বলিল আমি লোহার ছাগ ছেদন করার সামর্থ রাখি। সঙ্গে ভালরূপ খড়্গ নাহি। এমত বলিলে পরে খড়্গের ভাণ্ডার দর্শন করাইয়া দিল। পরিক্ষা করাতে তাবৎ খড়্গ নষ্ট করিয়া নিজ খড়্গ দ্বারায় ঐ লোহার ছাগ এক প্রহারে ছেদ্দ করিয়াছে। তাহা দেখিয়া দিল্লিশ্বর ও দিল্লিস্থ লোক জারা দেখিয়াছে সকলি বিস্ময় হইল। আর এক দিবস বীরনারায়ণ, বজ্রনারায়ণ স্নান করিতে যমুনা নদী গিয়াছে, বজ্রনারায়ণ স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিতে ছিল। ঐ সময় পাল যোগে নৌকা এক চণ্ডবাত্যায় মহাবেগে মহাশ্রোতে আশীতেছে। দুরে থাকিয়া মাজী[২] মাল্লা সকলে বলিল নৌকার বিদ্যমান হৈতে অন্তর (১১) হও। ঐ বাক্য শ্রবণে বক্ষ প্রশারণ করিয়া নৌকার বেগ অনায়াসে ধারণ করিল। উচ্চ প্রাসাদস্থ দিল্লিশ্বর দর্শন করিয়া অতি বিস্ময় হৈয়াছে। বীরনারায়ণ উভয় ভ্রাতা স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া অশ্বারোহণে বাসস্থান গমন করাতে মহা মদমত্ত[৩] হস্তী জল দেওার কারণ মাহুতে নদী তীরে লইতেছে। ঐ সময় মাহুতে বলিল এ মত্ত গজ মানুষ নষ্টকরা। পন্থ ত্যাগ করিয়া অন্যপথে গমন কর। এমত শুনিয়া বীরনারায়ণ অশ্ব বেগে অশ্ব হস্তীর হনুদেশে অগ্র দুই পদ অর্পন করাইয়া দুই হস্তে দুই দন্ত ধারণ করাতে অশ্ব ভূমিষ্ট হওনে দন্ত উপারিয়া ধারণ করিলে হস্তী রক্তধারা নির্গতে ভূমিতে পতন হৈয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। উচ্চ প্রাসাদস্থিতে দিল্লিশ্বর দর্শন করিয়া ভাবিতেছে এই চারি

১। সম্ভাষণ। ২। মাঝি। ৩। মদমত্ত—হাতিদের সঙ্গকামনার সূচক কালের পশ্চাতে যে গ্রন্থিস্রাব হয়। ঐ সময় হাতি উন্মত্তপ্রায় হয়। ঐ স্রাবের অপর নামও মদ।

শুর পরাক্রম করিলে চতুরঙ্গ দল সহিত অনাআসে আমাকে নষ্ট করিয়া রাজ্য লইতে পারিবেক। ইহার সহিত সন্ধান করিয়া দেশে প্রেড়ন করা হয়। এমতে চারি পুত্র সহিত মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণেক ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ তোমার কত সন্তান। রাজা বলিল আমি কাগজ না দেখিলে বলিতে পারি না। সন্তান ও কাগজ দেশে আছে। এমত বলাতে দিল্লি গতপ্রায় বোধ করিয়া সমতারূপ সন্ধানে দেশে বিদায় করাইল। এইরূপে দিল্লী জয় করিয়া চারি পুত্র সহকারে নিজ দেশে আইশাতে প্রয়াগে স্নান তর্পন দানে, পিতৃলোক সকলেক তুষ্ট করিয়া ঈশ্বর বারাণসী ক্ষত্রে[১] ঢুণ্ডিগনেশ, বিশ্বেশ্বর, অন্নপুন্না, কাল ভৈরব দর্শন করিয়া, অশী সন্নিধান গঙ্গার সন্নিধ্য নোলার্ক[২] নাম তীর্থ গোপন আছে। তুলশী দাসের[৩] দেখান মতে নোলার্ক উদ্ধার করিয়া প্রস্থর দ্বারায় তীর্থ শিলা তৈয়ার করিয়া লোলাকেশ্বর[২] নাম লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছে। গয়া আশীয়া মদনমোহন পিতৃপিণ্ড প্রদান করিল পরে পুত্র সহকারে হেঙ্গুল আবাসে প্রবেশ করিয়া অষ্টমাশা পরিমিত পূন্ন মুদ্রা বন্দ (১২) করিয়াছে। দিল্লিশ্বর পুর্ব্ব বাদশা কারণ নবমাশা নব রতিতে পুন্ন মুদ্রা করিয়া চলিত করিতেছেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ভুজবলে দিল্লি জয় করিল। কর গ্রহণ করিল না। একারণ পুন্নমুদ্রা হৈয়া চলিত হইল না। পরে বাসস্থানে ভৌতিক পিড়া উপস্থিত হওাতে ভগবতি আদেশ করিল জে তুমি স্থানান্তরে বাস কর। এমত আদেশ হওাতে মণ্ডল সকলেক ডাকিয়া আবাস তৈয়ার কারন আজ্ঞা দেওনে অর্থ ব্যয় করিয়া এক আবাস করিয়া দিয়াছে। ঐ আবাসে বাস করিয়া থাকিল। ঐ আবাসেক মোড়ল আবাস বলিয়া কয়। রাজার অষ্টাদশ পুত্র গৌরকাবেজ রাখার কারণ আঠারোকোটা করিয়া বাস করাতে তাহার নাম আঠারো কোটা খ্যাত হইল। ঐ আঠারোকোটা আবাসের পশ্চীম দিশে আছে। কামখ্যা মহাদেবীর পশ্চীম দ্বারের দ্বারপাল জলপেশ্বর লিঙ্গ বল্মিক মৃত্তিকাচ্ছাদিত ছিল। গাভি স্বয়ং দুগ্ধ দেওাতে রাজা লোক প্রমুখাত এই তথ্য প্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানে গমন করিয়া খনন করাতে শিবলিঙ্গ উদ্ভব হইল। পরে তাহার মট তৈয়ারী করিয়া দেওার উপক্রমে রাজা কাল প্রাপ্ত হয়। তাহার অষ্টাদশ পুত্র মধ্যে বীরনারায়ণ রাজা হৈয়া রাজনিতি মতে প্রজা পালন করিতেছিল। ইনি ভেলাডাঙ্গরের চতুর্ভুজ স্থাপন করিয়াছে। কতকাল রাজত্ব করিয়া কাল প্রাপ্ত হইলে পর তাহার পুত্র প্রাণনারায়ণ রাজা হয়। এহি প্রাণ-ভুপ গঙ্গা তীরে আত্মশরির ওজনে সোনার এক আত্মমূর্তি তৈয়ার করিয়া উৎসর্গ পূর্ব্বক দান করার কারণ অনেক ব্রাহ্মণেক আবাহন করাতে নিকটস্থ হওনে ঐ স্বর্ন প্রতিমা দক্ষীণ হস্তের ত্রয়ঙ্গুলি দর্শন করায় তাহা না বুঝিয়া গ্রহণ করার উপক্রম হইলে মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে চাহে। এমতে ভয় প্রযুক্তে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না। পরে পুরহিতের পূর্ব্ব পুরুষ সত্যবন্ত নাম ব্রাহ্মণ তিনি গ্রহণ করার উদ্যত হওনে ত্রয়ঙ্গুলী দর্শন করাতে ঐ পুরহিত

১। ক্ষেত্রে। ২। নোলার্ক—ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যদেব, বারাণসী ক্ষেত্রে 'লোলার্ক কুণ্ড' আবিষ্কার এবং তার সংস্কারপূর্বক লক্ষ্মীনারায়ণ তথায় লোলার্কেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। ৩। হিন্দী রামায়ণ রচয়িতা।

সত্যবন্ত শর্ম্মা নিজ ত্রয়ঙ্গুলী প্রতিমাকে দর্শায়া ইশদ এক অঙ্গুলিভঙ্গি কারন। স্বর্ন্ন মূর্ত্তি মুখ মুদ্রিত হৈয়া অধ বাহু করাতে ঐ প্রতিমা ঐ ঠাকুরে গ্রহণ করিয়া তাম্রবর্ন্ন (১৩) শারর কৃষ্ণ হৈয়াছে। পরে ঐ প্রতিমা খণ্ড ২ করিয়া ব্রাহ্মন সন্যাশী সকলেক বিতরণ করিয়াছেন। পরে ঐ ব্রাহ্মন অনেক তপস্যা করিয়া পাপ মুক্ত হৈয়াছেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ কামিনী গুনিরমনি প্রতি কোমলিয় রূপ। আত্ম-নগরে পুরন্দর প্রায়। চারুতর পঞ্চরত্ন সভ্য করিয়া শুখে কালজাপন করিছিল। এই প্রাণ নৃপকৃত মদনমোহন জলপেসের মটকৃত মধুপুরের চতুর্ভুর্জ, ছিরামপুরের মদনমোহন, কাগজ কুটার চতুর্ভুর্জ, বনমালীপুরের বনমালা, দামোদরপুরের মদনগোপাল ও চলন্ত বানেশ্বর পুষ্করিণী খুদিতে প্রাপ্ত হয়। পরে ভগবতি গোশানি রাজাকে স্বপ্নে আদেশ করিল যে আমি যে কাজিলিকুণ্ড[১] মধ্যে নিমগ্ন হৈয়াছি। তুমি শিব বংশ রাজা আমাকে উদ্ধার কর। এমত আদেশ হওাতে কাজিলিকুণ্ডে জাল দিয়া ভগবতীকে উদ্ধার করিয়া মঠ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে। তাহাতে পদ্য লিপি অদ্যাপি আছে। পরে ভগবতীর বৃত্তি পরিচারক নেওাইত নিযুক্ত করে। এহি প্রস্তাবিত ভগবতী জে প্রকারে পূর্ব্বে উদ্ভব হৈয়া জলে নিমগ্ন হয় এ বিষয় এক ইতিহাস বলি শ্রবণ কর। অল্প পূর্ব্ব কালে ভক্তিশ্বর নামে এক খেত্য ছিল। তাহার পত্নীর নাম রঙ্গনা ঈশ্বরী মঙ্গল চণ্ডির ব্রত করিতেছিলেন। ঐ ব্রতে ভগবতী সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে বলিল হে রঙ্গনে তোমার সন্তানেক আমি কমতা রাজ্যে রাজা করিব। এমত স্বপ্ন প্রাপ্ত হইলে পর স্বচী হৈয়া গর্ভধারণ করিআছে। কালেতে ঐ শন্তান প্রশব হইলে ভক্তিশ্বর পুত্র জন্মুৎসব করিয়া কান্ত নামকরণ করিয়াছে। কান্ত পঞ্চম বর্শ হইলে তাহার পিতা ভক্তিশ্বর কাল প্রাপ্ত হইল। পিতৃর উর্দ্ধদেহী ক্রয়া অবশানে ক্লেশভারে কালক্ষয় করিতেছে। শুক্র নামে কোন এক ব্রাহ্মণের ধেনু রক্ষা কারন রঙ্গনার কাছে কহিয়া ঐ কান্তকে গোরক্ষা কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিদাঘ সময় গোচারণ করাতে শ্রান্ত হৈয়া বৃক্ষ ছায়ায় বস্ত্র সজ্যায় শয়ন করাতে নিদ্রা হৈয়াছে। ধেনু রক্ষকহিনে সেশ্চাচার[২] হইয়া শষ্য খাইতেছিল। শষ্যাধিপতি ব্রাহ্মণের ধেনু এমত জ্ঞাত হৈয়া ব্রাহ্মণ প্রতি বলিয়াছে হে দ্বিজ মহাশয় তোমার ধেনু রক্ষক রহিত হৈয়া আমার শষ্য খাইতেছে। এমত শ্রবণ করিয়া রক্ষক উদ্দেশে গমন করিলে পর কিছু (১৪) দূরে গিয়া দেখিল কান্ত বৃক্ষ ছাঞায়ে শয়ন করিয়াছে। শীরের রৌদ্র বারন হেতু এক মহা ফণী ফণা ধারণ করিয়া রৌদ্র বারণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ দর্শন করাতে সর্প অন্তধ্যান হইল। বিপ্র ফনধরকে দর্শন করিয়াছে। পরে কান্তকে ডাকিয়া নিদ্রা হইতে চৈতন্য করিয়া উৎথিত করায়া ধেনু বৎস সহিত একদায় গৃহ প্রবেশ করিয়াছেন। সর্পে যে ফনা ধরিয়াছে ঐ সকল বৃতান্ত ব্রাহ্মণির সাক্ষাৎ বলাতে ব্রাহ্মণ বলিল এরূপ জন কি হয় তাহা বল। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ বলিল এরূপ জন রাজা হয়। এমত বাক্ষ[৩] শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণি তুষ্ট হৈয়া পাক কর্ম্মে নিযুক্তে নানাবিধ ব্যঞ্জন উত্তম অন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ ও কান্তকে পৃথক

১। কাজলিকুড়া—জলাশয়। ২। স্বেচ্ছাচার। ৩। বাক্য।

স্থানে একদায় ভোজন করায়াছিল। ভোজনান্ত হইলে পর তুষ্ট চিত্ত জাত হইয়া ঐকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি বসিয়াছে হে কান্ত তুমি ভোজনে শান্ত লভিয়াছ কিনা। ঐ সময় কান্ত বলিয়াছে আমি সুন্দর রূপ শান্ত লভিয়াছি। কান্ত এ প্রকার বলাতে ব্রাহ্মণ দম্পতি বলিয়াছে হে কান্ত জদ্যপী তুমি এতৎ দেশে রাজা হও তবে আমাকে মনভিলাস মতে পালন করিবা কিনা। এমত বাক্য শ্রবণ করিয়া কান্ত বলিয়াছে আমি দুর্ভাগ্য বিধবার শন্তান। আমি কিরূপে এ দেশের রাজা হইব। ব্রাহ্মণ দম্পত্তি বলিল তুমি এ দেশে আবস্যক রাজা হইবা। এক কথা আমার কখন অন্যথা হইবে না। কান্ত বলিয়াছে আমি রাজা হইলে তোমাকে মনভিলাস সুখ প্রদানে পালন করিব। এ সত্য কথা কখন অন্যথা হবে না। এ মত বলাতে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী রঙ্গনার পরিতোশনে দিয়াছিল। ঐ সামগ্রী মাতৃর নিকট দিয়া ব্রাহ্মণের সহিত জে কথা তাহা বলিয়াছে। রঙ্গনা শ্রবণ করিয়া শূচী পুর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকাতে প্রভাত সময় ভগবতী স্বপ্নাদেশ করিল হে রঙ্গনে তোমার সন্তানেক আজ্ঞা কর। কাজিলিকুণ্ড মধ্যে গমন করুক। তথাতে জলমধ্যে জে বস্তু দর্শন করে ঐ বস্তুকে জেন ধারণ করেন। আমি তাহাকে রাজা করিব। এমত স্বপ্ন প্রাপ্তে উৎথিত হৈয়া কান্তকে নিদ্রা হৈতে উঠাইয়া বাবা তুমি কাজিলিকুণ্ড জাও। ওখানে জল মধ্যে জে বস্তু দেখ (১৫) তাহাকে ধরিবা। এমত মাতৃর আজ্ঞা হইলে পর কান্ত কুণ্ড শান্নিধ্য গমন করিয়া দেখিল একটা বৃহৎ শর্প ফণাযুক্ত রক্ত বর্ণ। রক্ত চক্ষু, লোলিত রশনা, মহা ভয়ানক দর্শন করিয়াছে। তাহার অগ্রভাগ ধারণ করিতে না পারিয়া পুচ্ছ্য দেশে ধারণ করাতে ভগবতী মঙ্গল চণ্ডী রূপ দর্শন দিয়া বলিয়াছে হে কান্ত তুমি শর্পের অগ্রভাগ না ধরিয়া পুচ্ছ্যদেশ ধারণ করিয়াছ অতএব তুমি অল্পকাল রাজত্ব করিবা। তোমার সন্তান থাকিবে না। এ প্রকার বলিয়া অন্তর্ধ্যান হুইল। কান্ত মাতৃ নিকট আসিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছে। ঐ দিবসের রাত্রিতে বিশ্বকর্ম্মা হনুমান দ্বারায় গড় ও পুর সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া এক উচ্চ পাট করিল। দক্ষীণ দেশে শশী নামে এক খেত্য তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিল উত্তর রাজ্যে কমতেশ্বর নামে রাজা হইবে। তাহার তুমি শচীব হইবা। আজ্ঞা অন্যথা করিলে শাস্তি পাইবা। পরে ভগবতি নানা দেশবাসী, নানা যাতি, নানাবিধ শিল্প করিতে পারে এমত লোক সকলেক স্বপ্নাদেশ করিল উত্তর রাজ্যে এক রাজা হইবে। তোমরা সকল প্রজা হইবা। সুখে কাল ক্ষপন[১] হবে। এহি বাক্য অন্যথা করিলে শাস্তি পাইবা। তোমরা সকল শশীপাত্র সহিত গমন কর। এমত স্বপ্নাদেশে সকলী উৎথিত হইয়া শশীপাত্র সন্নিধানে গমন করিল। পরে একযোগ হইয়া উত্তর রাজ্যে গমন করিলে পর ভগবতি কান্তকে স্নান করাইয়া বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত চামিকর রাজ অভরণ অনল সুদিত দিব্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া ঐ উচ্চপাট সিংহাসনে বশাইয়া নিজে কান্ত নাথের শীরপরি[২] ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ কালে প্রজা সমুহে বেষ্টীত শশীপাত্র রাজা সম্মুখাগতে নানা মত উপহার বস্তু ভেটী দিয়া গোচর হওনে রাজা

১। ক্ষাপন—যাপন। ২। শিরোপরি—মাথার উপর।

জিজ্ঞাসা করিয়াছে তোমরা সকলে কে কোন কর্ম্মে শক্ত। এমত বলিলে পর বলিল মহারাজা আমার নাম শশী। দক্ষীণ দিগ নিবাশী যাতিতে খেত্য কাশ্যপ গোত্র শচীব কর্ম্মে বিজ্ঞ। আর ২ প্রজা জে জে কর্ম্মে বিজ্ঞ তাহা গোচর করাতে শশীপাত্র দ্বারায় বাসস্থান নিরুপন করিয়া দিয়া প্রজা সকলেক যথাযোজ্ঞ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছে। মুলুকের জমা বন্দি করাতে হাল কিছু দেড় বুড়ি কৌরি তাহাতে নব্বই লক্ষ মুদ্রা সংস্থাপন হৈয়াছেন। (১৬) পরে কান্ত নাথ হইতে কমতেশ্বর নাম খ্যাত হৈয়া পঞ্চ কন্যা সহিত বিবাহ হৈয়াছিল। তাহাব মধ্যে বনমালা নামে মহীশী তিলত্তমা প্রায় রূপশী নানা গুণযুক্তা তাহার সহিত মহারাজার মহাপূত পঞ্চ রমনী সহিত নানাবিধ সুখ ভোগ করিয়াছে। পরে এক দিবস মহারাজ মৃগয়া করার উপক্রম তাহা জাল পাওা গেল না মনে বিবেচনা করিল যে অরণ্যেক বন কই এবং জলেক বন কই অদ্য অরণ্যের মৃগয়া বারন হইল। জলের মৃগয়া ইহাই অদ্য করিব এমত আলোচন করিয়া ধীবর সকলেক আনার আজ্ঞা করাতে দুত সকল ধীবর সকলের বাসস্থান গমন করিয়া দেখিল তাবৎ ধীবর মৎস মারিতে নানা স্থানে গিয়াছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা ধীবর ধীবরিণী তাহাকে পাইয়া জাল সহিত রাজার সাক্ষাৎ করিল। গোচর মাত্রে সরবরে মৎস মারিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপর ঐ বৃদ্ধ বৃদ্ধা মৎস মারিতে একটা সৌল মৎস পাইয়া তটে তোলাতে শ্যেন একটা ঐ মৎস লইয়া গগন পথে গমন করাতে মৎস ধরণী মণ্ডলে পতিত হইল। ঐ সময় ধীবরিণী মহা হাস্য করিতেছিলেন। এমত দর্শন করিয়া ধীবর বলিতেছে রাজার মৎস শ্যেনেতে অসুচী করিল। রাজা দণ্ড করাতে অপক্ষা নাহি। তাহাতে তুমি কোন শুখে হাস্য কর। ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় হাস্য করিতে ধীবর ক্রোধ হইয়া লগুড় দ্বারায় ধীবরিণীকে বিপরিত প্রহার করিতে উভয় মহাদন্দেজ হইয়া বিচারার্থে রাজার নিকটে গমন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিল, হে ধীবরিণী, তুমি রাজ ভয় অপক্ষা না করিয়া কি কারণ হাস্য কর তাহা বল। রাজার এমত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছে, মহারাজ গোপন কথা নির্জন হইলে বলিতে পারি। পরে নির্জন স্থলে বলিয়াছে, মহারাজ আমি যাতিস্বরা। পূর্ব্বে এই ধীবর ব্রাহ্মণ ছিল। আমি ব্রাহ্মণী ছিলাম। বিষ্ণু বিশয় উপাসক নিরামিশ ভোজন করি। মৎস খাইতে পাইনা। মনে মৎস ইৎসা করিয়াছি। লোকপবাদে ভোজন করি নাহি। আয়ু অবশান হইলে পর ধর্ম্ম-রাজ সভায় বিচার হৈয়া ধীবর কুলে জন্ম দিয়াছে। ঐ কালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন সহিত ভগদত্তের যুদ্ধে সমাগম হওনে তাহার বাহুশ্চেদ করাতে একটা শ্যেন ঐ বাহু লইয়া এতৎদ্দেশে খাইয়াছিল। তাহার বাহুদেশে এক কবচ রূপা (১৭) ভগবতি ছিল। জে স্থানে শ্যেনে বাহু ভক্ষন করিয়াছে তাহার নিদর্শন আছে। এমত বলিলে পর নিদর্শন স্থানে খনন করিয়া ঐ কবচ প্রাপ্ত হইল। তাহাতে গোসানি নাম লিখা আছে। রাজা ঐ কবচ সংস্থান করিয়া কালিকা পুরাণ উক্ত বিধি মতে পূজা করিয়া স্থাপিত করিয়াছে। অদ্যাপী ঐ গোসানি ও কমতেশ্বরের আবাস রাজধানীর নৈরিতি কোনে প্রকাস আছে। পরে কমতেশ্বর বিপিন মৃগয়া করার কারণ গমন করিয়া দুর্গা নাম্মী কোন বারবধুর নিকট রাত্র বাস করিয়া থাকাতে

তুষ্ট হৈয়া জীবন উপায় কারণ তাহার জমি বাড়ি যে ভুগুত্তর[১] দিয়াছেন ঐ স্থানের নাম দুর্গাপুর। জেখানে বন্দর করিয়া দিয়াছে ঐ স্থানের নাম দুর্গানগর। রাজা রুমতেশ্বর জেখানে কালীকা পূজা করিয়াছে তাহার নাম কালিকাপুর। পরে পাঙ্গা মোকামে মৃগয়া করাতে কোটেশ্বর নামে লিঙ্গ প্রকাস করে পাঙ্গেশ্বরী নামে দেবী স্থাপন করিয়া ছিলেন। পরে এক স্থানে আশীয়া দর্শন করিল বহু ব্যাঘ্র ব্যাপিত ঐ স্থানে ব্যাঘ্রশ্বরী নামে দেবীর বাসস্থান দিয়া পরিচারক নিযুক্ত করিয়াছে। পরে শশীপাত্রের বাটীতে রাজা গমন করিয়া সে রাত্র তথাতে বাস করিয়া থাকিতে তাহার পুত্র মনোহর রাজার নজর দিয়া সাক্ষাত হওাতে রাজা কামদেব সাদৃশ রূপবান মানিআছে। রাজা ভোজনাদি কর্ম্মে সাবকাস হৈয়া রাত্র অবশানে নিজ বাসস্থানে গমন করিয়াছেন। বনমালা রানীর সহিত মৃগয়া করার কথালাপে মনোহরের রূপ বর্ন্নন করিয়া বলিয়াছে, ঐ নাগরের তুমি নাগরি। আহা কি পরম শোভা হয়। রানী রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া কামে মোহিত হৈয়া আত্মপতি বিস্মৃত হইল। পরে গোপনে মনোহরের শন্দর্শনে আত্ম ধাতৃকে প্রেড়ন করিয়াছে। মনোহরেক দর্শন করিয়া গোচর হওাতে রানী গোপনে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। রাজা জে রূপ বলিয়াছে ঐরূপ বলিল। নব নাগর কামনায় নাগরেক আবাহন করাতে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত সুরঙ্গ দ্বারায় রানীর গৃহে উপস্থিত হইল। কোন এক স্থানে পেশ্রাব করিলে পর একদায় ঐ স্থল দর্শন করিয়া রাজা বিবেচনা করিয়া জ্ঞাৰ্ত্ত হইল জে অন্তপুরে[২] পুরুষের আগমন হয়। এমতে কোতওালেক শাসন করাতে, সর্ব্বত্র সাবধান। প্রহরা দূতে এক দিবস দর্শন করিল দির্ঘীকা মধ্যে মনোহর ডুব দিয়া দের দুই প্রহর থাকিয়া উৎক্ষিত হয়। এমত কথা রাজার নিকট গোচর করিলে পর (১৮) লোহার এক ডেরু শুরঙ্গ মুখে রাখিয়াছিল। মনোহর অজ্ঞানে ডেরু মধ্যে বন্দি হইয়াছে। রাজার নিকট দূত সকলে লইলে, রাজা দর্শন করিয়া অজ্ঞান তামসে ক্রোধাগ্নী প্রজ্যালনে যশমন্ত নামে খড়্গ দ্বারায় ছেদন করিয়া তাহার মাংস পাক করাইয়া তাহার পিতাকে খাওায়াছেন। শশীপাত্র খাওয়ার কালে মনুষ্য মাংস বোধ করিয়াছে। তখনী পুত্রের লখাঙ্গুরি সহিত সম্মুখে দেখিতে পাইল মনে বিবেচনা করে। আমার পুত্রের অপরাধি আমি নই। রাজদ্রোহ করিতে পুত্রকে মন্ত্রণা দেই নাহি। অন অপরাধে পুত্রের মাংশ আমাকে ভোজন করাইল। রাজশ্রী হওাতে আমাকে এরূপ করে। অতএব এ রাজার রাজ্য ভ্রষ্ট করাতে কোন অপরাধ হবে না। এমত চিত্তে আলোচনে দিল্লিশ্বরের নিকট গমন করিয়া নানাবিধ অযুদ হস্ত দীর্ঘ শশ্রু শমন দূত প্রায় ভিশন অনেক মগল সৈন্য আনাইয়া রাজধানী লুট করিয়াছে। রাজাকে ধরিয়া লোহার পিজারি[৩] মধ্যে ভরিয়াছে। পিজারি লইয়া কিছুদুর গমন করাত ভার মানিয়া জে ভূমিতে রাখিয়াছে, ঐ স্থানের নাম পিঞ্জারিরঝার। রাজা স্নান করার কারণ পিঞ্জারি হৈতে জলমধ্যে প্রবেশ হইয়া অন্তধ্যান হৈয়াছেন। রাজমাতা... বনমালা প্রভৃতি রানী সকলী অন্তধ্যান হৈয়াছেন। জে সময় মগলে রাজাকে ধরিয়াছে

১। ভোগোত্তর। ২। অন্তপুরে। ৩। পিঞ্জর, খাঁচা।

ঐ সময় গোসানীর নিকট হৈতে এক শর্প উৎথিত হৈয়া মুখ ব্যাদানে কবচ রূপা ভগবতিকে লইয়া কাজিলিকুণ্ড মধ্যে অন্তর্ধ্যান হৈয়াছেন। এ রাজার দয়া শুনে সম সর অন্য কেহ রাজা নহে। হাল কিছু দেড় বুরি কৌরি তাহাতে কেহ রাজস্ব দেওার অশক্ত হইলে তাহার কাছে তুশ রাজস্ব লইয়া একস্থানে স্থাপিত করিয়াছিল। ঐ স্থানের নাম তুশ ভাণ্ডার। কমতেশ্বরের জেথানে কুঞ্জর ও ঘোটক ছিল ঐ স্থানের নাম কুঞ্জ ঘোরাঘাট। অবিচার করিয়া রাজার এই দশা প্রাপ্ত হইল। অতএব কমতা ভূপতী শুবিচার করিয়া প্রজার দণ্ড করিবেক। রানীর লোভ ও কামদোসে রাজত্ব নষ্ট করাতে লোকে অপবাদ এ পর্য্যন্ত রটনা করে। শুবুদ্ধিবন্ত লোকাপবাদ ভয় করিবেক এই প্রকারে পূর্ব্বে গোসানির উদ্ভব হৈয়া জলে নিমগ্ন হয়। মহারাজ প্রাণনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণ গুনবান বিচক্ষণ, গম্ভীরে সাগর প্রতাপে তপন সর্ব্বদা প্রবল আনন্দিত মন গুনিগণের বশ্য অপরূপ বেশধর জিনি বেহার (১৯) নগর ধন্য করিয়াছে। ইনি বারামখানার আবাস করিয়াছিল। রাজা গঙ্গা স্নান গিয়াছে, আইশার কালে দীর্ঘ শশ্রু মহাভুজ বলিয়া রজবন সকল দিল্লি-শ্বরের আজ্ঞায় দিল্লি নওার কারণ পন্থ নিরোধ করিয়াছিল। এমত তত্ত বারাম-খানার আবাসে পাইলে পর চতুরঙ্গ সেনা গমন করিয়া ঐ দীর্ঘ শশ্রুযুক্ত জবন সকলেক অস্ত্রে চিন্ন ভিন্ন করিয়া নষ্ট করিয়াছে। পরে দেশে আগমন করিয়া সুখে রাজনিতি মতে প্রজা পালন করিয়া স্বর্গারোহন হয়। এই পর্য্যন্ত অনুক্রমে রাজার বংশ নিপাত হয়। পরে প্রাণ-ভূপতির শ্রেষ্ট তনয়ের তনয় মহীন্দ্র নৃপতি সর্ব্বগুণের আলয় শুঠান[১] কঠীন পিনভুজ যুগ বিংসতি বরিশে জিনি রাজ্য ভারবহণ করিয়াছে। তাহার দত্ব দুন্দুভী জলপেশ্বরে আছে। এ নৃপতির নাম অন্য বংশাবলিতে বলে নাহি। রামসরস্বতি নাম ব্রাহ্মণ কৃত ভিষ্মপর্ব্বের পদে পাওা গেল। ইহা পরে লক্ষ্মীনারায়ণ মহারাজ। কুমার মহীনারায়ণ নাম যাহার কনেষ্ট বীরনারায়ণ এই মহীনারায়ণ সমূহ গুনের আশ্রয় স্থান। সর্ব্বদা পরমার্থ বিশয় অনুরক্ত, যথার্থবাদি, দয়াবন্ত, ধৃতিবন্ত, ক্ষমাবন্ত, পর দুঃখে দুখি, পর শুখে শুখি, জিতেন্দ্রিয়, বিপ্র-বৈষ্ণব ভক্ত বন্ধু বান্ধবের উপকারি, সেবক বৎসল, সুবিবেচক, দাতা, মিষ্টভাষি, এই সকল গুণে মহীমণ্ডলে মহীনারায়ণ নাম খ্যাত অনুজকে গুনালয় দর্শন করিয়া রাজা করিয়াছে। সর্ব্বদা হরি নাম জপ করে। কির্ত্তন করে, এ হেতু গোশাঞি মহীনারায়ণ খ্যাত। তাহার দত্য জলাসয় আবাসের বায়ব্য কোনে তাহার নামে প্রকাশ আছে। তাহার পুত্র জগন্নারায়ণ প্রভৃতি পাছ জন। জগন্নারায়ণ পুত্র বিশ্বনারায়ণ ও বিজয়নারায়ণ, বিশ্বনারায়ণ পুত্র রূপনারায়ণ রাজলক্ষনাবৃত মন্ত্রী সকলে বিবেচিয়া তাহারে রাজা করে। বিজয়নারায়ণ পুত্র শান্তনারায়ণ নাজির দেও। তিনি শান্তেশ্বর লিঙ্গ ও দরিয়া বলাই ঠাকুর স্থাপন করে। শান্তনারায়ণের কনেষ্ট ভ্রাতা সত্যনারায়ণ রাজ্যঙ্গ শচীবরূপে কামকায়া শিব নেত্রাগ্নিতে ভস্ম হৈয়া জেন পুনঃ জন্ম ধারণ করিয়াছে। মহারাজাকে তোরশা নদী আদেশ করিল জে তুমি বারামখানার আবাস ত্যাগ করিয়া

১। সুঠাম—সুগঠিত।

স্থানান্তর হও। রাজা বলিয়াছে আমার বাসস্থান কোথা হবে। পরে তাহাকে আদেশ করিল জেখানে পাথরের খোরা ভাশিয়া লাগে ঐ পশ্চীম শিমনা হৈবেক। ক্ষমাঙ্কবি চিন্ন জেখানে (২০) জে গাছে পরিবেক ঐ স্থান পূর্ব্ব শিমনা। এই নিরূপনে সত্য ত্যাগ করিয়া দেওাতে সেই ভূপ এই বিহারে আবাস করে। অপর প্রবল মগল কুল সর্ব্বনাস করিয়া মগলের মুণ্ডে মুণ্ড মালা রচনা করিয়া পাটগ্রামে নিশান করিয়া দিয়া মুণ্ড মালার চাকলা খ্যাত করায়। ঐ মগলের লুটে কথক রাজচিন্ন তোরশা নদীতে লোপ করে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ নৃপ দয়াধৃতি দান গুণে, প্রজার পালনে বিপ্রেক বৃত্তিদানে নিপুন ছিল। পদ্ম পুষ্করিণী সেই খনন করায়াছে। তাহার মধ্যম দেবতীর কৃত ছোট মঙ্গল চণ্ডী। তাহার পিতার কৃত বড় মঙ্গল চণ্ডী পাঠ দেবতী লাঙ্গলের ঘোষে উদ্ভব। স্বপ্নে পাঠ দেবতী জানায় রানী সহিত বিরোধ করিয়া ধলুয়াবাড়িতে আবাস করে। পরে রানী ভানুদত্ত অধিকারি আকর্শনিক ক্রয়া দ্বারায় বেহারে আনে। তাহার কনেষ্ঠ খড়্গনারায়ণ অতি মতিমান, বিচক্ষণ মন্ত্রনাবিনোদ রাজ্যঙ্গ সচীব কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। উপেন্দ্র-সন্তান দেবেন্দ্রনারায়ণ নৃপতি ছাত্তা রাজা বলিয়া খ্যাত। সেহী দাইনি দীর্ঘিকা খনন করায়াছে। উগ্র কর্ম্মা, রতি শর্ম্মা তাহাকে ছলে বধ করে। নাজীর দেও ও দেওান দেও প্রভৃতি সকলে বিবেচিয়া নৃপ পূর দক্ষীণ ভাগে বাসস্থান খড়্গনারায়ণ নাম। তাহার কৃত দূর্গাচণ্ডী বাশুদেব জগমোহন। তাহার আবাসের দক্ষীণে পুষ্করিণী। এই সকল তাহার কির্ত্তী। তাহার পঞ্চম পুত্র, জেষ্ট রামনারায়ণ শচীব শ্রেষ্ঠ তাহার কৃত ব্রজমোহন ঠাকুর। তাহার পুত্র শুরেন্দ্রনারায়ণ। তাহার পুত্র জিবেন্দ্রনারায়ণ, শচীব শ্রেষ্ঠ তাহার মাতৃর কৃত থানেশ্বরী ঠাকুরানী। তাহার বণিতাদ্বয়ের দত্ব তাহার আবাসের পশ্চীম পুস্করিণী। খড়্গনারায়ণের মধ্যম পুত্র পূরুষের মধ্যে প্রধান অতি মতিমান দেব দ্বিজগুরু ভক্ত, সিন্ধু প্রায় ধৃতি, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ জাহার কারণ ভোট সমন দমন গিয়াছে। কলিকালে দানগুণে কল্পবৃক্ষ প্রায় তুলনাবস্থান। হরিচন্দ্র ভূপ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হৈয়া মোক্ষ সেনাপতি দ্বারায় অরাতি সমূহেক নষ্ট করিয়া পিতাকে মুক্ত করিয়াছে। পরে অবিবাহে কাল বশ হয়। পুনরায় ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ নৃপতি সিংহাসনস্থ হৈয়াছিল। তাহার মাতৃরকৃত মদনগোপাল, ভাবগোপাল, দিন দয়াল, (২১) দোল গোবিন্দ। মহারাজার ধাতৃ দুই আইরকৃত বংশীবদন বেহারের অগ্নিকোনের পুষ্করিনি দেওাইর দীগি তাহার নাম। মহারাজার মহীশির কৃত রাধারমন। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কনেষ্ঠ তনুজ মনুজ মধ্যে প্রধান নৃপ বিশ্বসিংহ ও কুঙর মহীনারায়ণ কুল পুঞ্জ পুঞ্জেতে প্রধান তিন দেবতার নাম একাত্র হৈয়া হরেন্দ্রনারায়ণ খ্যাত হয়। নৃপশীরোমনী যার বাক্য পিযুশ সদৃশ। হর অংশে হর বংশে অবতংশ শিবের কুমার বিশ্বশিংহ প্রায় রূপ। বলেতে মল্লদেব প্রায়, শুলক্ষণে লক্ষ্মীনারায়ণ। শিষ্ট মতি, ভক্তি গুণেতে রাজা বীরনারায়ণ। রমণী বিলাসে, অপর ভোগে, গানে, চাতুরী করিতা গুলির গুণের গ্রহণে, আদানে প্রদানে, বিধির সন্ধানে প্রাণনারায়ণ। গাম্ভীর্য্যতা গুণেতে

মোদনারায়ণ। ভুবনমোহন, শ্যামচিকন বরণ, মেরুশিখরেতে ঘন প্রায়, মাথে মুঞ্জ কেশর, বহুল কপাল, কোটায় শোভিত ইশদ হর্শ মুখ দর্শন করিয়া দুঃখ দুর হয়। লোচন যুগল কমলের দল প্রায়, তীলকুশুম প্রায় নাশামুখেতে, মুক্তাপান্তি প্রায় দন্ত, কামধনু প্রায় ভুরু, ভঙ্গিমা মুখ পূর্ন্ন চন্দ্র প্রায়, বদনের শশ্রু জাহারে গোপ বলে পূর্ন্ন চন্দ্র কোলেতে জেমন কলঙ্ক। বিশাল বহল বক্ষতাহে লোমাবলি করিশূণ্ড প্রায়। ভুজদণ্ড তাহাতে সুন্দর নানা অলঙ্কার বিরাজ করে। জে ভুজের প্রতাপে অরাতির বনিতাসকল বৈধব্য ধর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন। জাহাকে নবনিপুত্তলি প্রায় শুকোমল প্রমোদা সকলে প্রমোদ দিয়াছে। দর্শনে অশেষ কিল্বিষ নাস প্রায় অজ্ঞান তামশ নাশ করিয়া বেহার গমনে প্রকাশ করিয়াছে। ধ্যান মত দেবদেবীর মূর্ত্তি করিয়া যাগযজ্ঞে স্থাপন করিয়াছে। তাহার নাম বলি, চেনা ব্রজগোবিন্দ, রশরাজ কৃষ্ণ, বলরাম, বানেশ্বর মোকামে অর্দ্ধনারিশ্বর, চলন্ত সিদ্ধেশ্বরী প্রকাশ করে জলাশয় করিয়া উৎসর্গ করেন। জয়তারা আনন্দময়ী কালী স্থাপন করে অন্নপূর্ন্না মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছে। গোসাঞিগঞ্জ মোকামে বামাকালী স্থাপিত করিয়াছেন। আবাসের দক্ষিণ ভাগে কিছু দুরে মেদিনী সাগর নামক বৃহদ্ পদ্মাকর খনন করিয়া তাহার পশ্চীম ইষ্টকালয় করিয়া হিরণ্যগর্ভ নাম মহাদেব স্থাপন পূর্ব্বক পদ্মাকর উৎসর্গ করে। তাহাতে পরিপূর্ণ জল নির্ম্মল বিপ্রাদিবর্ণে স্নান (২২) তর্পন করিতেছে। পুর দক্ষীণ ভাগে তোরশানদী পূর্ব্ব কেনারে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিহার বাসস্থানে এক দীর্ঘিকা দিয়াছে। তাহার নাম যমুনা। পুরের সান্নিধ্য উপবনের পশ্চীম নদী তীরে এক দীর্ঘিকা দিয়াছে। পরে আবাসে ভৌতিক হওাতে ভেটাগুড়ি মোকামে এক আবাস করে। তাহাতে বহু পুষ্করিণী সকল শলীল মৎস পরিপুর ভেটাগুড়ি বেষ্টীত। পুর সমুদ্র বেষ্টীত লঙ্কা পুর প্রায় পরে ঐ পুরে ভৌতিক হওাতে ধলুয়াবাড়ি মোকামে উপেন্দ্রনারায়ণ নৃপতি কৃত আবাসে বাড়ি করেন। তাহাতে কতকাল বাস করিয়া থাকাতে অনেক সরবর খনন করিয়া উৎসর্গ করেন। শিব স্থাপন করার মন্দির করিয়াছে। সে আবাসে ভৌতিক হওাতে পুনরায় পুরান আবাসে বাস করে। এহি মতে রাজার তিনপুরে বাস হয়। পূর্ব্বে সুন্দদৈত্য পুত্র ত্রিপুর নামক দৈত্য জন্মিয়া তিনপুরে বাস হৈয়াছে। তদপ্রায় মহারাজার পত্নি সকল জে জে দেবতা স্থাপন করিয়াছে তাহা বলি। বড় আই দেবতিকৃত রাধাবিনোদ। গজেন্দ্রনারায়ণ সুভাদেউর কৃত ডাঙ্গর আই দেবতির পুজিত রাধানাথ ও নিত্যানন্দ চৈতন্য মূর্ত্তি। নায়েকের বেটী আইর কৃত রাধামাধব। বড় মহারানী মাতার কৃত দিনদয়াল গিরিনাথ। মই তারা নাগেশ্বরীর আইকন্যার কৃত জগবন্দু ঠাকুর ঠাকুরানি লক্ষ্মীমূর্ত্তি। বন্দর নিকট পুষ্করিনি কাশীতে হরেন্দ্রশ্বর লিঙ্গ কাশীর আই কন্যার কৃত কুঞ্জ বেহারি ঠাকুর ঠাকুরানি। জয় দুর্গা বন্দরের পূর্ব্ব উত্তর দিগে অনাথনাথ মহাদেব। তাহার সম্মুখের পুষ্করিনি বামনহাটের কালী সিদ্ধেশ্বরী কালীতে কৃত মায়া কালী রাতৃশ[১] চুড় মহাদেব। চতুর্থ মহারানী কৃত

১। রাতৃশ<রাত্রি+ঈশ=রাত্রীশ

দিনদয়াল ঠাকুর ঠাকুরানি। শিদলখচিয়[1] আই দেবতির কৃত রাধামোহন রায়ের বেটী আই কন্যার কৃত ব্রজবল্লভ। কায়েতের বেটী আই কন্যার কৃত ভবনমোহন। মহারাজ অগনন শিব লিঙ্গাচর্ন করিয়াছে। যাগযজ্ঞ কাজে সর্ব্বদা উৎযোগী। পরমেশ্বরের দ্বাদশ যাত্রা করিয়াছেন। পন্তি সকলের দ্বারায় করায়াছেন শ্রবণ কির্ত্তনে রত চিত্ত। গুরু বিপ্রভক্ত আশৃত জন পালনে নিপুন বাক্যবন্ত, বুদ্ধিবন্ত (২৩) সহিত মহাপৃত পর উপকারি, সেবক বৎসল, মর্জাদিক অতিথি জাচক, দর্শনে মহাগুথি, মিত্র চিত্ত, প্রফুল্যকারক, অহঙ্কার হিন, সর্জন সহিত সঙ্গ বাঞ্চা, পরগুণ দর্শনে মহাপ্রিতি, গুরুতে শম্রতা, বিবিধ বিদ্যায় অভ্যাস, আত্ম যুবতিতে রতি লোকাপবাদ ভয়, পুজিতে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি, খল সংসর্গ রহিত। এহি সকল নির্ম্মল গুণে গুণি। মিত্র প্রতি সখ্যতা, শ্বপুতে লয় ও বলে লুব্ধ জন প্রতি ধন প্রদানে, কার্জ্যে ঈশ্বর আদরে, বিপ্র প্রেমে যুবতী গুণে বান্ধব উগ্রজনে স্তুতি, গুরুতে প্রণতি, মুর্খ জনে ইতিহাস যুক্ত কথা, পণ্ডিত প্রতি পাণ্ডিত্য, রশীক জনে রশে। এই সকল শিলে বস করিয়াছে। যাহার যশশ্যা শুকির্ত্তি রামায়নে বাল্মিক, বশীষ্ট বংশে পরাশর, কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন, শুকদেব, পুরাণ ভাগবতে ভারতে গান করিয়াছে। তাহার গুণের মহিমা অন্য কবিতায় কি দিবে। যজ্ঞ বহুবিধি হোম দ্বারায় যজ্ঞ প্রশস্ত ঈশ্বরী শরৎকালী অর্চ্চনে চারিলক্ষ হোমবৃদ্ধি করিয়া পূর্ব্ব লক্ষ হোম সহিত পঞ্চলক্ষ হোম ও লক্ষ বলি দ্বারায় যজ্ঞ করিয়াছে। এতাদৃশ যজ্ঞশালি কারক পূর্ব্বাপরে কোন নৃপতি হয় নাহি। অতএব এবিসয় পুরাতন এক ইতিহাস বলি। অতি পূর্ব্বকালে যজ্ঞশালি ও বিষ্ণুশালি নাম দুই ব্রাহ্মণ ছিল। সম্বন্ধে পিতামহ পৌত্র। সর্বদা যজ্ঞ কার্যে নিযুক্ত চিত্ত হেতু যজ্ঞশালি নাম খ্যাত। সদা বিষ্ণুতে নিযুক্ত চিত্তহেতু বিষ্ণুশালি নাম খ্যান। যজ্ঞশালি যজ্ঞ কার্যে নিযুক্ত থাকাতে বিষ্ণুশালি যজ্ঞ কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া দেওনে কোন এক দিবস যজ্ঞ কাষ্ঠ সঞ্চয় করাতে শ্রান্তযুক্ত হৈয়া প্রান্তরে বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম করিতে যজ্ঞ কাষ্ঠ অভাব হৈয়াছিল। যজ্ঞ কাষ্ঠ লইয়া নিকট হইলে পর যজ্ঞশালি পৌত্র প্রতি সাপ প্রদান করিল তুমি দৈত্যকুলে জন্ম হও। এমত বলিলে পরে বিষ্ণুশালি ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অপরাধ ভঞ্জন বিসয় প্রার্থনা করাতে যজ্ঞশালি বলিয়াছে এ জন্মে তুমি আমার পৌত্র। তুমি দৈত্য যুনি সম্ভবে আমিহ তোমার পৌত্র হৈয়া জন্মধারণ করিব। কালেতে সাপ মোচন হৈয়া মোক্ষ প্রতি গমন করিবা। এমত বলিলে পর বিষ্ণুশালি হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রলহাদ রূপে জন্মধারণ করিয়া সয়নে, সচেতনে, গমনে, ভোজনে, আলাপনে, প্রাস্থারে, সভায়, পরমেশ্বরের গুণ স্মরন করিয়াছে। (২৪) কালেতে ভুজ বলে পৈতৃকি সপ্ত স্বর্গাধিপতি হৈয়া পালন করিয়াছেন। পরে বিষ্ণুশালির পিতামহ যজ্ঞশালি প্রলহাদ পৌত্র বলি দৈত্যেন্দ্ররূপে জন্মধারণ করিয়া বিষ্ণু ভক্তি পরায়ন হৈয়াছে। অশঙ্খ হাজার চতুরঙ্গ দল সহিত সমস্ত প্রিথিবী জয় করিয়া অধিকার করিয়াছিল। পরে স্বর্গ জয় হেতু অশঙ্খ্যাত সন্য সহিত সজ্য হৈয়া প্রলয় কালের গমন বিশিষ্ট মেঘ ঘটা প্রায় অর্জুত কোটী লক্ষ দন্তাবল, যত গজ তত রথ, নানা বর্ণ পতকায় আকাশ পথ আশ্চাদিত, চামর ব্যেঞ্জন

১। শিতলখুচি।

বিরাজিত, অৰ্দ্ধ অৰ্জুত কোটী লক্ষ তুরঙ্গ, অশ্ববার অশ্বপ্রিষ্ঠে আরোহণ, তনুতে তনুত্রান ধনুৰ্ব্বান ধারণ। এমত পদাতি পঞ্চশত গজ প্রতি নিযুক্ত। এইরূপে গমন সময় পদভরে ধরণী বারম্বার কম্পিত হৈয়াছে। কুম্ভাণ্ড ক্রুপ কৰ্ন্ন আদি মন্ত্রী হজারে হাজারে পরাক্রমী সত্যশীল বলি প্রায় বলি পুত্রবান প্রভৃতি একাধিক শত ভ্রাতা বলি সহকারে যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। বীর সকলের সিংহনাদ ডুন্দুভী নিশ্বন ধনুষ্টঙ্কার হয়ের হেশন, গজের বৃংহিত এবম্বাদি শব্দে ধরণী পিড়িত করিয়াছে। বিষ্ণু মন্ত্র স্মরণপূৰ্ব্বক শুভক্ষণে হৰ্শযুক্ত হৈয়া যুদ্ধে গমন করিয়া, পৈতৃকি ভুলোকাদি সপ্ত স্বর্গ সাসন করিয়া, মহারাজ চক্রবর্তি সৰ্ব্বদা যজ্ঞদান কৰ্ম্মে নিযুক্ত চিত্ত, পরে দেবমাতা অদিতি পুত্র সকলের ক্লেষ দর্শন করিয়া যে ব্রহ্ম শনাতন শ্রীরাধাকান্ত রূপে সম অবয়ব রাখাল সহিত গোলোকে গোচারনে বংশীগুরে গোপবধু সকলের মন মোহিতপূৰ্ব্বক গোপঙ্গনা কমলানন মধুশালি ভৃঙ্গ হইয়াছে। সেই শ্রীরাধা তাহাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিশয় যুক্ত হৈয়াছিল। তাহার সন্তান শ্বেত দ্বীপ নিবাসী মহাবিষ্ণু। তাহার এক ২ লোমবিবরে এক ২ ব্রহ্মাণ্ডে স্থিতি স্থুল হৈতে স্থুল, শুক্ষ্ম হৈতে শুক্ষ্ম, বাণী লক্ষ্মীকান্ত রূপে জগত পালন কর্তা। মৎস কুৰ্ম্মাদি রূপে দুষ্ট দলন করিয়া, ভক্তি প্রকাশ, বিনয় ভক্তেক ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক রাজ্য সম্পদ প্রদান করিয়া অভয় হস্ত, পদ, মস্তকে প্রদানে ভক্তি বিতরণ করিয়াছে। প্রকৃতিরূপে ভক্তেক উদরে ধারণ করিয়া যজ্ঞ বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিয়াছে। তারক ব্রহ্ম শ্রীরাম নাম অবতারে সেবকের নাম মস্তকে শিখায় ধারণ করিয়াছে। সেবকের সহিত জ্ঞাতি (২৫) কুটুম্ব সমুন্ধ ধারণ করিয়াছেন। শঙ্খচূড় নাম দানব রাজাকে নষ্ট করিয়া তাহার পত্নি বৃন্দা নামা মহীশিকে হরণ করিয়া গিরি গোবৰ্দ্ধন কাছে বৃন্দার বাসস্থান দিয়া বৃন্দাবন খ্যাত করায়াছিল। তদবধি বৃন্দার নাম তুলশী খ্যাত। এহেতু তুলশী বল্লভ নাম প্রকাশ করিয়াছে। তুলশী শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ নাম প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শ্রীরাধা দ্বিভাগ হৈয়া লক্ষ্মী সরস্বতিরূপা হইয়াছে। যে লক্ষ্মী সমস্ত দ্রব্যের অধিষ্টাতৃ দেবী তিনী জাহার গৃহে না থাকাতে তাহাকে লোকে লক্ষ্মীছাড়া বলে। যে বাণী সকলির জিভ্যাগ্রে নিবাস করিয়া বাক্যরূপা হৈয়াছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া পণ্ডিত সকলে যশস্যা কির্ত্তি উপাৰ্জ্জন করে। তিনি যাহার জিভ্যাগ্রে নিবাস করে নাহি তাহাকে লোকে বোবা বলে। সেই শ্রীকান্ত সাবিত্রি পতিরূপে জগত সৃষ্টী বিধান কৰ্ত্তা, সেই সতি পতি মহেশ্বররূপে জ্ঞানির জ্ঞানদাতা। যাহার সহিত পরম ভক্ত সকলে অধভুবন উদ্ধভুবন জ্ঞান করে তাহার বিহিনে উদ্ধভুবন অধ-ভুবন জ্ঞান হয়। তাহার মহিমার পার কে পারে, তাহার পদারবিন্দে শত কোটী বার প্রণাম করি। তাহাতে দেবমাতা আদিতি তপস্যা করিয়া তাহাকে উদরে ধারন করিয়াছিল। শ্রীহরি আদিতি হৈতে জন্মধারণ করিয়া অদিতিনন্দন নাম ধারণ করিয়াছে। ইন্দ্রের অনুজ হেতু উপেন্দ্র নাম হৈয়াছেন। কিয়ত কালান্তরে উপনয়ন হইলে খৰ্ব্ব হেতু বামন নাম ধারণ করিয়া, যজ্ঞশালি বলি যজ্ঞে উপস্থিত হৈয়া ত্রিপাদভূমী প্রার্থনা করাতে ত্রিপাদযুক্ত ব্রাহ্মণ বামন পাদ পদ্মে দানার্পণ করিলে বামনের উৰ্দ্ধপাদ ব্রহ্ম কমণ্ডলু প্রাপ্তে গঙ্গা প্রবাহ হওনে মহাদেব মহাদরে মস্তকে ধারন করিয়া গঙ্গাধর নাম খ্যাত করে। শ্রীহরির ব্যোম পাদ নাম খ্যাত হয়। ভক্তবৎসল জেষ্ঠ ইন্দ্রেতে রাজ্য সম্পদ দিয়া যজ্ঞশালি বলিকে বলিয়াছে

তুমি কলিযুগে ইন্দ্র হইবা। এমত বলিয়া যজ্ঞশালি বলি পৌত্র বিষ্ণুশালি প্রলহাদ দৈতেন্দ্র পিতামহ সহিত সুতল গমন করিয়া, দ্বারস্থিত বিষ্ণু সন্নিধানে ভক্তিযোগে হরি কির্ত্তনে তদ গদ ভাবে লোমাঞ্চ শরিরে আনন্দাশ্রু পাত করিয়াছে। এই বলি কলিযুগে দেব রাজ্যে ইন্দ্র হৈয়া পৈতৃকি ভুলোকাদি সপ্ত স্বর্গের নানাবিধ সুখভোগ করিবেন। বলিকে ছলনা করিয়া (২৬) শ্রীহরির বলিধ্বংশী নামাখ্যান হৈয়াছিলেন। অতএব জন্ম জন্মান্তরার্জিত সুকৃত কর্ম্ম সংস্কারযুক্ত হৈয়া সঙ্গে ২ গমন করে। মহারাজার ধাতুময় দশ অবতারের মুর্ত্তি মধ্যে আত্মপূর্ব্ব পুরুষ প্রলহাদ, নরসিংহ রূপে, বামন রূপে আত্মমূর্ত্তি প্রকাষ করেন। যেহেতু নরদেহ অল্প রাজ্য, তাহা বৃহদ্বর্ম্ম পুরাণে অদিতি দেবীর তপস্যা যোগে বিস্তারিত আছে। প্রলহাদ ও বলি বান উপাখ্যান হরি বংশে আবির্ভাব হৈয়াছে। অথন হরবংশে আবির্ভাব হইয়া প্রায় তীরভাব হইল। এ মহারাজ কাশী গমনে তিন বৎসর বাস করিয়া মহাদেব স্থাপন ও কালী স্থাপনের উর্দ্যোগ করিতে সোনারপুরার বাড়ি মোকামে সুন্ন নেত্র নেত্র[১]শকার সুরু জৈষ্ঠ মাস কৃষ্ণ প্রতিপদে কাশী প্রাপ্তি হয়। তাহার পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ ও মেঘেন্দ্রনারায়ণ ও রাজ কুমার শড়[২] বৎসরে কাল প্রাপ্ত। মহীন্দ্রনারায়ণ, পুনিন্দ্রনারায়ণ, শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ, নন্দিকুমার পঞ্চবর্শে কাল পায়। যোগেন্দ্রনারায়ণ, শ্রীলিলেন্দ্রনারায়ণ সকলি মতিমান, গুণবান। মহীন্দ্রনারায়ণ কৃত কৃষ্ণ বলরাম, লক্ষী জনার্দ্দন ও পুষ্করিণী দ্বয় তাহার বাড়ি মধ্যে আছে। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ কৃত কুঞ্জ বেহারি ঠাকুর যোগেন্দ্রনারায়ণ কৃত। জগত মোহন ও তাহার ঠাকুরানী মহারাজার পুত্র সকলের জেষ্ঠ শিবেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ অনায়াসে রত্নপিঠ মেদিনী শাসন করিয়াছেন। সমূহ রূপ গুণের নিকেতন মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন তাহার পুত্র অভিমন্যু শিক্ষা দর্শনে প্রতিবিম্ব অর্জ্জুনের প্রায় দর্শন হয়। ধলুয়াবাড়ীর আবাসে পিতৃকৃত দেব মন্দিরে শ্রীশ্রীসিদ্ধনাথ নাম লিঙ্গ ভক্তি শ্রদ্ধাভাবে স্থাপন করিয়া নিজ রাজধানিতে পিতৃর কৃত ইশ্বরী তারার মন্দির উৎস্বর্গ করেন। পুর সন্নিধানে দক্ষীণ ভাগে দেবখাত প্রায় জলাসয় করিয়া উৎস্বর্গ করেন। ছত্র নাজিরী পদে থাকাতে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং মহাদেব মহাদেবীকে অর্চ্চন করিয়াছে। পত্নি সকল দ্বারায় জে সকল দেবতা স্থাপন করিয়াছে তাহা বলি, মধ্যম আই ঘরণী মদনগোপাল, বিনোদ বেহারি ঠাকুর ঠাকুরানী পিশু আইর কৃত গোপি বল্লভ, বুড়ি আই ভাণ্ডানির কৃত বংশীবদন ঠাকুর ঠাকুরানী। থাগড়াবাড়ি মোকামে জে বাসস্থান ছিল ঐ স্থানে ইন্দ্রের কানন সদৃশ এক উদ্যান বাহের ভিতরে দুই (২৭) জলাশয় উৎস্বর্গ করিয়া রাজত্বের পূর্ব্ব আমলের আমাত্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, কুটুম্বের কুটুম্ব সকলের বাসস্থান দিয়াছে। পুষ্করিণীর জল নির্ম্মল সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ সকল স্নান, তর্পণ করিতেছেন। পূর্ব্বে বেহারে আদালত ফৌজদারি আফিল ছিল, দওরা ছিল না। ফৌজদারির বিচারের পুনঃ বিচারার্থে দওরা নামক মহকুমা

১। সুন্ন নেত্র নেত্র=শূন্য নেত্র নেত্র—অঙ্কস্য বামাগতি নীতি অনুসারে ৩৩০ রাজ শক। ৩৩০ রাজ শক=৩৩০+১৫০৯=১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়।

২। ছয় বৎসর।

প্রকাশ করেন। নৃপতি হইয়া আফিল দওরার পর পুনঃ বিচার নিমিত্তক রাজসভা নামক অর্থাত উত্তমার্থ বিচারালয় মহকুমা প্রকাশ করেন। দারুময় শোভনযুক্ত রথ করিয়া রথযাত্রা করিয়াছে। এহিমতে মেদিনী শাসন করিয়াছেন। সহযোগী আমাত্যবর্গ শুবিচারে লক্ষ প্রার্থির মহাযজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনাদি নানা যজ্ঞ আচরিত অতিথি পূজক পূর্ব্বকালে গঙ্গা কির্তি করার কারণ দিলীপ নরেশ্বর হিমাচল গিয়াছে। তিনি গঙ্গা কির্ত্তি করিতে না পারিয়া কালবস হয়। পরে তাহার পুত্র ভগিরথ বংশধর শুকির্ত্তিবান পিতৃ সকলের প্রতি স্নেহক্রমে তপবলে সনামে গঙ্গাকির্ত্তি করিয়া প্রপিতামহ সকলেক ব্রহ্মশাপ হৈতে মুক্ত করিয়াছে। তদপ্রায় এ নৃপের শিব কির্ত্তি। কাশীতে গমন করিয়া পিতৃকৃত দেব মন্দিরে শ্রীশ্রীকরুণাময়ী কালী শিবেন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ, পত্নি দ্বারায় কামেশ্বর লিঙ্গ, পুত্রের দ্বারায় নরেন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করে। গ্রহনেত্র নেত্র শকার[১] ভাদ্র মাস শুক দ্বাদশী তিথিতে কাশী প্রাপ্তি হয়। এ মহারাজ স্বয়ং ভার্য্যার দ্বারায় ও পুত্রের দ্বারায় মহাদেব লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। অপর মহাদেব মহাদেবী প্রিতার্থে যেরূপ দান ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছে এরূপ দান দেশে কখন করে নাহি। অতএব ইনি মহাদেবের মহাভক্ত। এ বিসয় এক ইতিহাস বলি। পূর্ব্বকালে বলি দৈত্যেন্দ্র রাজ্য ভ্রষ্ট হইলে পর তাহার একাধিক শতপুত্র মধ্যে জেষ্ঠ পুত্র বান নামে খ্যাত। হিমাচল সন্নিধানে আশীয়া যে মহাদেব উমাকান্ত রূপে উমা সহিত জ্ঞানি সকলের জ্ঞান দাতা জ্ঞানদায়িনী হৈয়াছে জাহাকে শনক শনাতন প্রভৃতি ব্রহ্মঋশী সকলে বেষ্টীত হৈয়া উপাসা করিতেছেন, সতী, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টী, ক্ষমা, শ্রদ্ধ্যামতি, স্মৃতি প্রভৃতি দ্বিত্রিংশত কন্যারূপে দক্ষ প্রজাপতি গৃহে জন্ম হৈয়া সকলির জননীরূপা হৈয়াছেন। সতী সয়ম্বর কালে শঙ্কর রহিত সভা বিলোকনে নমো শিবায় উক্তপূর্ব্বক প্রিথিবিতে বরমালা নি (২৮) ক্ষেপন করাতে অকস্মাৎরূপে স্বয়ম্ভর স্থলে প্রিথিবি হৈতে উদ্ভব হৈয়া সতির বরমালা গ্রহণ করিয়াছে। দক্ষ যজ্ঞ গমন কালে কালী, তারা, শোড়শী, ভুবনেশ্বরী, প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যারূপে দশ দিগ ব্যাপিনী হৈয়া মহাদেবেক দর্শন দিয়া ছিল। সতি পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞে দেহ ত্যাগে, হিমালয় কন্যারূপে শঙ্কর পতি প্রাপ্তা হৈয়া গণপতি কুমারের জননী হৈয়াছে। এই মহাদেবি দুর্গ নাম অসুরেক যুদ্ধে নষ্ট করিয়া দুর্গা নাম ধারণ করিয়াছিল। এই দুর্গা নাম জপ করিয়া মহাদেব মহাবিষ পান হৈতে ত্রাণ পায়াছেন। পরম শৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন, দধিচি, দুর্ব্বশা, উপমন্যুবান, দশানন, স্বেতকীমরুত্ত এহি সকল ভক্তের অভিমত পুর্ণকারক পূর্ণকর্তৃ হৈয়া ইন্দ্রাদি দশ দিগপালরূপে এবং তাহার শক্তিরূপে দশ দিগ পালন করিয়া অম্বর রূপে পরিধান করাতে দিগম্বর দিগম্বরী নাম খ্যাত। যে মহাদেব রুদ্ররূপ ধারণে, ত্রিপুর নাম দৈত্যেক নষ্ট করিয়া, ত্রিপুরারি নাম হৈয়া, ত্রিদশ সকলের স্তবেতে আনন্দ যুক্তে নর্ত্তন করাতে, আনন্দাশ্রু কামরূপ ক্ষেত্রে পতন করনে রুদ্রাক্ষ উদ্ভব হৈয়াছে। ঐ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে কিম্বা মৃত্যু কালে মৃত্তিকা নিচভাগে থাকিলে অন্তে রুদ্রলোকে বাসদাতা হৈয়াছেন। রুদ্রাণী রূপে মহিসাসুর ধুম্রাক্ষ রক্তবিজ সম্ভু নিসম্ভূ দানব ঘাতিনী হৈয়াছে। এই সকল মহাদেবীর মহাত্ম্য আপদ কালে পাঠ করিলে কিম্বা পাঠ করাইলে

১। ৩৩৯+১৫০৯=১৮৪৮ খ্রীঃ

আপদ নিস্তার হয়। অপর যুনি লিঙ্গরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক সর্ব্বত্র পূজিত পুজিতা হৈয়া দিব্যস্তব যুক্তা হৈয়াছেন। যে মহাদেবের মস্তকে পতিত উদ্ধারিনী ব্রহ্ম পাদম্ভবা দিনহীন জননী গঙ্গাদেবী যে কালেতে গোত্রক্ষত পুত্র কলত্র পরিত্যাগ করেন সেই কালে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত করাইতেছে। যাহার কনা মাত্র জল পানে ব্রহ্ম ইত্যাদি পাপ বিনাস পায়। এমত গঙ্গাধর প্রভৃতিনি পুরুষত্তম সহিত সর্ব্বদা মিলনার্থে ভুবনেশ্বরী নাম শক্তি সহিত একম্বর কাননে বাস করিয়াছে। অপর উত্তর বাহিনী গঙ্গা তীরে অন্নপুর্না শক্তি সহিত সকলিকে আনন্দযুক্ত করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্না নামে আনন্দ কানন খ্যাত করিয়া আশৃত জনেক মোক্ষ প্রদান করিতেছে, যে মহাদেব লক্ষী (২৯) স্তনম্ভব বেল্য পত্রে তুষ্ট হয় এমত পুরাণ পূরুষ মহাদেব মহাদেবী পাদপদ্মে শত কোটী বার প্রণত হই। তাহাতে বান কোচব তপস্যা ও তাণ্ডবে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করাতে মহাদেব মহাদেবী দর্শন দিয়াছেন। পরে বান মহা পুরানুক্ত নানাবিধ স্তোত্রে স্তুতি করিয়া লোমাঞ্চে অশ্রুপাত করিয়াছিল। ভক্তানুগ্রাহী মহাদেব দর্শন করিয়া মহাদেবী প্রতি বলিয়াছে, হে মহাদেবী ইনি পরমভক্ত বলি দৈত্যেন্দ্র পুত্র প্রল্হাদের প্রপৌত্র, ইহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে হয়। এমত বলিয়া মহাযোগ মহাজ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন। ঐ সময় ভগবতী বলিল হে বৎসবান জে স্তন ক্ষির পান করিয়া গণপতি কার্ত্তিক সর্ব্বত্র জয় হইল, তাহা তুমি পান কর। এমত বলাতে দৈত্যেন্দ্র পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া স্তন পানাকাঙ্খি হৈয়াছেন। স্তন নিষ্পিরণ করাতে পর্ব্বত ভেদ হৈয়া বানের মুখে ক্ষির ধারা পতন হওনে তার এক ধারা পর্ব্বত ভেদ করিয়া ত্রিশ্রতা নামক নদী প্রবাহযুক্ত হৈয়াছে। পরে পরমেশ্বর পরমেশ্বরী বানেক সঙ্গে লইয়া এতৎদ্দেশ আগমনে স্থনিত পুরমধ্যে অগ্নিগর করিয়া এতৎ দেশের রাজা করিয়া গড়ে বাসস্থান দিয়াছেন। ভক্তের রক্ষন কার্য্যে দ্বারদেশে বাস করিল। এহেতু বানেশ্বর লিঙ্গ অর্দ্ধ নারীশ্বর ধ্যান অদ্যাপি বিরাজমান আছে। অতএব মহাদেব মহাদেবী হৈতে ভক্তবৎসল ভক্তবৎসলা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কেহ নহে। কার্ত্তিক গণপতি প্রায় মহাস্নেহে পালন করিয়াছেন। এই বানের সহস্র ভুজ মহাবলশালি যাহাকে দর্শন করিয়া দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নরচারণ মহাভিত হৈয়া পলায়ন করে। ঐ বানের বাহু আস্ফোটে প্রিথিবি কম্পবান হয়। প্রাগযতিশপুরে প্রিথিবি পুত্র নরক নামে তাহার সহিত সখিত্ব করিয়া কামাখ্যা মহাদেবীকে অর্চ্চন করিয়াছিল এবং দেবতা সকলেক শাসন করিয়াছে। বান মহাবলে বলিয়ার হৈয়া মহাদেব সহিত যুদ্ধ করার প্রার্থনা করাতে মহাদেব বলিয়াছে, আমি তোর গুরু বটী! আমার সহিত যুদ্ধ যুক্ত নহে। তোর রথধ্বজ জে দিবস ভঙ্গ হবে ঐ দিন হৈতে কিয়ৎ কালান্তরে আমার সদৃশ কোন তিন পুরুষ তোর গৃহাগত হইয়া তোর সহিত যুদ্ধ করিয়া দর্প নষ্ট করিবেক। কত দিনান্তরে উষাকালে এক কন্যা জন্ম হয়। সেই সময় দৈত্যপতির রথধ্বজ মহাশব্দে ভঙ্গ হৈয়াছে। রথের রক্ষক রাজার কাছে গোচর করিয়াছেন কন্যা জন্ম তাহাও গোচর হইল। রাজা (৩০) কন্যার উষাকালে জন্ম হেতু উষা নামকরন করিয়াছেন। ঐ সময় ধাতৃ বলিল কন্যা জন্ম কালে রথধ্বজ ভঙ্গ হৈয়াছে। অমঙ্গল কারনিয় ইহাকে জলে নিক্ষেপন করি।

ঐ সময় কন্যার মুখপঙ্কজ দর্শন করিলেন। পরম সুন্দরী সুনাশা তপ্ত স্বর্নবর্নী লক্ষণযুক্তা এমত দর্শন করিয়া বলিল একন্যা ত্যাগযুক্ত নহে। রথধ্বজ ভঙ্গ হইল যুদ্ধ হবে। অন্য কোন হবে না। ধাতৃ কন্যাকে পালন করিয়াছে বিবাহ কাল হইলে পরে একদিবস সখির সহিত শিব পার্ব্বতীর ক্রুড়া স্থানে উপগত হৈয়া মহাদেব মহাদেবীকে কেশব কেশবী অবস্থায় একাশনে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল। রাজকন্যা শিব পার্ব্বতীর একাশন দর্শন করিয়া কিশব পুরুষ সহিত একাশন হইতে মনে কল্পনা করিয়াছেন। এই অন্তবাসয় জ্ঞাত হইয়া ভগবতী মনে বিচার করিল জে দ্বারিকা নিবাসী কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ এ কন্যার পতি হইতে যুক্ত। এমত আলোচনা করিয়া পরিচারিকা কামসেনা প্রতি আজ্ঞা করিল তুমি অনিরুদ্ধ রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নে উষা কন্যা সহিত সন্ধান কর। উষা কন্যা রূপে অনিরুদ্ধ সহিত সন্ধান কর। এমত আজ্ঞা মতে স্বপ্নে উভয়ের সন্ধান হওনে পরস্পর পাগল পাগলিনী প্রায় হৈয়াছে। পরে কুম্ভণ্ড মন্ত্রী কন্যা চিত্র কর্ম্মে বিজ্ঞ হেতু চিত্র রেখী নাম খ্যাত। তাহার সহিত রাজপুত্রী মহাপ্রিত নির্জন স্থানে স্বপ্ন দর্শন পুরুষের কথা বলাতে তিনলোক যেখানে যে আছে তাহা পটে লিখিয়া দেওনে দ্বারিকা নগরে মাধবের পৌত্র অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া বলিয়াছে এই পুরুষে স্বপ্নে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন। এ পুরুষ না হইলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। এমত বাক্য শ্রবণে চিত্র রেখী দিব্য বিমানারোহনে গমন করিল। দ্বারিকা সন্নিধানে সমুদ্র তীরে সৃষ্টীকর্ত্তা কমলাসনের পুত্র নারদ নামে দেবঋশী হইতে নিদ্রাচ্ছন্ন করা মন্ত্র প্রাপ্ত হৈয়া দ্বারিকা নিবাসী সকলেক নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া অনিরুদ্ধ কুমারেক তাহার পিতার ক্রোড় হইতে হরণ করিয়া আকাশ পথে সুনীতপুর প্রবেশ হইল। উষা কন্যা সহিত গন্ধর্ব্ব বিধা বিবাহ দিয়াছে। তদবধি নিদ্রা প্রদান করিয়া চোরে চুরি করে মহাসুখে মহাকৌতুকে একাশনে পাশা খেলিতে ধাতৃ দর্শন করিয়া রাজার গোচর করিয়াছিল। পরে বান দৈত্যেন্দ্র মহাকোপে কুমারকে নাগপাশ দ্বারায় বন্ধন করিয়া বন্ধিসালে রাখাতে দেবঋশী জ্ঞাত হইয়া পৌত্র বিরহি উদ্বিগ্নযুক্ত কৃষ্ণ প্রতি বলিয়াছে হে পুরুষত্তম (৩১। কৃষ্ণ তোমার পৌত্র অনিরুদ্ধকে চিত্ররেখী হরণ করিয়া সুনীতপুরে বসি দৈত্যেন্দ্র পৌতৃ উষা সহিত রাজার গোচরে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ দিয়াছে। গৃহে কন্যা সহিত পাশা খেলাইতে ধাতৃ দর্শন করিয়া রাজার নিকট গোচর করাতে বান মহাক্রোধে কুমারেক ধরার কারণ অক্ষহিনী সেনা প্রেড়ন করিলে পর এক পরিখ দ্বারায় তাবৎ সৈন্যেক পরস্থ করিল। দূতে রাজাতে তত্ত দিয়াছেন মহারাজ কুমার সুঠান মহাভুজ বলিয়ার আমরা ধরিতে ক্ষমতাহীন হইলাম। এমত শ্রবণ করিয়া সেনাধক্ষ সকলের প্রতি কুমারেক ধরিতে আজ্ঞা করিল। আজ্ঞামাত্রে সৈন্য সকল যুদ্ধভূমী মধ্যে প্রবেশ হইলেন। কুমার ঐ পরিখ দ্বারায় তাবৎ সৈন্যেক নির্জাতন করিয়াছে। এমত তত্ত্ব পাইয়া বান রথারুড়ে কুমারের সহিত যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মনাগপাশ দ্বারায় বন্ধিসালে রাখিয়াছেন। এমত তত্তাবধানে রামকৃষ্ণ কাম গরুড়ারুড়ে সুনীতপুর গমনে বানের সেনাপতি জ্বরাসুর সহিত যুদ্ধ সমাগমে বান জ্বরাসুর পরস্থ হইল। এই জ্বরাসুরের বাটীতে বিরূপাক্ষ নাম মহাদেব আছে।

তাহারে ছাট স্বনীতপুর বলে। পরে দেব সেনাপতি কার্ত্তিক সহিত কামসম যুদ্ধ করিলে ভগবতি আত্মতনয়েক লইয়া নিজপুরি গমন করিয়াছে। পরে স্বয়ং মহাদেব ভক্তানুগ্রহে প্রমথ গনাবৃত হৈয়া গোবিন্দ সহিত বিপরিত যুদ্ধ হওাতে পৃথিবী মহাক্লেষে যাহার বপু পলাশ কুসুম প্রায় প্রভাযুক্ত শনক শোনাতন প্রভৃতি মহাজ্ঞানি উদ্ধরেতা সকলেক সৃষ্টি করিয়া মরিচ্চাদি প্রজাপতি সকলেক সৃষ্টি করিয়াছিল। সাবিত্রি গর্ব্ভে চতুর্ব্বেদ ও পুরাণ ছএ রাগ ছত্তিশ রাগিনী নানা মত তাল চতুর্যুগ কাল, মৃত্যু, কন্যা, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা, প্রাতঃকাল, শষ্টী, দেব, সেনা, মেধা, বিজয়া, কিত্তিকা সহিত ষষ্ঠ কন্যা সৃষ্টি করিয়া একদায় স্তন পান করায়া ছিল। খেচর ভূচর জলচর স্থাবর সৃষ্টি করিয়াছিল। দুর্নিবার ব্যাধি সকলের নিবারন হেতু খেচর, ভূচর, জলচর, স্থাবর এহি সকলেত ঔশধ সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষ রমণি সকলের অবয়ব ভিন্ন ২ রূপে সৃষ্টি করিয়া চতুক্রোশ যুক্ত জোজন ভাষা দেশ সন্ধি স্থলে দ্বির্ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। পিতৃ সকলের পিতা হৈয়া পিতামহ নাম খ্যাত করিয়াছেন। (৩২) সেই সৃষ্টিকতৃ সাবিত্রিদেবা সহিত তাহার পাদপদ্মে শতকোটী বার প্রণাম করি। তাহার কাছে ক্লেশ মোচন বিষয় প্রার্থনা করিলে পর ইন্দ্রাদি সুর সকল সহিত যুদ্ধভূমি মধ্যে গমন করিয়া শিববিষ্ণু স্তবনে স্তব করাতে হরিহর একমূর্ত্তি হৈয়াছে। যেখানে এই মুর্ত্তি হইল ঐ স্থানের নাম হরিহরপুর। হরিহর নামক লিঙ্গরূপে আছে। তাহাকে নাল নামক এক বাই প্রকাশ করে। অপর নাল রাজার বন্দর করে স্বনীতপুর প্রবেশ কালে যেখানে গোপাল বিশ্রাম করিছিল ঐ স্থানের নাম গোপালপুর। তাহাতে গোপাল অর্চ্চন হইতেছে। পরে বানের সহস্র ভুজ মধ্যে চারিভুজ রাখিয়া বনস্পতি শাখা প্রায় আর ভুজ সকল ছেদন করাতে শ্রীহরির বানবাহুবনানল নাম খ্যাত হইলেন। পরে মহাদেব ভক্তানুরোধে যুদ্ধ ভুমী মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পুট হস্তে গোবিন্দ প্রতি বলিয়াছে, হে গোবিন্দ, এই বান আমার মহাভক্ত তোমার পরম ভক্ত বলি। তাহার সন্তান ইহার প্রাণে রক্ষা করা যুক্ত। হর বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি বলিয়াছে পূর্ব্বকালে নরসিংহ রূপে প্রহ্লাদ ভক্ত প্রতি বর প্রদান করিয়াছি। তাহার বংশ হন্তারক হইব না। এ কারণ ইহার প্রাণে বধ না করিয়া সজীবে রাখিলাম। বাহুদর্পে দর্পিষ্ট হৈয়া তোমার সহিত যুদ্ধ ইৎসা করিয়াছে। একারণ বাহু সকল চ্ছেদ করিয়াছি। কেশবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযোগে মহাজ্ঞানে চিত্ত নিযুক্তপূর্ব্বক মহা পুরানুক্ত শিব বিষ্ণু স্তবনে স্তব করিয়া পাদপদ্মে প্রণাম করিয়াছে। উষা অনিরুদ্ধ উভয়েক দেবতা সমাজে আনাইয়া বিবাহ দিয়াছেন। ঐ স্থানের নাম বৈকুণ্ঠপুর। তাহাতে বৈকুণ্ঠনাথ নাম ঠাকুর। তাহার মেধি পরিচারক আছে। পরে বান দৈত্যপতি রাজ্যধন (৩৩) কুম্ভাণ্ড মন্ত্রিতে অর্পন করিয়া মহাদেব সহিত কৈলাস গমন করিয়া মহাদেব সন্নিধানে প্রমথাধিপ হৈয়াছেন। রামকৃষ্ণ কাম উষা অনিরুদ্ধ গরুড়াড়ূরে দ্বরিকাপুরি গমন করিয়াছে। অতএব শিব বিষ্ণু যেখানে বাস করে তাহার পরম ভক্ত প্রহলাদ পৌত্র প্রপৌত্র সহিত তথায় বাস করেন। স্বনীতপুর এহিক্ষণ ভোটের দখল আছে। কেহ কেহ সোনাপুর বলিয়া কয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাহার পুত্র মরিচি, তাহার পুত্র কাশ্যপ, তাহার পুত্র হিরণ্য-

কশিপু প্রভৃতি তিন ভ্রাতা কশ্যপুরাজা। তাহার পুত্র প্রহ্লাদ প্রভৃতি পাচ ভ্রাতা। প্রহলাদ রাজা তাহার পুত্র বিরোচন প্রভৃতি তিন ভ্রাতা। বিরোচন রাজা তাহার পুত্র যজ্ঞশালী বলি মহারাজ চক্রবর্ত্তি। তাহার পুত্র বান প্রভৃতি শত ভ্রাতা। বান রাজা বান পুত্রি উষাকন্যা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পৌত্রবনিতা মহারাজা শিবেন্দ্র সন্তান শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ পূর্ব্ব জন্ম তপস্যা বলে তাহার রাজ্যে সুবৃষ্টি হইয়া বিবিধ শস্য সম্পূর্ণ মহীপ্রজা সকল ভোজনে পুষ্টতা হৈয়া মহারণ্য ভুজবলে নষ্ট করিয়া নানা শস্য উপার্জ্জন করিতেছে। অনুক্রম মহারাজ সকলের যশস্যা কির্ত্তি সহিত বলিলাম। বিশ্বসিংহ হৈতে সিংহখ্যাত। কুঙর মল্লনারায়ণ হৈতে নারায়ণ খ্যাত। কুঙর শুক্লধ্বজ হৈতে দেবখ্যাত কুঙর। ইহার মধ্যে স্বেন পাখি প্রায় পরাক্রমি যে সকল কুঙর তাহার স্বোন খ্যাত। রাজপুত্র, রাজ ভ্রাতা, রাজপুত্রি, রাজভ্রাতা পুত্রি, সকলের বংশ দ্বাপর যুগে হরিবংশের প্রায় প্রাদুর্ভাব পাইতেছে। যথার্থ মহাদেব সন্তান মহাদেবের মহাচিহ্ন মস্তকে চন্দ্র ও গঙ্গা এমতে চন্দ্রচুড় গঙ্গাধর নাম ইতিহাস মধ্যে প্রকাশ থাকিল। মহারাজ চক্রবর্ত্তি শ্রীশ্রীহরেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বধু শ্রীশ্রীকামেশ্বরী কমতেশ্বরী খ্যাতা শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রাজমাতা আজ্ঞানুসারে হরবংশ "মহারাজ বংশাবলি" গাথা হইল। মহারাজদিগের পিতা পুত্রের কাশী গমনের বিস্তারিত ভাষা বন্দে সাণ্ডেশ্বর[1] নিবাসী শ্রীবংশী নাথ দ্বিজ কৃত শনিত্যাগমৃত গন্থে[2] পরভাগে জ্ঞাত হইবেন। মহারাজদ্বিগের আহ্নিক রাজত্ব পারত্রিকে দেবরাজ্যে মন্নন্তরা পরিমানে রাজত্বান্তে মোক্ষ তাহার প্রমান বড় কায়স্থ কুলভব শ্রীহরি স্মরণাৎ শ্রীরিপুঞ্জয় দাস ও গোবরা (ছড়া) (৩৪) ....বিদ্যারত্ন সহসগ্রহ হইল। রামায়ণ পুরাণ ভারত ভাগবত শ্রবণ করিলে জে ফল প্রাপ্ত হয় এই ... ...(৩৫)

সমাপ্ত।

১। তুফানগঞ্জ নাককাটীগাছে অবস্থিত। এখানে সাণ্ডেশ্বর শিব মন্দির অবস্থিত

২। গ্রন্থে।

জেনকিন্সের প্রতিবেদনে কোচবিহার

লেখক—মেজর ফ্রান্সিস জেনকিন্স

অনুবাদক—ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল

মেজর ফ্রান্সিস জেনকিন্স

(উত্তর-পূর্ব সীমান্তের গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট)-এর

কোচবিহার সম্পর্কে প্রতিবেদনের সারাংশ

তারিখ ২৫ এপ্রিল, ১৮৪৯

ক্রমিক নং ৯—

প্রধান বিভাগ এবং আদালতগুলোর নিম্নবর্ণিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা গেল। আমি এগুলির বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে মতামত ব্যক্ত করছি এবং বিভিন্ন নথিপত্র পরীক্ষা করে ও অন্যান্য সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন অফিসের কার্যাবলী তুলে ধরছি।

বিচার বিভাগীয় আধিকারিকগণ

ফৌজদারী বিচারালয়—ফৌজদারী—বাবু গুরুচরণ রায় (আহিলকার)
বাবু রামধন মজুমদার (নায়েব-আহিলকার)

আপিল আদালত—কলীন্দ্রনারায়ণ কুঙর

দেওয়ানী বিচারালয়—সদর আমিন—বাবু কালীকান্ত কান্ত মজুমদার
দেওয়ানী বিচারক—বাবু কাশীকান্ত লাহিড়ী (আহিলকার)
আপীল আদালত—বীরেন্দ্রনারায়ণ কুঙর

রাজস্ব আদায় বিভাগ—খালিসা মহল—দেওয়ানের অধীন
খান্‌গী—গুরুচরণের উপর ন্যস্ত হলেও দেওয়ানী আদালতে পাঠানো যাবে।

ক্রমিক নং ১০—

ফৌজদারী আহিলকার যিনি সাধারণভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত, তিনি অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত প্রদেশের ন্যায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিচালনা করেন এবং পুলিশের কার্যাদির তদারকি করেন। নিম্নলিখিত আনুপূর্বিক বর্ণনায় দেখা যাবে ১২৫৫ বঙ্গাব্দে এই আধিকারিকের আদালতে কত মামলা বিচারের জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল। বিরাট অংকের বকেয়া মামলার এক তালিকা নিয়ে ঐ বৎসরের আরম্ভ। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐগুলোর অধিকাংশই তাঁর পূর্বসূরির বকেয়া মামলা।

ম্যাজিস্ট্রেট-এর কোর্ট

বকেয়া মামলা	ঘৃন্য-অপরাধ		সাধারণ অপরাধ		মোট
১২৫৪ বঙ্গাব্দতে রুজুকৃত—	৭১	+	১২৭৯	=	১৩৫০
১২৫৫ বঙ্গাব্দতে নিষ্পত্তি—	১১৪	+	৯৩৩	=	১০৪৭
১২৫৫ বঙ্গাব্দতে—	১১৪	+	১৪৮৮	=	১৬০২
বকেয়া—	৭১	+	৭২৬	=	৭৯৭

বকেয়া মামলাগুলোর সংখ্যা যথাক্রমে ১২৫১ বঙ্গাব্দে ১২টি, ১২৫২ বঙ্গাব্দে ৪৯টি এবং ১২৫৩ বঙ্গাব্দে ৭৫টি, যার মধ্যে ৪টি ঘৃণ্য অপরাধ ঘটিত। ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ১৭৬টি এবং ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ৪৮৩টি মামলাও বকেয়া আছে।

অফিসের বহি ও নথি পত্রাদি পরীক্ষা করে অনুমান করা যায় যে মামলা পরিচালনা প্রায় ত্রুটিহীন ছিল। আমাদের প্রদেশগুলোতে যেরূপ প্রণালী তদ্রুপ প্রায় সমভাবে এখানকার মামলাগুলো পরিচালিত হয়, এবং ঐ আমলাদের যোগ্যতা যে কোন স্থানের সম আদালতের বিচারকদের চেয়ে নিম্নমানের ছিল না। কিন্তু বিচারালয়ের দুর্নীতির সম্বন্ধে সাধারণভাবে অভিযোগ আছে এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বিষয়টি স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ পীড়াদায়ক।

এরূপ অবস্থার প্রধান কারণ হচ্ছে বিচারকদের স্বল্প বেতন এবং বেতন প্রদানের অনিয়মিত প্রণালী। আমি মুখ্য আধিকারিকরে বেতনের একটা তালিকা নীচে যুক্ত করলাম। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে তাঁদের বেতন নারায়ণী মুদ্রায় প্রদান করা হতো। আমার মনে হয় যে এই বেতন হার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের পরিপন্থী। অবস্থা বিশ্লেষণ করে আমি সিদ্ধান্তে আসি যে, তাদের আয়ের অন্য উৎস ছিল।

আহিলকার—১০০	নারায়ণী টাকা
সেরেস্তাদার—২৫	"
পেসকার—১৫	"
রুবকার নবিশ—১৪	"
মহাফেজ—১২	"
নাজির—১০	"
ট্রেজারার—৮	"
মুহুরীরা— ৫ থেকে ১০	"

অফিসের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নির্বাহ হতো বিভিন্ন মামলায় জরিমানা এবং মুচলেকা ইত্যাদির মাধ্যমে আয় দ্বারা। স্ট্যাম্পের পরিবর্তে ফি হিসেবে এই অর্থ সংগৃহীত হতো। এই সব বিভিন্ন হিসেব থেকে গত বছর নারায়ণী মুদ্রায় আয় হয়েছিল ১০,১৬৯ টাকা ৬ আনা ১৯ পাই এবং এর সবটাই ব্যয় হয়েছিল আহিলকারের নিজস্ব বিচারালয় সংস্থার কর্মীদের বেতন বাবদ।

ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধীদের অবাধে জামিনে মুক্তি দেওয়া, দায়রা মামলাগুলো উচ্চতর আদালতে পাঠানোর আগে ৭-৮ মাস বিলম্ব এবং ক্রোক করা সম্পত্তি বছরের পর বছর নাজিরের হাতে ফেলে রাখা এই সব মুখ্য অনিয়মগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

জেলখানায় বন্দীর সংখ্যা ছিল ৪৮ জন, তার মধ্যে ৫ জন ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত আর বাকী ৪৩ জন ছিল বিভিন্ন মেয়াদের এবং একজন জামিনে মুক্ত ছিল। বছরের শেষে ৪২ জন ছিল বিচারাধীন, তার মধ্যে ২২ জন জামিনে মুক্ত ছিল অথবা নাজিরের নজরদারিতে ছিল।

আমার কাছে এই আদালতের বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি আবেদন পেশ করা হয়েছিল, সাধারণভাবে লিখিত কার্য-বিবরণী পরীক্ষান্তে মনে হয়েছে যে আমার হস্তক্ষেপ করার মত সামান্য কারণই আছে।

উচ্চ আদালত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন না। উচ্চ আদালত জঘণ্য অপরাধে অপরাধীদের বিষয়ে নিয়মিত তথ্যাদি পান এবং কখনও কখনও ম্যাজিস্ট্রেটদের এই সমস্ত অপরাধীদের বিষয়ে সাময়িক নির্দেশাদি দেন, এ ছাড়া আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ তারা করেন না।

নীচে লেখানুসারে ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ৭টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আছে। এই পুলিশ থানা ও ফাঁড়িগুলোর পরিচালন কাজ আমাদের প্রদেশগুলোর ন্যায়। কাগজ-পত্র রাখার পদ্ধতিও একই ধরনের। এর মধ্যে আমি দিনহাটা থানার কাগজ-পত্র বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেছি। আমার পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত সেখানকার কাগজ-পত্র সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত ছিল।

পুলিশ—১। সদর অথবা কোতয়াল
২। দিনহাটা
৩। মেঘলীগঞ্জ
৪। গীলাডাঙ্গা
৫। ভবানীগঞ্জ
৬। ফাঁড়ি সাঁ গঞ্জ
৭। চক্রবন্দী।

কোতয়ালের বেতন ছিল ৮ নারায়ণী মুদ্রা, অন্যান্য দারোগাদের বেতন ছিল ১০ নারায়ণী মুদ্রা, মুহুরীর ৫ নারায়ণী মুদ্রা, জমাদারদের ৪ নারায়ণী মুদ্রা আর বরকন্দাজ পায় ৩ নারায়ণী মুদ্রা। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে থানা কর্মচারীদের বেতন কম ছিল এবং এ কথা বলতে আমি দুঃখিত, আমি দেখেছি বেতন ছিল নামমাত্র। এই সংস্থার অধিকাংশ ব্যক্তিই কখনই পুরো বেতন পায় না, কেউ কেউ আবার বছরের পর বছর কিছুই পায় নি। আহিলকারের কাছে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে আমি জেনেছি যে, যে পরিমাণ টাকা তিনি পেতেন, সেটাই যতদূর পর্যন্ত দেয়া সম্ভব তিনি কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং আমি পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, কোর্ট থেকে যে আয় হতো সেটা তার নিজ আদালত পরিচালনাতেই ব্যয় হয়ে যেত।

অবশ্য পুলিশ বিভাগে নিয়মবহির্ভূত পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান আছে, যা তাদের জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট, তথাপি এ বিষয়ে বলা যায় যে, রাজার সকল আধিকারিকদের ন্যায় সরবরেকার থেকে নীচু তলার কর্মচারী পিওন পর্যন্ত, তাদের অন্ন এবং বিধি-সম্মত ভরণ-পোষণের আর্থিক সংস্থান আছে, যেমন কৃষিকাজের জন্য পত্তনী জমি এবং অফিসে কাজ করলে সহজ শর্তে পত্তনী জমি সংগ্রহের সুযোগ পাওয়া যাবে, তারা এই আশা পোষণ করত।

ক্রমিক নং-১১—

সহ-শাসকের ক্ষমতানুসারে নায়েব আহিলকার রামধুন মজুমদার নগণ্য অপরাধগুলো বিচার করতেন। তিনি এক বছর ধরে এই কাজ করছেন। তথাপি আজ পর্যন্ত তাঁর বেতন নির্ধারিত হয় নি। উল্লেখ্য তিনি গোপাল মোহনের পুত্র, এবং তাঁর উপস্থিতি এবং তাঁর সম্পর্কে আমি যতটুকু জেনেছি তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমার সন্তোষজনক ধারণা হয়েছে। নিম্নে তাঁর বিচারালয়ের কাজের তথ্যাদি তুলে ধরা হলো।

১২৫৪ বঙ্গাব্দের বকেয়া মামলা—২৭৭
বর্তমান—৪০০
৬৭৭
নিস্পত্তি—৩৩০
বকেয়া—৩৪৭

ক্রমিক নং ১২—

দায়রা আদালতের বিচারপতি কলীন্দ্রনারায়ণ কুঙর সরবরেকারের দ্বিতীয় পুত্র এবং রাজার ভাই। এই আদালতের বিচারক হিসেবে তাঁর কোন বিশেষ বেতন নির্দিষ্ট হয় নি। তিনি একজন যুবক (বয়স ২০ বছরের উর্ধে নয়) তাঁকে দেখে একজন বিশেষ কর্ম-দক্ষতা সম্পন্ন যুবক বলে মনে হয়।

১২৫৪ বঙ্গাব্দের ৬ মাসের বকেয়া মামলা—৩৫
রুজুকৃত—৫
৪০
নিস্পত্তি—২
বকেয়া—৩৮

১২৫৫ বঙ্গাব্দে তাঁর আদালতের কাজকর্মের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

অমীমাংসিত মামলার তালিকা—১—৫ বছর
১—৪ বছর
৩—৩ বছর
৫—২ বছর
২৮—১ বছর

ক্রমিক নং ১৩—

সবশেষে রাজসভাই হলো সর্বোচ্চ বিচারালয়। এই বিচারালয়ে রাজা অথবা সরবরেকার নামেমাত্র সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁদের সাহায্য করেন দেওয়ান ঈশান-চন্দ্র। পরপৃষ্ঠায় তালিকার মাধ্যমে বিচারালয়ের কার্য পরিচালনার চিত্র তুলে ধরা হলো।

১২৫৪ বঙ্গাব্দের বকেয়া আপিল—২৭
১২৫৫ বঙ্গাব্দে রুজুকৃত— ১

২৮
নিষ্পত্তি—৬
মুলতুবি—২২

ক্রমিক নং ১৪—

দেওয়ানী আহিলকার কাশীকান্ত লাহিড়ী দেওয়ানের আত্মীয়। তিনি একজন বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর বিচারালয়ের দায়িত্বাদি সুখ্যাতির সংগে তিনি পালন করেন। নীচের সংক্ষিপ্তসার এই বিচারালয়ের কাজকর্মের অবস্থা নির্দেশ করবে।

দেওয়ানী আদালত—পুরনো মামলা— ৮৮
১২৫৪ বঙ্গাব্দে রুজু করা—২৬৩

৩৫১
নিষ্পত্তিকৃত বা বাতিল—১০৪

২৪৭

স্ট্যাম্পের পরিবর্তে মামলা রুজু করার ফি এবং আবেদনের উপর ফি ইত্যাদি আমাদের প্রদেশগুলোর স্ট্যাম্পের আনুমানিক সমহারে এখানে আদায় করা হয়। ১২৫৫ বঙ্গাব্দে এই খাতে ৭৩২৫ টাকা ১১ আনা ৮ পাই নারায়ণী মুদ্রায় সংগৃহীত এবং এই সংস্থার কর্মীদের বেতন প্রদানে সমপরিমাণ বা কাছাকাছি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৫৭টি মামলা সদর আমিনের কাছে পাঠানো হয়। ৯ জন দেওয়ানী বন্দী আসামীর মধ্যে ১ জন ১২৫২ এবং ৮ জন ১২৫৫ বঙ্গাব্দের।

১২৫৪ বঙ্গাব্দের বকেয়া ডিক্রী
এবং ১২৫৫ বঙ্গাব্দের নতুন ডিক্রী—৬৬
জারীকৃত—২৬
মুলতুবী—৪০

আমাদের দেওয়ানী বিচারালয়গুলোর এবং এই বিচারালয়ের প্রথাগত একটি পার্থক্য আমি লক্ষ্য করেছি যে নালিশের অব্যবহিত পরেই বিবাদী পক্ষের নিকট জামিন দাবী করা হয় এবং যদি তিনি তা দিতে না পারেন, তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রেপ্তার অবস্থায় নিজের ভরণ-পোষণ নিজেকেই চালাতে হয়।

এই পদ্ধতি নতুন নয়। বরং দেখা যাচ্ছে এটা কোচবিহারে বরাবরই প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখান হয় যে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ অধিকাংশই বিদেশী। ভুটান ও রংপুর সীমান্ত এলাকা খুব কাছে থাকায় কোন মামলা দায়ের হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাদের গ্রেপ্তার করা না হলে, তাদের পালিয়ে যাওয়া রোধ করা অসম্ভব।

ক্রমিক নং ১৫—

আপিল কোর্ট—আপিল আদালত সরবরেকারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।...

সরবরেকার পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে, তাঁর পুত্রদের নিয়ন্ত্রণাধীন আদালতগুলোতে একজন করে প্রধান আধিকারিক যুক্ত থাকতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা অভিজ্ঞ না হয়ে উঠছে। কিন্তু আমি এখনও জানি না যে, এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। মনে হয় এই তরুণ কুঙর বীরেন্দ্রনারায়ণ ব্যবহারে সাদাসিধে, দৃঢ়চেতা এবং মেধাহীন নয়। তাঁর নিযুক্তি সম্পর্কে একমাত্র আপত্তি তাঁর সার্বিক অনভিজ্ঞতা।

নথিপত্রের অবস্থা—পুরনো মামলা—৩৯
নতুনভাবে রুজুকৃত মামলা—২৪
৬৩

একটিও নিষ্পত্তি হয় নি। সবই বিচারাধীন।

কোচবিহারের রাজস্ব ব্যবস্থা

ক্রমিক নং ১৬—

কোচবিহারের ভূমি রাজস্ব আদায় করা হয় অনেকগুলো বিচারালয়ের তত্ত্বাবধায়ক চারজন ভিন্ন আধিকারিকের মাধ্যমে। করারোপণ পদ্ধতি এবং পরিচালন এত জটিল এবং বিভ্রান্তিকর যেটা অনেকদিন পূর্বেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল; মিঃ পারলীং ১৭৮০ খৃঃ প্রথমেই আবওয়াব এবং অতিরিক্ত উপকর লোপ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৭৯০ খৃঃ প্রারম্ভেই জোর করে নজর ও সেলামী আদায় নিষিদ্ধ করার নির্দেশ কমিশনারকে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; এবং পুনরায় ১৮১৪ খৃঃ খাল্‌সা এবং খান্‌গী জমির মধ্যে পার্থক্য লোপের আদেশ দেয়া হয়; কিন্তু রাজার সাবালকত্বে এবং তাঁর রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পর পূর্বের বোঝাগুলো পুনরায় বলবৎ করা হয় এবং অধিকন্তু খাল্‌সা খান্‌গী মহালের পুরনো পার্থক্য নবীকরণ করা হয় এবং তখন থেকেই চালু রয়েছে। জমি পরিচালনার এই রীতি নিঃসন্দেহে কোচবিহারে কৃষির উন্নয়ন বিলম্বিত করেছে। রায়তদের উপর অনিশ্চিত পাওনার দাবী এবং পক্ষান্তরে রাজার কোষাগারে এর হানিকর প্রভাব অবশ্যই পড়ছে; ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের জটিল পদ্ধতির লক্ষ্য, মনে হয়, অন্যায়ভাবে তহবিল তসরূপ করা ও অবৈধ আয় গোপন করা এবং খাজনা আদায়কারীর একটি বৃহৎ দল নিয়োগ করা।

মাল কাছারী

ক্রমিক নং ১৭—

খাল্‌সা জমির রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল দেওয়ানের উপর এবং যে খাতে রাজস্ব আদায় হতো তাকে বলা হতো খাস জমা; এই বিভাগের মোট রাজস্বের $\frac{1}{3}$ অংশ আদায় হতো আর বাকী ১০টি অধীনস্থ খাতে বাকী $\frac{1}{3}$ এর সামান্য কিছু কম আদায় হতো। খাল্‌সা জমির প্রায় সব অংশই ইজারা দেয়া হতো। কিন্তু এই পত্তন ছাড়াও

আরও ছয় ভাবে ভাগ করা হতো। এই ভাগগুলো স্থানীয় কোন নিরিখের উপর নির্ভর করতো না। (আমরা যখন এই রাজ্যের সংস্পর্শে আসি তখন এটি জিলা এবং অন্যান্য স্থানীয় নিরিখে ভাগ করা ছিল। এখন এইসব ভাগের অস্তিত্ব নেই।) এই ভাগ নির্ভর করতো কতকগুলো আগন্তুক কারণের উপর। এই রকম একটি কারণ "বিশিনা"—যাতে জমিতে আখ, সরিষা জাতীয় মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হলে একটি বিশেষ কর ধার্য হতো।

ক্রমিক নং ১৮—

আমি এখানে দেওয়ানের কাছ থেকে পাওয়া একটি নিয়মাবলী, যা দ্বারা এই বিভাগের জমি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো, সেটা এখানে তুলে ধরবো। এর মূল শর্ত অনধিক পাঁচ বছরের শর্তে ইজারায় সকল জমিতে কৃষিকাজ করা। যাঁরা এই ইজারা গ্রহণ করতেন তাঁরা সাধারণতঃ রাজ্যের আধিকারিকবৃন্দ, রানী বা রাজার আত্মীয়স্বজন। এই ইজারাগুলো সাধারণতঃ তাঁদের পোষ্যগণ বা ভৃত্যগণ গ্রহণ করতো, যাদের জন্য তাঁরা জামিন থাকতেন। প্রথম শ্রেণীর ইজারাদারগণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই জমি উপ-ইজারা দিতেন এবং এই বিনিময়ে তাদের লাভ হতো। দ্বিতীয় ইজারাদার পুনরায় ইজারা দিতেন। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে এই ব্যবস্থা আমার ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের নির্দেশানুযায়ী রদ করা হয়েছে, কারণ যেই ব্যবস্থায় অত্যাচার খুব বেশী হত এবং অশান্তি ও ঝামেলা দেখা দিত, সে কারণে সেই ব্যবস্থা আর পুনঃ প্রবর্তন করা হয় নি।

ক্রমিক নং ১৯—

স্বর্গীয় রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ রানীদের এবং কুঙরদের প্রচলিত ইজারা বা পত্তনীর ধারা থেকে অব্যাহতি দেন ; এবং তাঁদের পত্তনীগুলো প্রতি পাঁচ বছরে তিন শতাংশ বর্ধিত করে নবীকরণ যোগ্য হয় এবং এই ব্যবস্থা খুবই অনুমোদনযোগ্য মনে হয়। এই সুবিধা সকল ইজারাদারদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হোক। আমি অনুমান করছি, কৃষিকার্যে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির ইহা সহায়ক হবে এবং পরিণতিতে রায়তদের উপকার হবে।

ক্রমিক নং ২০—

এই ইজারাগুলির পরিধি খুবই অসমান ছিল। এক বা একাধিক মৌজা এর অন্তর্গত ছিল। মৌজাগুলো বহু সংখ্যক জোতে পুনরায় বিভক্ত, অধিকন্তু অসমান আকৃতির। কার্যতঃ এই ইজারাগুলো সাধারণতঃ একই হাতে থাকে এবং জোতদারগণ ও রায়তগণ উপযুক্ত সীমা নির্দেশিত পাট্টায় জমির স্থায়ী অধিকারী। আমি বিভিন্ন জোতদারদের কাছ থেকে হয় তাদের আত্মীয় এবং জমির অংশীদারদের বিরোধের পরিণতিতে নয়তো ইজারাদারদের জবর-দখলের কারণে অনেক নালিশ পেয়েছি। এই নালিশ মূলতঃ বকেয়ার জন্য ক্রোক থেকে উদ্ভূত, এবং মনে হয় যে অভিযোগে বর্ণিত বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য অতিমাত্রায় স্বৈরাচার অনুমোদিত হয়।

ক্রমিক নং ২১—

নিম্নতর শ্রেণীর রায়তদের একজনও একটা নালিশও আমার কাছে করেছে এরূপ নজির নেই, যদিও আমি ঐ দেশের বহু জায়গায় ঘুরে দেখেছি ; এবং সর্বত্রই রায়তদের

যে কোন নালিশ দায়ের করার সুযোগ ছিল। বাস্তবিক পক্ষে মনে হয় যে, ইজারার এই ব্যবস্থা ভাল ভাবেই চলে, বিশেষতঃ রায়তদের জন্য, যাঁরা এতদনুসারে প্রভাবশালী ইজারাদারদের সার্থক সমর্থন পান; এবং এই সমর্থনের ক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত যে বিচারালয়ের পরোয়ানাও বৃহত্তর ইজারাগুলিতে কার্যকর করা যায় না এবং এগুলি কার্যকর করার মতো উৎসাহশীল সরকারী অধিকর্তারও অভাব। একটি ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যেখানে একজন দারোগা রাজার কোন চোবদারের জোতে একজন লোককে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। এই সব নিরাপদ আশ্রয় সত্ত্বেও রায়তরা আমাদের প্রদেশের রায়তদের মতো স্বাচ্ছন্দে ছিলেন না। কারণ তাঁরা ইজারাদারদের উপর সর্ব ক্ষেত্রে নির্ভরশীল ছিলেন, এই ইজারাদার এবং জোতদারদের মাঝে মধ্যেই পরিবর্তন হতো, সে জন্য তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা কোন প্রতিকার পেতেন না। প্রায় ক্ষেত্রেই রায়তরা ব্যাপকভাবে কৃষি কাজ করলেও তাঁদের গরীব করেই রাখা হতো, কারণ অর্থ-করী ফসলের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়। এসব কারণে তাঁরা সাধারণতঃ কম দামের শস্য যেমন ধান, দানা শস্য এবং নিম্নমানের গম চাষে নিযুক্ত থাকে।

ক্রমিক নং ২২—

দেওয়ানের অধীনে ভূমি রাজস্বের আর একটা বিভাগ দেওয়ান-বস। এই দেওয়ান-বসে প্রধানতঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষি কাজের উপযুক্ত করে তোলা পতিত জমি। এই শ্রেণীর জমিতে আবাদী এবং তৎসংলগ্ন অনাবাদী জমি অন্তর্ভুক্ত হতো। যদিও এই প্রকারের জমির আয়তন সামান্য নয় মনে হয়, তবে মহারাজার কোষাগারে এই উৎস থেকে রাজস্ব সামান্য পরিমাণই জমা পড়ে।

খানগী মহল

ক্রমিক নং ২৩—

এই বিভাগ তিনটি অফিসে বিভক্ত; যার মুখ্যটি বাবু গুরুচরণ রায়ের অধীনে, যিনি অধিকন্তু ফৌজদারী বিচারালয়ের আহিলকার। দেওয়ানের হাতে ন্যস্ত ভূমি রাজস্ব যে পরিমাণ আদায় হয় তার প্রায় অর্ধেক আদায় হয় এই মহল থেকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাবু গুরুচরণকে তার দপ্তরের ২৫,০০০ নারায়ণী মুদ্রা তসরূপ করার দায়ে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল। হিসেব করার পর আমি দেখেছিলাম যে তিনি ৫০০ টাকা ঐ বাবদ পরিশোধ করেছিলেন, যদিও তাঁকে পুনঃ বহালের শর্ত ছিল সম্পূর্ণ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার।

ক্রমিক নং ২৪—

খানগী শাখাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইগুলো হলো খাস্‌বস্‌ বা স্বয়ং রাজার স্বত্বাধীন জমি; এগুলো ১৯ বা ২০ বছরের এক যুবক শিবপ্রসাদ বক্সীর ছেলে অম্বিকাপ্রসাদের দ্বারা পরিচালিত; এবং বাজে মহলগুলো (দেবোত্তর, জায়গীর এবং অন্যান্য জমি) যা ঈশানচন্দ্র মুস্তাফীর দ্বারা পরিচালিত; এগুলোর প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে সংগ্রহ ছিল ২৭,০০০ টাকার কাছাকাছি। যে চার জন

আধিকারিক অফিস পরিচালনা করতেন তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটি সরাসরি মামলার বিচারালয় আছে, সেখান থেকে দেওয়ানী বিচারালয় ব্যতীত আপিল নেই।

ক্রমিক নং ২৫—

রংপুর জেলায় রাজার অধিকারভুক্ত বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব ভাগ তিনটি চাকলা বা জমিদারী সম্পূর্ণভাবে মুস্তাফী ঈশানচন্দ্রের পরিচালনাধীন ছিল। শেষে উল্লিখিত জমিদারী পরবর্তীতে মেসার্স বনিভির অধীনে যায়। এখান থেকে রাজার আয় ভালই হতো। কিন্তু মুস্তাফী এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন এবং যাতে এই ব্যবস্থা বাকী দুটো জমিদারীতে প্রসারিত না হয় তার জন্যও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই দুটি জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল মুস্তাফীর নিজের নিযুক্ত লোকের উপর।

ইজারা মাধ্যমে জমিদারীগুলো পরিচালনায় তার আপত্তির পেছনে যুক্তি ছিল যে, এই ব্যবস্থায় রাজার রাজস্বের কোন বড় রকম উন্নতি ব্যতিরেকে, একটি বৃহৎ সংখ্যক পুরনো কর্মচারী কর্মচ্যুত হবেন এবং রায়তরা মোটামুটি অত্যাচারিত হবে।

ট্রেজারী (কোষাগার)

ক্রমিক নং ২৬—

কোষাগার বিভাগ পরিচালনা সম্পর্কে কোন সংবাদ আধিকারিকদের ও রানীদের উভয় তরফ থেকে আমার প্রাপ্তিতে বাধা দেয়ার আগ্রহ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়; অবশ্য তাঁদের বিশ্বাস যে এটা তাঁদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ।

আদায়ের পরিমাণ বিষয়ে যে তথ্য আমাকে দেয়া হয়েছিল সেটা নির্ভুল, কিন্তু ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এ বিষয়ে অনেক তথ্য গোপন করা হয়েছে।

তৎসত্ত্বেও রানীরা কোষাগারের নগদ অবশিষ্ট টাকার হিসেব আমাকে দেখতে দিয়েছেন, যা তাঁদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রক্ষিত এবং এরূপ আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে, সরবরেকার ও মুখ্য আধিকারিকদের উপস্থিতি ব্যতীত যা কখনই খোলা হয় না। প্রয়াত রাজা বেনারস যাবার সময়ে অবশিষ্ট টাকার সমাপনস্থিতি রাজার হস্তাক্ষরে সংখ্যায় ও শব্দে নিখুঁতভাবে লেখা আছে এবং তাঁর দ্বারা স্বাক্ষরিত। এখানে এটা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে আমি যা আশা করেছিলাম তার তুলনায় জমা তহবিল অনেক সন্তোষজনক। পরিদর্শন থেকে আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে, রাজার প্রস্থানের পর থেকে অদ্যাবধি অবশিষ্ট অর্থের হিসেব সঠিক তারিখাধীনে যথাযথ দেয়া হয়েছে, রাজার বেনারসে মৃত্যুর পর যে পরিমাণ টাকা অবশিষ্ট দেখানো হয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ বিষয়ে গোপনে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

প্রয়াত রাজা যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁর পিতার অমিত-ব্যয়িতা এবং সীমাহীন স্বাধীনতা বা উদারতার জন্য প্রচুর ঋণের বোঝায় তিনি বিড়ম্বিত। এই সমুদয় ঋণশোধের জন্য বিশেষ জোরের সাথে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং এই বিষয়ে এবং তাঁর রাজস্বের উন্নতি কল্পে তাঁর রাজত্ব কালের প্রায় পুরো সময়টাই তাঁকে দিতে হয়েছিল। তবে রাজা সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজার রাজত্বকাল যদি দীর্ঘতর হতো, তাহলে তিনি বিচারালয়-গুলোর সংস্কারে ব্রতী হতেন। রাজভ্রাতা মহীন্দ্রনারায়ণকে প্রত্যেক ব্যক্তিই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, (সরবরেকার নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে কয়েক বছর তিনি দেওয়ানী আপিল আদালতের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।) পক্ষান্তরে রাজার অনুপস্থিতিতে সরবরে-কার হিসেবে যে বিষয়গুলো যেমন ভাবে পেতেন সেটুকুই পরিচালনা করতেন।

বিচারালয় এবং পুলিশের আধিকারিকদের বেতন সংস্কার, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তার জন্য, আমার মতে রাজার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারীদের সংখ্যা অহেতুক বেশী থাকায় তার সংখ্যা হ্রাস করে, এই বেতন কাঠামো পরিবর্তনে যে ব্যয় হবে তার আংশিক পূরণ করা সম্ভব। সম্ভবতঃ এই সঞ্চয়ের মাধ্যমে এবং সংস্থাগুলোর ও বিচারালয়গুলোর আয়ের (fees) উপর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এই ব্যয়ের সম্পূর্ণ-ই দেয়া যাবে। এছাড়াও সামান্যতম সন্দেহ নেই যে রাজার বর্তমান রাজস্ব বৃদ্ধিযোগ্য অনেক পথ আছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও অধিক পরিমাণ সীমান্তবর্তী পতিত জমিকে কৃষিকাজের আওতায় নিয়ে আসা। যদিও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা খুব সহজসাধ্য নয়, কারণ এ ব্যাপারে ভূটিয়া আক্রমণ প্রতিহত করতে গেলে বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সীমান্ত বরাবর শান্তি স্থাপনে ভূটানের সংগে কোচবিহারের স্থায়ী সীমানা নির্ধারণ করার জন্য যথোপযুক্ত জরিপ ব্যবস্থা পরিচালনা করে দুটি রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।

ক্রমিক নং ২৭—

বর্তমানে রাজার দ্বারা পরিচালিত সৈন্যবাহিনী, স্পষ্টতঃ (মানুষের) তিনটি দলে গঠিত। প্রথমটি পুরনো বাহিনী বলে পরিচিত, যেমন সুবাদার—১, জমাদার—১, হাবিলদার—১, নায়েক—৫, সিপাই—৬৮। এই সৈন্যবল মূলতঃ আমাদের একটি প্রাদেশিক (বৃহৎ) স্থলবাহিনী থেকে হস্তান্তরিত, এবং ঐ সময় একজন সুবাদার, দুজন জমাদার, পঁচাশীজন গাদাবন্দুকধারী অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজার সৈন্যদলের দ্বিতীয় ভাগ নতুন বাহিনী বলে পরিচিত ছিল, যার সৈন্যবল হল জমাদার—১, হাবিলদার—৩, নায়েক—৪, সিপাই—৫০। এই উভয় বাহিনীর সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের বেতন পেত। প্রথম বাহিনীর সদস্যরা সর্বদাই কার্যে নিয়োজিত থাকে। তারা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য ও কর্মঠ, কিন্তু তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বাদির পক্ষে তাদের সংখ্যা কম। দ্বিতীয় বাহিনী মনে হয় সম্মানপ্রদ পাহারায় এবং রাজসভার প্রধান আধিকারিকদের মধ্যে বিভক্ত। এই বাহিনীকে প্রথম বাহিনীর সংগে একত্রিত করা উচিত এবং উপযুক্ত পরিচালনাধীনে। সেক্ষেত্রে এই রাজ্যের সকল দায়িত্বাদির পক্ষে উভয়ে প্রায় যথাযোগ্য হবে।

রাজার সৈন্যবাহিনীর তৃতীয় অঙ্গ একজন রিসালদারের অধীনে ১৮৭ জন বরকন্দাজ, একজন জমাদার এবং তেরজন দফাদারের একটি দল। এই বাহিনীর সদস্যদের বেতন দেবার জন্য রিসালদারগণ রাজতহবিল থেকে মোটা টাকা তুলতেন। গোরখপুর জেলার

অধিবাসী শিবশাহী ছিলেন এই বাহিনীর রিসালদার। এই বাহিনীর সকলেই গোরখপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত।.........

কিছু পূর্বেও সৈন্যবাহিনীর এই তিনটি অঙ্গ লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার একজন স্থানীয় আধিকারিকের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, (যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তীকালে এবং) ইহা সুস্পষ্ট (হয়) যে প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনীগুলো একজন আধিকারিকের অধীনেই পুনরায় রাখা উচিত ; এবং আমার বিশ্বাস যে, এই বরকন্দাজদের বৃহদাংশকেই বিদায় দেয়া যেতে পারে, বিশেষ করে যদি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর একটি ছোট বাহিনী কোচবিহারে রাখা হয়, যা আমি নীচে সুপারিশ করব। রাজার সৈন্যবাহিনীগুলোর নিয়ন্ত্রণ পূর্বে নাজিরদেও-এর অধীন ছিল, এবং মনে হয় সেটা অবৈতনিক নিয়োগ, কুমারদের একজনের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত।

ভুটানের সংগে সীমান্ত

ক্রমিক নং ২৮—

ভুটানের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভুটিয়াদের আক্রমণের বহু অভিযোগ রয়েছে। আমি বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ঐ জেলা পরিদর্শন করি এবং সরেজমিন তদন্তে দেখতে পাই যে অনুযোগগুলো সম্পূর্ণ সত্য।

এই সীমান্তের ভুটিয়া সর্দাররা হলেন গুমার জমিদার এবং ভুল্‌কা দুয়ারের কাটওয়া।

প্রথমতঃ দুয়ার গোমার বংশ পরম্পরায় ম্যানেজার হলেন ঔরাং সিং। (এই রাষ্ট্রপ্রধান সহ সীমান্তবর্তী সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানগণ সিং অথবা নারায়ণ নামের সংগে যুক্ত করে। আমার ধারণা এই সকল প্রধানগণ কোচ বংশধর এবং সম্ভবতঃ কোচবিহার পরিবারের দূর সম্পর্কীয়।) আমি দেখেছিলাম, তাঁর অধীনস্থ জমিদারী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। আমি যতদূর দেখেছিলাম—বন্দোবস্ত এবং কৃষিকাজ সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশী পর্বত জোড়, খুরলা এবং কোচবিহারের সংগে সীমান্ত নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিন বিবাদ রয়েছে। এই সীমান্তে রাজার রায়তেরা নিরাপদ ছিল না। (সীমান্তবর্তী এলাকায় কোন থানাও নেই আর কোন পাহারাদারের ব্যবস্থাও নেই, আমি অনুরোধ করেছিলাম অতীতের পোষ্টগুলো পুনঃ স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য ; কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি অথবা ২।৩ জন সৈন্য সেখানে রেখে দেওয়া ছাড়া আর কোন সু-ব্যবস্থা করা হয় নি।) এবং তারা পূর্বদিকে ঔরাং সিং এবং উত্তরে কুটমাদের দ্বারা সীমান্ত লঙ্ঘন ও অত্যাচারিত হতেন। এই শেষোক্ত আধিকারিক কেবলমাত্র সাময়িক কর্তৃত্বের অধিকারী, তাঁর দুয়ার আমার পরিদর্শন করা ভুটিয়া শাসনাধীন অন্যান্য দুয়ারগুলির মতো প্রায় সবটাই পরিত্যক্ত। আমি যখন ভুল্‌কায় গিয়েছিলাম, কুটমা নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন এবং তাঁর এলাকা জনশূন্য ছিল। পক্ষান্তরে তিনি সীমানার খুব কাছেই অবস্থান করেন এবং সব সময়েই তাঁর সংগে সশস্ত্র একদল মানুষ থাকে, অপরপক্ষে কোচবিহারের লোকগুলো নিরস্ত্র সাধারণ কৃষকগোষ্ঠী। সুতরাং তাদের পক্ষে কুটমার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তিনি কেবলমাত্র অনধিকার প্রবেশের জন্যই দায়ী ছিলেন না, পক্ষান্তরে বহু দৌরাত্ম্য, দিবালোকে নরনারী উভয়ই অপহরণ এবং বিভিন্ন সুযোগে লুণ্ঠনও করতেন। (পুরুষদের নিয়ে বন্দী করে রাখতেন এবং ঋণ করেছে এই আছিলায়

বলপূর্বক অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। মেয়েদের তাঁর অনুচরদের স্ত্রী করে দিতেন।) জমি সংক্রান্ত প্রচুর বিবাদ রয়েছে, এবং কেবলমাত্র এইগুলোর মীমাংসা এবং স্থায়ী সীমানা চিহ্ন দেওয়াই নয়, রায়তদের সাহস জোগাতে হবে, সেই সংগে সীমান্তের পতিত জমি ভেঙ্গে আবাদ করার উৎসাহ দিতে হবে। আমি মনে করি পরবর্তী বছরের উপযুক্ত সময়ে আমাদের সরকারের পক্ষে একজন আধিকারিকের উপস্থিতি উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে খুব উপযোগী হবে। সমগ্র সীমানা কখনই এমনভাবে জরিপ এবং চিহ্নিত করা হয় নি. যাতে পুনরায় বিরোধ নিবারণ করা যায় ; বা (বিরোধ মীমাংসার জন্য নিয়োজিত পরবর্তী আধিকারিকগণ মীমাংসায় নিয়োজিত হয়েছেন,) তাঁদের পূর্বাধিকারীদের দ্বারা নির্ধারিত সীমানা সনাক্ত করতে সক্ষম হন। এখন আমি মনে করি যে একজন যোগ্য সার্ভেয়ারের দ্বারা সমগ্র সীমানা নির্দিষ্ট করা, এবং সেই নক্শার প্রতিলিপি, লিথোগ্রাফ্ কপি তৈরী করে সংশ্লিষ্ট কোচবিহার এবং ভূটান সরকারের কাছে সরবরাহ করা, তদ্রুপ আমাদের কার্যালয়ে নথিভুক্ত করা উচিত। খুব কম খরচে গাছ লাগিয়ে সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে। সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত কর্তৃপক্ষদের যদি বড় স্কেলের নকশাদি সরবরাহ করা হয় তবে সরেজমিনে বাহ্যিক সীমারেখা পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঐ সীমান্ত প্রচুর সংখ্যায় বৃহৎ এবং খরস্রোতা পাহাড়ী ক্ষুদ্র নদী দ্বারা এবং পুরনো খরস্রোতার পরিত্যক্ত শাখার দ্বারা বেষ্টিত, যেখানে যে কোন সময়ে জলধারা নেমে আসতে পারে, জলাবৎ বিজড়িত ; এবং এই ভূখণ্ডের সবটাই বালিময় সমভূমি। ঐ ভূখণ্ডের চেহারা অবিরত এমন পরিবর্তন সাপেক্ষ যে সীমানা চিহ্নিতকরণে অতি সতর্কতা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, বিরোধগুলোর পুনরাবৃত্তি না হয়ে পারে না, যদিও উল্লেখ্য নিখুঁত জরিপের দ্বারা ভবিষ্যতের বিরোধগুলো সরাসরি সালিশ এবং মীমাংসা করা যেতে পারে। সীমানার সাধারণ নির্দেশ পূর্ব এবং পশ্চিমে, এবং সকল ক্ষুদ্র নদীগুলোর সাধারণ গতি উত্তর ও দক্ষিণে, সেজন্য নদীর জলধারা দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যদিও অল্প কিছু স্থানে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। ঐ সীমান্ত এলাকায় প্রাকৃতিক দৃঢ় চিহ্ন, যেমন শিলা বা পাহাড় পর্বত ইত্যাদি না থাকায় সর্বত্র সীমানার নিদর্শন কোন বৈজ্ঞানিক জরিপের সঠিকতার উপর অবশ্যই নির্ভর করবে। অনুরূপভাবে নথিভুক্ত বিষয়ে সকল সময়েই সহজে উল্লেখ করা যাবে।

টাকশাল

ক্রমিক নং ২৯—

নারায়ণী টাকা তৈরী করা বন্ধ করে দেওয়ায় এবং সরকারী মুদ্রার প্রচলন না থাকায় কোচবিহারের জনগণ অদ্যাবধি অত্যন্ত অসুবিধায় ভুগছেন ; কিন্তু এটা আমার মনে হয়েছে যে এখন কোম্পানীর টাকা এবং কম মূল্যের খুচরা রূপোর মুদ্রা অধিকতর প্রচুর এবং পূর্বাপেক্ষা সহজেই গৃহীত হয় ; এবং এটা সম্ভাব্য যে বর্তমান নাবালকত্বের সময়, সরকারী মুদ্রা এই রাজ্যে পুরোপুরি চালু হবে।

কোচবিহারের সংগে বৃটিশ সরকারের সম্পর্কের রূপরেখা

মেজর ফ্রান্সিস জেনকিন্স

উত্তর-পূর্ব সীমান্তের গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট।

প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে দুজন সর্দার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের পূর্বপুরুষদের নাম ও কীর্তিগুলো, যা অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে এসে এই সীমান্ত জয় করে একটি রাজত্বের পত্তন করে এবং ভূসম্পত্তির প্রতিষ্ঠা করে, যা আজ পর্যন্ত তাঁদের বংশধরেরা ভোগ দখল করছে।

সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম ছিল বিশু সিং এবং শিশু সিং। তাঁদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ চন্দন ও মদন এই দুটি নাম ব্যতীত তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

তাঁরা কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (অথবা মেচ, এই দুটি সম্প্রদায়কে একরূপই মনে হয়), তিব্বত অথবা তামুল বংশজ লোক, যারা বর্তমানে বিপুলভাবে সীমান্তের সমতল এবং ভুটান পর্বতে ছড়িয়ে রয়েছে, তারা সম্ভবতঃ পার্বত্য এলাকা থেকে নেমে এসেছে। (মিঃ স্কট ভুটান বিষয়ক এক পাণ্ডুলিপিতে বলেছেন যে, "ধর্মরাজা কর্তৃক এই দেশ জয় করার সময় এই এলাকা কোন কোচ রাজার শাসনাধীন ছিল", যা টার্নারের মতে প্রায় ২০০ বছর পূর্বের ঘটনা।) কাছাকাছি সময়ে এই দুই ভাই নিজেদের বিজয়ী হিসেবে পরিচিত করে। বিশু সিং কোচবিহারের রাজাদের এবং নাজিরদেওদের এবং শিশু সিং বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদের প্রত্যক্ষ পূর্ব পুরুষ।

বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ তাঁর রাজত্বকে পূর্বদিকে আসামের নিম্নভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং এই সময়েই কোচবিহার রাজ্য দিনাজপুরের বৃহদাংশ, রংপুর এবং সকল ভূখণ্ড যা একদা প্রাচীন কামরূপ রাজ্য ছিল সেটা অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজা নরনারায়ণ লোয়ার আসাম জয় করে তাঁর ভাই চিলারায়কে কামরূপে রেখে আসেন। (ডঃ বুকানন বিশ্বসিংহের রাজ্য-ভাগ সম্পর্কে বলেন যে, সংকোষ নদীর পশ্চিম অংশ নরনারায়ণের এবং পূর্ব অংশ চিলারায়ের। চিলারায় তাঁর দুই পুত্র পরীক্ষিৎ এবং বলিনারায়ণের মধ্যে তাঁর রাজ্যটিকে পুনরায় দুটি ভাগে ভাগ করেন।) দরং-এর রাজারা তাঁরই বংশধর যাঁরা বর্তমানের (কামরূপ এবং দরং জেলা শাসন করেন) কখনও সার্বভৌম শাসক হিসেবে এবং কখনও হয় সার্বভৌম মুঘল অথবা অহম (আসাম) রাজা, যাঁরাই প্রভুত্ব করতেন তাঁদের করদ রাজা হিসেবে, তাঁরা এঁদেরই বংশধর। নরনারায়ণের পূর্ব দিক থেকে ফিরে আসার পর অনুমান করা হয় যে মোনাসের পূর্ব এলাকায় চিলারায়ের বংশধরগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন এবং মোনাসের পশ্চিম থেকে তিস্তা পর্যন্ত সকল ভূখণ্ড বিশু সিং-এর বংশধরগণের শাসনাধীন ছিল। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতগণ এখন যদিও কোচবিহার রাজত্ব থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন, প্রায় আট পুরুষ ধরে তাঁরা কোচবিহারের রাজাদের করপ্রদায়ক বা জায়গীরদার ছিলেন, তাঁদের দায়িত্ব ছিল নতুন রাজার অভিষেকের সময়ে

রাজার মাথায় ছত্রধারণ করা ; এবং এটা নথিভুক্ত যে তাঁদের দ্বারা এই দায়িত্ব নবম রাজা রূপনারায়ণ, উত্তরাধিকারী হওয়া পর্যন্ত পালিত হয়েছিল। অষ্টম রাজা মহীন্দ্র-নারায়ণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় সরাসরি উত্তরাধিকার বাধা প্রাপ্ত হয়। রায়কত বংশের ভোগদেও এবং যুগদেও কোচবিহারের সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপনারায়ণ এবং তাঁর ভায়েরা মুঘল সৈন্যের সহায়তায় তাঁদের পরাজিত করেন।

এই সময় থেকেই (আনুমানিক ১৬০৩ খৃঃ) পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলগুলো কোচবিহার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখন থেকেই রাঙ্গামাটির ফৌজদারের অধীনে মুঘল সেনারা ক্ষুদ্র কোচবিহার রাজ্যের অনেক অংশ জোর পূর্বক দখল করে ; এবং সেই আধিপত্য গত শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। রংপুরের চাকলা বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্বভাগ জয় করে বাংলার সংগে যুক্ত করার ফলে কোচবিহারের রাজ্যসীমা বর্তমান আয়তনে পরিণত হয়, এবং বাংলার সংগে এই এলাকাগুলো সাধারণ জমিদারী ব্যবস্থার আওতায় আসে।

১৭৭২ খৃঃ আমাদের সংগে কোন সম্পর্ক স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের এই অবস্থা বজায় থাকে। এবং সকলেরই জানা আছে যে ভুটিয়াদের আধিপত্য থেকে এই রাজ্যকে মুক্ত করার সনির্বন্ধ মিনতিতে, এই সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল।

অনুমানের ভিত্তিতে মনে করা হয় যে কোচবিহারের ব্যাপারে ভুটিয়াদের হস্তক্ষেপ সর্বতোভাবে অস্বাভাবিক এবং শত্রুতাপূর্ণ আক্রমণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা যে কতদূর সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, বরং ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত মনে হয় যে কোচবিহারের সংগে ভুটিয়াদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল, এবং এটা স্মরণীয় যে তাদের দেশ থেকে কোচরা বাস্তুত্যাগী, কেবলমাত্র তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—কোচরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, অপরপক্ষে ভুটিয়ারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ; এবং বাংলার সংগে ভুটানের ব্যবসা বাণিজ্য এখনকার মতো তখনও কোচ প্রধানদের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়েই ছিল, সেইজন্যই কোচ রাজাদের সংগে স্বাভাবিকভাবেই ভুটিয়াদের স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোচবিহারে কোন ভুটিয়া দল উপস্থিত হলে প্রচলিত রীতি ছিল যে রাজার খরচে তাদের খাওয়ান হবে। পরবর্তীকালে যখন ইহা করা হয় নি, দেবরাজ, প্রতিষ্ঠিত একটি রীতি বন্ধ হওয়ায়, আমাদের সরকারের নিকট লিখিত নালিশ করেন।

সুপরিচিত রাজগুরু সর্বানন্দের (বর্তমান রাজগুরুর পিতামহ) ভাই, রামানন্দ গোসাই-এর প্ররোচনায় এক ব্রাহ্মণের দ্বারা, একাদশ রাজা নাবালক দেবেন্দ্রনারায়ণ নিহত হওয়ার কারণে ভুটিয়াদের এবারের হস্তক্ষেপ। এই নৃশংস হত্যার জন্য প্রচলিত এবং স্বীকৃত কোন আইনসম্মত অধিকারে ভুটিয়ারা রামানন্দকে হত্যা করে।

পরবর্তী রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ, যাঁর বড় ভাই রামনারায়ণের সংগে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ হয়, নাজিরদেও-এর অনুমতিক্রমে, পূর্বে দেওয়ানদেও পদে নিযুক্তি গ্রহণ করার পরিণতিতে, রামনারায়ণকে (রাজা হিসেবে) বাতিল করা হয়। রামনারায়ণকে তিনি দেওয়ানদেও পদ থেকেও বঞ্চিত করেন ; কিন্তু রামনারায়ণ

ভুটিয়াদের কাছে আবেদন করায়, তাদের দ্বারা তিনি স্বপদে পুনর্বহাল হন। যা হোক, রাজা পরবর্তীকালে দেওয়ানদেওকে হত্যা করেন। এই অপরাধের জন্য, তাদের কর্তৃত্বের প্রতি প্রকাশ্য অবমাননার জন্য, ভুটিয়ারা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে বন্দী করে তাদের পাহাড়ে নিয়ে যায়, সেই সংগে তাঁর ভাই রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। উপরোক্ত ঘটনায় ভুটিয়াদের হস্তক্ষেপে কোন আপত্তির কিছু আছে বলে মনে করা হয় নি। কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, নাজিরদেও খগেন্দ্রনারায়ণ তাঁর পদাধিকার বলে ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার যা তিনি দাবী করতেন, অর্থাৎ একজন রাজা নির্বাচন করার ক্ষমতা। যখন উহা প্রয়োগে ব্রতী হন এবং ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ভুটিয়ারা তাঁদের হাতে বন্দী একজনের পুত্রকে রাজা নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। নাজিরদেও তৎসত্ত্বেও তাঁর নির্বাচন পরিবর্তনে অস্বীকৃত হওয়ায়, ভুটিয়ারা সসৈন্যে পাহাড় থেকে নেমে এসে রাজা এবং তাঁর মাকে ধরে নিয়ে যেতে থাকে, তখন নাজিরদেও-এর নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের দ্বারা তাঁদের উদ্ধার হয়। ভুটিয়ারা তাদের তরফ থেকে বন্দী রাজার বড় ভাই-এর ছেলে বীজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসায়, এবং উভয় পক্ষই তাঁদের মনোনীত রাজাকে স্বীকার করে কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। নাজিরদেও চরম দুর্দশায় পড়েন এবং রাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ায়, তাঁদের সাহায্যের জন্য বঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করেন। নাবালক রাজার নামে নাজিরদেও সন্ধি [মহামান্য ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগে কোচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের সন্ধি পত্রের সর্তাবলী—"কোচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতাস্থ মাননীয় কাউন্সিল ও প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের নিকট তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার অভিপ্রায়ে সন্নিহিত সংঘবদ্ধ স্বাধীন রাজাদিগের উপদ্রবে তাঁর রাজ্যের বর্তমান দুরবস্থার কথা নিবেদন করায় মাননীয় প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিল ন্যায়ানুরাগ ও বিপন্নকে সাহায্য করার অভিপ্রায়ের বশবর্তী হয়ে উক্ত রাজাকে তাঁর রাজ্য রক্ষা কল্পে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সর্তে চার কোম্পানী সৈন্য এবং একটি কামান সম্বলিত ফৌজ তাঁর শত্রুদিগের বিরুদ্ধে পাঠাতে সম্মত হন।

(১) উক্ত রাজা তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থে অবিলম্বে রংপুরের কালেক্টরের হস্তে ৫০,০০০ টাকা দেবেন।

(২) যদি ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত কিছু খরচ হয় তবে রাজা তা মাননীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেবেন কিন্তু যদি ঐ টাকার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তিনি ফেরত পাবেন।

(৩) রাজ্য শত্রু মুক্ত হলে রাজা ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করবেন এবং তাঁর রাজ্যকে বঙ্গদেশের সংগে সংযোজিত হতে দেবেন।

(৪) রাজা আরও অঙ্গীকার করছেন যে কোচবিহার রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের অর্ধেক ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চিরকাল দেবেন।

(৫) যদি রাজা মাননীয় উক্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন তবে রাজস্বের অপরার্ধ চিরকাল তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারিগণের থাকবে।

(৬) কোচবিহার রাজ্যের আয় স্থির করার জন্য কলিকাতায় মাননীয় প্রেসিডেন্ট (কোথাও আছে কাউন্সিলের মাননীয় প্রেসিডেন্ট) এবং কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির নিকট রাজা একখানি 'হস্তবুদ' (রাজস্ব নিরূপক হিসাব) দেবেন এবং তদনুসারে রাজার দেয় বার্ষিক 'মালগুজারীর' পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে।

(৭) মাননীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত মাল-গুজারীর পরিমাণ চিরস্থায়ী হবে।

(৮) রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে মাননীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন, তবে তার ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করতে হবে।

(৯) এই সন্ধি দুই বছর কাল অথবা কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলকে এই সন্ধি চিরকালের জন্য বহাল করার ক্ষমতা প্রদানের সংবাদ পাওয়ার সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।"] করার পর, ইহা মঞ্জুর হয় এবং ক্যাপ্টেন জোন্স, আমাদের চুক্তি অনুসারে, চার দল সৈন্য এবং একটি কামান সহ কোচবিহারের দিকে অগ্রসর হন, শীঘ্রই ভুটিয়াদের বিতাড়িত করেন এবং পাহাড় পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ডালিম কোট দুর্গ অধিকার করেন, এবং টেসুলামার মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত বাংলা সরকারের সংগে চুক্তি সম্পাদনে তারা বাধ্য হয়।

১৭৭৪ খৃঃ ২৫ এপ্রিল তারিখে ভুটানের সংগে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির একটি সর্ত অনুযায়ী রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ বন্দীদশা মুক্ত হন, কিন্তু (যা হোক) তিনি পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শাসন ভার গ্রহণ করেন নি। ১৭৮০ খৃঃ ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়।

১৭৮৩ খৃঃ রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর তিনি রাজার ক্ষমতা নামেমাত্র প্রয়োগ করতেন; পক্ষান্তরে রাজত্ব পরিচালনার সকল দায়িত্ব-ভার ছিল তাঁর রানী এবং রানীর প্রিয়পাত্র সর্বানন্দ গোঁসাই-এর উপর। (নাজিরদেও) যিনি ইংরেজ সরকারের সংগে এই সন্ধির পরিকল্পনা এবং আলাপ আলোচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁকে (সেই নাজিরদেওকে) সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রীয় করে রাখা হয়। রংপুরের কালেক্টারের সংগে রানী ও গোঁসাই-এর ষড়যন্ত্র ও প্রভাবের মাধ্যমে নাজিরদেও তাঁর পদমর্যাদা এবং তাঁর সকল সম্পদ থেকে বঞ্চিত হন এবং রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন।

রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটানে দীর্ঘদিন বন্দী থাকার পর রাজ্যে ফিরে এসেও মানসিক বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে তাঁর রাজ্যের পরিচালন ব্যবস্থায় কখনই আগ্রহ দেখান নি। প্রচলিত যে মৃত্যুর বেশ কিছু দিন পূর্বেই রানী ও গোঁসাই-এর ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি এমন জড়বুদ্ধিগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে তাঁর পদমর্যাদার কোন দায়িত্বাদি সম্পাদনে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন।

এই অবস্থায় রাজার মৃত্যু ঘটায় বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই যে, রানী একটি উইল দাখিল করেন সেখানে তাঁকে নাবালক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র অভিভাবিকা এবং তাঁর নাবালকত্বের সময়ে রাজ্যের পরিচালিকা নিযুক্ত করা হয়। (রানী হরেন্দ্রনারায়ণের মা ছিলেন না।) তিনি এই ক্ষমতা অবিলম্বে গ্রহণ করেন এবং

রানীর এই ক্ষমতা প্রাপ্তি বিষয়ে আমাদের সরকারের পক্ষে রংপুরের কালেক্টার মিঃ মুর কর্তৃক ১৭৮৪ খৃঃ ২৮শে মে এক আদেশপত্রের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। ঘোষণাপত্রের একটি অনুলিপি এখানে সংযোজিত হল :

[গভর্ণর এবং কাউন্সিলের রায় যে কোচবিহারের রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর নাবালক পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং এই নাবালক রাজার পক্ষে দেশের শাসন পরিচালনার ভার মহারানীর উপর থাকবে। তাঁরা উপযুক্ত বিবেচনায় নির্দেশ দিতেছেন যে বর্তমান মহারাজার নাবালকত্বের সময় রাজ্য পরিচালনার দায় মহারানীর উপর ন্যস্ত থাকবে। তদনুযায়ী নির্দেশ দেয়া হল যে, কোচবিহারের সকল জনগণ অবশ্য মহারানীর আদেশাবলী মেনে চলবেন।]

কোচবিহারে আমাদের সরকারের প্রতিনিধিত্ব এযাবৎ রংপুরের কলেক্টারের উপর ন্যস্ত ছিল। যাঁর উপর ১৭৭২ খৃঃ চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের ভারও অর্পিত ছিল এবং দেখা যায় ১৭৮০ খৃঃ পর্যন্ত তাঁরা আমাদের সরকারের প্রাপ্য আদায় করেছেন। তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত সাজোয়ালদের কোচবিহারের সমুদয় রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করে এবং সাজোয়ালগন উক্ত অর্থ হতে সরকারের অংশ কেটে রেখেছেন এবং বাকী অর্ধাংশ রাজার কোষাগারে জমা দিয়েছেন। করের ঐ পরিমাণ, অবশ্য ১৭৮০ খৃঃ স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট হয়, যখন রাজার রাজস্বের বাৎসরিক হিসাবের হস্তাবুদ তৈরী করার জন্য মিঃ পার্লীংকে নিয়োগ করা হয়। এই বৎসর থেকে করের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে আট বা নয় বছর সাজোয়ালের মাধ্যমে, যারা কালেক্টারের দ্বারা নয়, পক্ষান্তরে রাজা দেবী সিং দ্বারা নিযুক্ত, যিনি সে সময় রংপুরের সকল রাজস্ব সংগ্রহ করতেন, ২ বা ৩ বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। পূর্বের রীতি-নীতি মত রাজস্ব সংগৃহীত হত।

আমাদের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কালেক্টারের হাতে থাকায় কোচবিহার সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—কোচবিহার রাজার টাকশাল বন্ধ করা, যেখানে অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছে নারায়ণী টাকা সর্বত্র সহজ-গ্রাহ্য নয়, সেই কারন হিসেবে প্রতি মাসে এক হাজার মুদ্রা তৈরীর সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং রাজার মুখ্য আধিকারিকদের অবাধ্যতার অভিযোগে বরখাস্ত, আটক এবং অন্যান্য শাস্তি দেয়া হয়েছিল। বিরোধী পক্ষের নালিশের ভিত্তিতে গঠিত অভিযোগ-গুলোর জবাবদিহি করার জন্য তাঁদের রংপুরে যখন ডাকা হয়, তখন একজন কালেক্টার নাজিরদেও-এর পক্ষাবলম্বন এবং অপরজন রানীকে সমর্থন করেন।

ইত্যবসরে রানীর সরকার এবং তাঁর মন্ত্রী এবং নাজিরদেও-এর বিরোধীতায় রাজ্যে এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে রাজ্যের মুখ্য আধিকারিকগণ এবং রাজ-পরিবারের প্রধান সদস্যগণ নাজিরদেও, দেওয়ানদেও, ডাঙ্গরদেও এবং অন্যান্যরা, তাঁদের সমস্ত জমি-জমা থেকে বঞ্চিত হন, এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁরা সকলে একত্রে চক্রান্ত করে সৈন্যদল গঠন করেন এবং ১৭৮৮ খৃঃ রাজবাড়ী আক্রমণ করেন এবং রাজা, রানী ও গোঁসাইকে বন্দী করে বলরামপুরে নাজিরদেও-এর

গৃহে নিয়ে যান। নাজিরদেও অবশ্য স্বয়ং সেসময় রাজ্য থেকে নির্বাসিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অধিক নিরাপত্তার জন্য আসামে চলে যান।

এই ঘটনা রংপুরের কালেক্টারের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের কারণ হয়, এবং বলরামপুরে সৈন্যবাহিনীর একটি দলকে পাঠিয়ে উত্তেজনায় সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তিদের আটক করা হয় এবং রংপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখে সরকারী সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন।

কোচবিহারের এই অরাজকতার বিষয়ে প্রায়ই পূর্ব থেকেই বিবাদমান দুই গোষ্ঠী আবেদনের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছিল। (মারকুইস্ কর্ণওয়ালিস্ এই সময়ে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন।) সর্বশেষ হিংস্রতার ফলে সরকার ২রা এপ্রিল ১৭৮৮-এর সিদ্ধান্ততে স্থির হয় যে লরেন্স মার্শ এবং জন লুইস শোভেটকে প্রেরণ করে উভয় পক্ষের ন্যায্য দাবী এবং রাজ্যের সংগে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় ও পন্থার উপর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা যাতে ভবিষ্যতে এর উন্নততর পরিচালনার জন্য আমাদের প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত হবে।

কমিশনারগণ ১৭৮৮ খৃঃ ৩রা মে রংপুরে তাঁদের কাজ আরম্ভ করেন এবং এ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনার জন্য মোগলহাট এবং কোচবিহারে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং ঐ বছরের ১০ই ডিসেম্বর তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন।

এখন আর তাঁদের তদন্তের জন্য প্রস্তাবিত অনুচ্ছেদগুলোর উপর তাঁদের পৃথক রিপোর্টের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু কোচবিহার রাজার সংগে, এই রাজ্যের সংগে আমাদের যোগাযোগের গোড়ার দিকে যে চুক্তি হয় এবং যা নিয়ে দীর্ঘ স্থানীয় তদন্ত হয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ এটি এমন একটি বিষয়ের উপর প্রথম মন্তব্য, যে বিষয়টি সম্বন্ধে পরবর্তী সরকারেরা সম্পূর্ণ পৃথক সিদ্ধান্তে এসেছেন।

"এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর উপর রিপোর্ট দিতে, বাংলা সরকার এবং কোচবিহারের মধ্যে সম্পাদিত ১৭৭২ খৃঃ সন্ধিকে প্রথমেই উল্লেখ করব। [পঞ্চম অনুচ্ছেদ—১৭৭২ খৃঃ কোম্পানী এবং কোচবিহার পরিবারের সংগে সম্পাদিত চুক্তির চরিত্র বিষয়ে এবং করের পরিমাণ সন্ধির সর্তের অনুপাতে সমান কিনা তাঁরা (কমিশনারগণ) প্রতিবেদন পেশ করবেন।] এই চুক্তির সর্তাবলীগুলো এবং তা থেকে উদ্ভূত সম্পর্কের অবস্থা; এবং তারপর দেখতে হবে এই চুক্তির বলে কি প্রকারের প্রভাব বঙ্গীয় সরকার বিস্তার করতে পেরেছিলেন এবং তার ফলশ্রুতিই বা কি হয়েছিল। আমাদের প্রাপ্য রাজস্ব বিষয়ে সন্ধিতে আরোপিত সর্ত অনুযায়ী আমরা অংশ পেয়েছিলাম কিনা সেটা আপাততঃ এখানে আলোচনা স্থগিত রাখা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তির দশম সর্ত আমরা আলোচনা করছি না, কারণ এই সর্তের সংগে বিষয়বস্তুটি স্বাভাবিকভাবে যুক্ত।

আমরা ধরে নিতে পারি যে এই সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যেমন করে সব সন্ধিই পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর পরস্পর দুটি স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে সম্পাদিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল পক্ষ এই চুক্তির ফলে আংশিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে

ক্ষমতাশালীর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা চুক্তিতে স্পষ্টভাবে এবং যথাযথ ভাবে উল্লিখিত সর্তের অধীন। অবশ্য চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ সর্ত করছে যে রাজ্যরক্ষার মূল স্বরূপ কোচবিহারের মহারাজা বাংলা সরকারের বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত হবেন এবং বঙ্গপ্রদেশে তাঁর রাজ্য সংযুক্ত করা অনুমোদন করবেন; কিন্তু (নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্যে) যখন এটা প্রতীয়মান হয় যে বাংলার সংগে রাজার সম্পর্কের প্রকৃতি এবং সীমা কি হবে তা সন্ধির সর্তে পরিষ্কার রূপে নির্দিষ্ট এবং যে সর্তগুলো রাজার উপরেই একান্ত ভাবে প্রযোজ্য, তখন—

প্রথমত বাৎসারিক রাজস্ব আদায়ের অর্ধেক যার নির্দিষ্ট পরিমাণ ও মূল্য স্থির করা আছে, সেটা কোন মতেই বৃদ্ধি করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ তাঁর নিজস্ব আচরণে বঙ্গ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য অটল থাকা; এটা স্বীকার করতেই হবে যে শর্তাবলীর কোন উদার ব্যাখ্যা, আপাতলক্ষ্য সন্ধির মূলনীতি, উপরি উল্লিখিত আনুগত্য ও সংযুক্তির শিথিল ও অসংজ্ঞায়িত অভিব্যক্তি পক্ষপাতহীনভাবে চুক্তিবদ্ধ পক্ষের কম শক্তিশালীর অনিষ্টকর কোন সুযোগ গ্রহণ করা যাবে না। রাজ্য শাসন বিষয় রাজার ক্ষমতার কোনও সঙ্কোচনের অভিপ্রায় যে ছিল না তা এই থেকে স্পষ্ট যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের দুটি বৃহৎ বৈশিষ্ট্য যথা তাঁর নিজের নামে টাকা ছাপার অধিকার, বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা তাঁর অধিকারে ছেড়ে দেওয়া এবং সামগ্রিক ভাবে এগুলো পর্যালোচনা করে আমাদের ব্যাখ্যা এই যে কোচবিহার অতঃপর একটি করদ রাজ্য হবে, বিনিময়ে আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে যে সরকারের কাছে তার ক্ষমতা সীমিত ভাবে অর্পিত হয়েছে, তার কাছ থেকে নিরাপত্তার সাহায্য পাবে। সন্ধি সূত্রগুলো কেবলমাত্র অনুধাবন করেই এগুলোর উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের এই সিদ্ধান্ত, কিন্তু সম্পর্ক একবার স্থাপিত হওয়ার পর বাংলা সরকারের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় ক্রমাগত হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে, যদিও সন্ধির তাৎপর্যের এটা সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সরকারের এই রাজ্য সম্বন্ধে এমন একটা স্বার্থ বুদ্ধি জন্মেছিল যে যখনই এই রাজ্যের কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা সাহায্য প্রার্থনা করতেন, বা যখন রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব কার্যে দৃষ্টি দিতে অক্ষম বা নাবালক বা কোনও নারীর উপর ন্যস্ত হত তখনই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় এই সরকার হস্তক্ষেপ করার অজুহাত পেতেন। সন্ধি সম্পাদনের কয়েক বছরের মধ্যে এই হস্তক্ষেপ এত ব্যাপক হয়েছিল যে কোচবিহারের টাকশাল, যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে এমন অনুন্নত মানের অজস্র মুদ্রা প্রস্তুত হত যা রাজ্যের দক্ষিণ সীমার বাইরে চলত না, বঙ্গ সরকার তার ওপরেও প্রকৃত পক্ষে এমন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন, যা এই অধিকার হরণের তুল্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে কারণ এই দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির পরিপন্থী প্রমাণিত হয়েছে, এই রাজ্যের অভ্যন্তরে বিবাদমান কতকগুলো পক্ষ যাদের অনির্দিষ্ট এবং পরস্পর বিরোধী মিথ্যা নালিশ এবং যাদের পারস্পরিক শত্রুতা যদিও মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের জীবিত কালে এই বিরোধ অনেকাংশে সংযত ছিল কিন্তু ১৭৮৩ খৃঃ তাঁর মৃত্যুর পর এই বিবাদ প্রচণ্ড প্রতিশোধ রূপে বিস্ফোরিত হয়। এই সময় থেকে রংপুরের নানা কালেক্টারের কাছে কার্যকরী ভাবে আবেদন হতে থাকে,

এবং নিজ নিজ পক্ষগুলো পারস্পরিক ক্ষতির দ্বারা উত্তেজিত হয়ে, কেবলমাত্র নিজস্ব ক্ষমতার নিরাপত্তা এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস ব্যতীত, এ সবের গুরুত্ব উপলব্ধির ক্ষমতা মনে হয় হারিয়ে ফেলেছিল ; এবং এই সকল অশোভন বিষয়গুলোর কাছে বঙ্গ সরকারের প্রভাবও নতিস্বীকার করে। এই সকল বিবাদের পরিণতিতে নিঃসন্দেহে রাজ্য প্রচুর দুর্দশা ও দারিদ্র সহ্য করেছে, যা সন্ধির সর্তাবলীর এবং ক্ষমতাদি, যা সময়ে সময়ে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত, দুয়ের মধ্যের বৈপরীত্য, প্রকোপ বৃদ্ধি ও প্রসারিত করতে ব্যর্থ হয় নি। ভান করা হয়েছে রাজা তাঁর স্ব রাজ্যে একজন স্বাধীন নৃপতি বিবেচিত হবেন, কিন্তু সেই সব ব্যক্তিগণ, যারা রাজাকে তাঁর এরূপ মর্যাদায় তুলে ধরতে ঘিরে ছিলেন, তাঁদের না ছিল তাঁর ধন সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি, না তাঁর রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধির প্রতি কোন লক্ষ্য। রাজার স্বাধীনতার এরূপ সংশয় সঙ্কুল ব্যাখ্যা কেবলমাত্র তাঁদেরই স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক হয়েছিল এবং রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আসে। যার ফল-শ্রুতিতে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটে। অপরপক্ষে বঙ্গসরকারের সঙ্গে এই সন্ধির কারণে এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অতি ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ সম্ভব করল, যে হস্তক্ষেপ কোনও নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে না হওয়ায়, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করার তো সহায়ক হয়ই নি, উপরন্তু বিবাদমান পক্ষগুলোর একটিকে সাময়িক প্রাধান্য দিয়ে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিয়েছে। এর ফলে আঘাত দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিবাদমান প্রতিপক্ষের চূড়ান্ত ধ্বংশের চেষ্টা, যা এরূপ ক্ষেত্রে একান্তই স্বাভাবিক। সমস্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। যদিও কোচবিহারের যাতে প্রকৃত উপকার হয়, বঙ্গসরকার এবং কোচবিহারের মধ্যে এরূপ সর্বাধিক সুসম্বন্ধ প্রণালীর উপর আমাদের কাছে কোনও মতামত চাওয়া হয় নি, তবুও উপযুক্ত মন্তব্যগুলো থেকে এটা স্পষ্ট না হয়ে পারে না যে যতদিন এই রাজ্য সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বিত হয়, যতদিন না এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্ষতিকর নয়, কল্যাণমূলক হস্তক্ষেপ আইনের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতি দ্বারা নির্ধারিত না হয় এবং বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যেকার দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, ততদিন নাজিরের দোহাই দিয়ে বা জরুরী অবস্থার ছুঁতোয়, নিয়মলঙ্ঘন অবিরাম নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হবে, এবং এই রাজ্য যে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ে ভুগছে, কয়েক বছর পরে তা চূড়ান্ত এবং প্রতিকারহীন অবস্থায় পৌঁছে যাবে।

যদিও পূর্ববর্তী মতামতের মধ্যে দেখা যায় যে বঙ্গীয় সরকার কোচবিহারের শাসনব্যবস্থায় এই পর্যন্ত যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা থেকে এই রাজ্যের কোন ভাবেই মঙ্গল সাধিত হয় নি। কমিশনারগণ ১২ নং অনুচ্ছেদের উত্তরে সংক্ষিপ্ত ভাবে কোচবিহার রাজ্যে কোম্পানীর একজন কর্মচারীকে প্রতিনিধি হিসেবে রাখার সুপারিশ করেছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন "এ রাজ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কোন গোষ্ঠীর অনুগত কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকলে রাজ্যের কোন মঙ্গল হবে না পক্ষান্তরে সরাসরি ভাবে অরাজকতাকে স্থায়ীত্ব দেয়ার ঝোঁক দেখা দেবে।"

কমিশনারদের প্রতিবেদনের ফলে ১৭৮৯ খৃঃ কোন এক সময়ে মিঃ হেনরী ডগলাস কোচবিহারের রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর চিঠিপত্রের প্রথমটি, ১৭৮৯ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর মাসে লেখা, যেটি নথিগুলোর মধ্যে অদ্যাপি বর্তমান। যা ৩রা নভেম্বরের বোর্ড অব্ রেভিনিউ-এর একটি চিঠির উত্তর। তিনি কি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়েছিলেন, তা আমি আমার কার্যালয়ের নথিপত্র থেকে কিছুই খুঁজে পাই নি। প্রাপ্ত চিঠির বইটি, মাত্র ১৭৯২ খৃঃ জানুয়ারী থেকে শুরু কিন্তু মিঃ ডগলাস ১৭৯০ খৃঃ ৮ই সেপ্টেম্বর গভর্ণর জেনারেলকে তাঁর এক পত্রে তাঁর মুখ্য নির্দেশাবলী এবং ১৭৯০ খৃঃ ২৮ জুলাই হুজুরের সিদ্ধান্তগুলো পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং তার কিছু অংশ ১৮০২ খৃঃ ২৬ আগস্ট তারিখের সরকারের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাণী এবং মন্ত্রী সর্বানন্দকে কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত করে, তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং রাজ্যের হয় বিচার বিভাগ নয় রাজস্ব দপ্তর স্বয়ং পরিচালনা করতেন, অন্ততঃ বিচারালয়ের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন এবং তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর সময়ে তিনি দেওয়ানী আদালতের ত্রৈমাসিক কার্য বিবরণী আদালতে এবং মাল আদালত ও ট্রেজারীর রাজস্ব পর্ষদে প্রেরণ করা প্রবর্তন করে।

তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বাদির কোন বিশেষ উল্লেখ আমি দেখছি না, মিঃ ডগলাস পরবর্তী বছরের শুরুতেই, কাজের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে, যা তাঁর মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করেছে, অভিযোগ করেছেন, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বছরের এপ্রিল মাসে তাঁকে কোচবিহার এবং রাজার রংপুরের জমিদারীর দায়িত্বের অতিরিক্ত "গোয়ালপাড়ার রেসিডেন্টের পরিচালনাধীন জেলাগুলোর" সর্বময় দায়িত্ব কমিশনারকে অর্পণ করেন। ময়মনসিংহের এক বা একাধিক জেলা ছাড়া বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলা অন্তর্গত সব জেলাগুলোই এর মধ্যে ছিল। (মিঃ ডগলাসের ৭ই অক্টোবর, ১৭৯০ খৃঃ এক চিঠিতে দেখা যায় বুড়িপীড় এবং সেরপুর, বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার জমিদারী) জমিদারী-গুলোর অন্তর্গত যা বর্তমানে গোয়ালপাড়া জেলার সৃষ্টি করেছে), এবং যা, সে সময় এবং অনেক বছর পর্যন্ত প্রারম্ভে কোন ইউরোপীয় পরিচালকের অনুপস্থিতিতে (১৭৯০ খৃঃ ২৫ নভেম্বর মাসে মিঃ ডগলাস বোর্ডের কাছে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন যে, রাঙ্গামাটি এলাকা অনেক দূরে অবস্থিত। এখানকার বেশীর ভাগ অঞ্চলই বন এবং পাহাড়ে আবৃত এবং এখানে বসবাসকারী লোকের মধ্যে সভ্যতার আলো খুব কমই লেগেছে, এখানকার জনগণ কৃষিকাজের চেয়ে শিকার এবং মাছ ধরাকেই বেশী পছন্দ করে।) এবং সেই সময় এই জেলাগুলো আরও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে খুবই ভুগেছে, বিহ্বল এবং অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল ; এবং এই বিস্তৃত ও দূরের দায়িত্বগুলো পরোক্ষে কোচবিহার কমিশনারের মুখ্য দায়িত্বগুলোর ধারাবাহিকতায় বাধা সৃষ্টি এবং ব্যাহত করেছিল।

১৭৯০ খৃঃ ২৯শে মে মিঃ ডগলাস কোচবিহারের রাজস্ব সম্বন্ধে প্রথম একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

যা হোক, ১৭৯৮ খৃঃ মিঃ রিচার্ড আমুটী কমিশনার না হওয়া পর্যন্ত কোচবিহারের জমিগুলোর কোন নিয়মিত রেজিষ্ট্রী বই প্রস্তুত করা হয় নি। এই সময় এটী প্রস্তুত

হয় এবং উত্তর-পূর্ব রংপুরের জমিদারীগুলোর পঞ্চবার্ষিক রেজিষ্ট্রি বই-এর সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। (১৭৯৯ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কাছে মিঃ আমুটীর পত্র।)

১৮০১ খৃঃ রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হলে কমিশনার অপসারিত হন।

এই সময় পর্যন্ত মিঃ এইচ. ডগলাস, মহামান্য সি. এ. ক্রস, মিঃ ডাবলিউ টাওয়ার্স স্মিথ এবং মিঃ রিচার্ড আমুটী পর্যায়ক্রমে কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন এবং কোন কোন সময়ে অসুস্থতার জন্য তাঁদের অনুপস্থিতি কালে রংপুরের কালেক্টার মিঃ লামস্‌ডেন এবং মিঃ রাইট কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন।

আমি কোন লিখিত বিবরণ বা নথিপত্র দেখি নি যা থেকে জানা যাবে যে মুদ্রা তৈরী নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই সময়ে কি পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ কোচবিহারের উপর আরোপিত হয়েছিল। ১৭৯৫ খৃঃ মিঃ স্মিথ বলেছেন যে রাজা মুদ্রা তৈরী করতে ইচ্ছুক, কিন্তু যেহেতু সরকার বারংবার এটা নিষেধ করেছেন, তিনি এই বিষয়ে সরকারকে জানান অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। ১৭৯৬ খৃঃ বোর্ড অব রেভিনিউ কোচবিহারের শিক্কা টাকা প্রচলনের প্রস্তাব দেন, কিন্তু এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় নি। ১৭৯৯ খৃঃ দেখা যাচ্ছে টাকশাল পুনরায় চালু হয়েছে, কিন্তু মিঃ আমুটী তিন মাসের জন্য মুদ্রা তৈরী বন্ধ রাখতে সরকারকে সুপারিশ করেন। যা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৭৯৫ খৃঃ থেকে মুদ্রা তৈরী করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং সরকারের নিকট আবেদন ব্যতীত এবং তাও রাজার নাবালকত্বের সময় ঐ টাকশাল কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না।

একমাত্র অপর মন্তব্যটি যেটিতে রাজার বিরুদ্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ প্রসারের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, সেটা মিঃ লামস্‌ডেনের প্রতি ১৭৯২ খৃঃ ১০ই আগস্টে সরকারের একটি আদেশ যে তদানীন্তন জমি বন্দোবস্ত কেবলমাত্র রাজার নাবালকত্বের অনতিক্রান্ত সময়ের জন্য দিতে হবে, এই সীমাবদ্ধতা থেকে, আমি সিদ্ধান্ত করছি যে তাঁর নাবালকত্বের সময় কালে কমিশনারের দ্বারা দেয়া বন্দোবস্তগুলো রাজার উপর, তিনি সাবালক হওয়ার পর, কোন রকম বাধ্যতামূলক হবে না।

"রাজস্ব আদায় এবং ন্যায় বিচার ব্যবস্থা এবং দক্ষ ও যথাযথ পুলিশের নিয়ম-নীতি গ্রহণ করার জন্য" রাজার সংগে সহমত হয়ে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, একত্রে পরিকল্পনা করতে ১৮০২ খৃঃ ২৬ আগস্ট মহামান্য গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮০৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে মিঃ ফ্রান্সিস পিয়ার্ড কোচবিহারের কমিশনার নিযুক্ত হন।

সরকারী সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ১৭৯৮ খৃঃ কমিশনারকে রাজা অনুরোধ করায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, কিন্তু যুবক রাজা ১৮০৩ খৃঃ ৮ই আগস্ট গভর্ণর জেনারেলকে এক চিঠি দিয়ে অস্বীকার করেন যে তাঁর জ্ঞাতসারে এরূপ প্রস্তাব করা হয়েছিল।

মিঃ আমুটীকে সরিয়ে নেবার পর সে সময়ের চিঠি পত্রে দেখা যায় যে রংপুরের বিচারক এবং ম্যাজিস্‌ট্রেটের উপর কোচবিহারের ন্যায় বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশি ব্যবস্থা তদারক করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ; কিন্তু এটা আমার মনে হয়, অসুবিধা-জনক বিবেচিত হওয়ায় সমুদয় দায়িত্ব কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু রাজা, মিঃ পিয়ার্ড-এর কোচবিহারে পৌঁছানো মাত্র অভিপ্রেত ব্যবস্থাদির

প্রতি তাঁর প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং সরকারের তীব্র আপত্তি এবং এই ব্যবস্থাদি চালাবার দৃঢ় সঙ্কল্পের চাপ সত্ত্বেও, মিঃ পিয়ার্ড রাজার সম্মতিলাভে ব্যর্থ হন, এবং ১৮০৪ খৃঃ ১লা আগস্ট তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। (১৮০৩ খৃঃ ২৮শে জুলাই মাসে কমিশনারের নিকট প্রেরিত গভর্ণরের চিঠি এবং ২রা সেপ্টেম্বরে রাজার মারকুইজের কাছে প্রেরিত চিঠি ও ১৮০৪ খৃঃ ২রা মার্চ গভর্ণর জেনারেলের উত্তর দ্রষ্টব্য।)

মিঃ জন ফ্রেন্স এর অল্প কিছু দিন পরেই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮০৫ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁর কার্য পরিচালনার জন্য কতকগুলো নির্দেশনামা তৈরী করা হয় এবং তারপর ১৮০৫ খৃঃ ২৫শে এপ্রিল ঐ নির্দেশগুলোর কিছু ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়। এই সব দেখে এটা প্রতিভাত হয় যে সরকার তাঁদের প্রথম সিদ্ধান্তকে সংশোধন করেন। কমিশনারকে আইন এবং ট্রাইবুনাল সরকারের ছাঁচে রাজার নিজস্ব আধিকারিকদের অধীনে স্থাপনের জন্য রাজার সম্মতি সংগ্রহের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এবং যে পর্যন্ত না এটা কার্যকর হয়, স্থির হয় যে কমিশনার রাজাকে তাঁর রাজ্যের পরিচালনার ব্যাপারে কেবল মাত্র সাহায্য করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি জরুরী মামলায় অবিচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ দেবেন।

মিঃ ফ্রেঞ্চের পরিশ্রমের পরিণতি তাঁর পূর্বসূরীদের তুলনায় সন্তোষজনক হয় নি এবং ১৮০৫ খৃঃ ২৫শে জুন কোচবিহারে পৃথক রেসিডেন্ট কমিশনার পদ লোপ করা হয় এবং রাজার সংগে যোগাযোগের দায়িত্ব পুনরায় রংপুরের কালেক্টারের উপর ন্যস্ত করা হয়। কাউন্সিলের মহামান্য ভাইস প্রেসিডেন্টের ১৮০৫ খৃঃ ১৩ই নভেম্বরের এক চিঠিতে, এই ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজাকে জানিয়ে দেয়া হয়, সেই সময়ই তাঁকে বলে দেয়া হয় যে সরকার হস্তক্ষেপের অধিকার এবং তাঁর রাজ্যে এর আইনসম্মত অধিকার প্রবর্তন সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গির কোন পরিবর্তন করেন নি; পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হল মাত্র। এই প্রত্যাশায় যে অভিজ্ঞতা রাজাকে এতে স্বেচ্ছায় তাঁর সম্মতি প্রদান করতে প্ররোচিত করবে।

মিঃ এ. মণ্টগোমরি, মিঃ জে. মোরগান এবং মিঃ জে. ডিগবী রংপুরের কলেক্টার হন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে কোচবিহারের বিষয়ে কমিশনারের পদে আসেন; এবং রাজার নির্যাতন ও বিদ্বেষের হাত থেকে নাজিরদেও, দেওয়ানদেওকে এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে প্রায় পুরোপুরি তাঁদের হস্তক্ষেপ করতে হত। রাজার এই বিদ্বেষ প্রাক্তন প্রধানের প্রতি এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে মিঃ ডিগবীকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে তিনি প্রয়োজন বোধে রংপুর থেকে সৈন্য দল পাঠিয়ে নাজিরদেওকে ভূ-সম্পত্তিতে, যা তাঁকে মার্শ ও শোভের প্রতিবেদন অনুযায়ী যে পর্যন্ত না তাঁর দাবী সরকার কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, সাময়িক অবলম্বন স্বরূপ, যথোচিত অংশ রূপে বিভাজন করে দেবেন।

মাত্র একটি ঘটনা যা সাধারণ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের অধিকার সম্পর্কে মতামত তুলে ধরার সহায়ক হচ্ছে. মিঃ ডিগবীকে, যিনি নিধন তেওয়ারীর একটি আবেদন পত্র, প্রতিকার করার প্রার্থনা পাঠিয়ে ছিলেন। (আবেদনে বলা হয়—

মহারাজা প্রায় পাঁচ মাস অন্তর একবার রাজঅন্তঃপুরের মহিলা মহল থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে এসে কোচবিহার সংক্রান্ত ম্যানেজার গুরুপ্রসাদ বাবু, দেওয়ানী আদালতের মুক্তার তুলু বাবু এবং অল্প কয়েক জন মুখ্য মুৎসুদ্দি অথবা আধিকারিকের সংগে দেখা করতেন, রাজ্যের কোন প্রজা এমন কি সাধারণ কর্মচারীরাও তার দেখা পেত না। মহিলারাই মহিলামহলে কাগজপত্র আনা নেওয়ার কাজ করতো, মুৎসুদ্দিগণ কদাচিৎ এই মহিলাদের মাধ্যমে রাজার সংগে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ প্রজার পক্ষে রাজ সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই, এমত অবস্থায় রায়তগণ আমলাদের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।) সরকারের ১৮১১ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বরের প্রত্যুত্তর যে—"কোচবিহারের রাজার স্বাধীন স্বত্বা সম্বন্ধে ১৮০২ খৃঃ ২৬শে আগস্টে প্রদত্ত আদেশের পর, সরকার মনে করেন না ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেকার মামলার বিচারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন।"

যদিও অনুযোগটা কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয় বরং সেটা রাজার ফৌজদারী আদালতের বিরুদ্ধে। যে আদালত দেওয়ানী আদালতের প্রদত্ত ডিক্রীকে কার্যকরী করতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে। পূর্বোক্ত আদালতের মুখ্য বিচারক ছিলেন গুরুপ্রসাদ, যিনি রাজার দেওয়ান এবং রাজ্যের প্রকৃত নিয়ন্ত্রতা; (১৮১৪ খৃঃ ৩১শে জানুয়ারী মিঃ নরম্যান ম্যাকলিয়ড এই আধিকারিকের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি চিঠি লেখেন, পরবর্তী মার্চ মাসে সরকার তাঁর পদচ্যুতি ও রাজ্য থেকে বহিষ্কৃতির আদেশ দেন।) রাজা নিজেকে লাম্পট্যের চরম সীমায় সঁপে দিয়েছিলেন। কোচবিহারের বিচারালয়গুলোকে, আমাদের নিজস্ব প্রদেশগুলোতে প্রচলিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে, নিয়মানুগ সংগঠিত করার আমাদের প্রচেষ্টার তখন এরূপ দুর্ভাগ্যজনক ফল হয়, এবং তদ্রুপ ফল হয় রাজাকে, যিনি আমাদের সমর্থনে সিংহাসন লাভ করেন, তাঁর নাবালকত্বের ১০।১১ বছর, রেসিডেন্ট কমিশনারের তত্ত্বাবধানে তাঁকে শিক্ষিত করা, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা পরবর্তীকালে তাঁর উপর বর্তাবে, পরিচালনার জন্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার প্রথম প্রচেষ্টায়।

মহামান্য মার্কুইস্ অব কর্ণওয়ালিস রাজার শিক্ষার বিষয়কে বিশেষভাবে প্রথম কমিশনারের প্রতি সরকারী নির্দেশাবলীর অঙ্গ করেছিলেন, এবং ১৭৯০ খৃঃ ২৯শে মে কোচবিহারের উপর প্রতিবেদনের উপসংহারে মিঃ ডগলাস পরবর্তী উক্তিতে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন—"আমি কেবল বলব যে, আমার প্রতি নির্দেশাবলী অনুসারে, তরুণ রাজা, প্রতিটি বিষয়ে যথাযথভাবে জ্ঞানলাভের উপদেশাদি পান, আমি সর্বোত্তম ব্যবস্থা করব; যাতে তিনি তাঁর নিজস্ব বিষয়গুলো পরিচালনায় উপযুক্ত হন; এবং এই উপায়ের মাধ্যমে তাঁর রাজ্য থেকে, অমঙ্গল যা তার পূর্ববর্তী রাজকুমারদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতার জন্য ছড়িয়ে পড়েছে, তা প্রতিহত করতে পারবেন। (ডঃ বুকানন ১৮০৯-১০ খৃঃ তাঁর কোচবিহারের ইতিহাসে (রিপোর্ট অন রংপুর) বলেছেন যে, "এই রাজার বর্ণনা যা আমি ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে, যাঁরা তাঁর সংগে খুবই পরিচিত, শুনেছি মদোন্মত্ততা এবং লাম্পট্যে নিঃশেষিত একটি হতভাগ্য জীবের তিনি একটি মূর্ত প্রতীক।"

১৮৪৮ খৃঃ ১৯শে আগস্ট সেক্রেটারী মিঃ ইলিয়টের কাছে ডঃ মুর তাঁর একটি চিঠিতে

এই রাজ্যে রেসিডেণ্ট কমিশনার নিয়োগের ফলাফলের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন যে—"এই ফলপ্রদ কর্তৃত্বে রাজ্য উন্নতি লাভ করেছে, জনসাধারণ নিরাপদ হয়েছে এবং রাজার চরিত্রে শুভবৈশিষ্ট্য কৃতজ্ঞ জনসাধারণের দ্বারা স্বীকৃত।"

কমিশনারের হস্তক্ষেপের কারণে রাজার তাঁর আত্মীয়দের প্রতি অত্যাচার প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁর অত্যাচার ও দেওয়ানদেও-এর মোক্তার হরিশ চক্রবর্তীকে বন্দী করার ফলে, মিঃ মণ্টোগোমারীকে কোচবিহারে পাঠান হয়, এবং তদন্তের পর, একটি স্থানীয় আধিকারিকের দলকে ঐ পরিবারকে প্রতিরক্ষা করতে রেখে ; মোক্তারকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয় ; কিন্তু যখন ঐ সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহৃত হয়, রাজা পুনরায় মোক্তারকে আটক করেন, এবং স্বল্পকালের কারাবরোধের পর ১৮১২ খৃঃ ১৪ই নভেম্বর তাঁকে হত্যা করা হয়। দেওয়ানদেও-এর জীবনও সঙ্কটাপন্ন বিবেচনায়, তাঁর নিরাপত্তার জন্য অপর একটি সামরিক বাহিনী পাঠান হয়, এবং ১৮১৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে মিঃ ডিগবী কোচবিহার পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেন যে "দেওয়ানদেও-এর প্রতি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান বিদ্বেষ এবং তাঁর প্রতি রাজার দুর্বিনীত আচরণ তিনি প্রকাশ করতেন তদতিরিক্ত কোন তীব্র আপত্তি তাঁর পক্ষে অকেজো।"

রাজার এই অসংযত আচরণ চলতে থাকায় সরকারকে কোচবিহারে পুনরায় রেসিডেণ্ট কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হয় এবং ১৮১৩ খৃঃ ৭ই আগস্ট, ঐ পদের জন্য মিঃ নরম্যান ম্যাকলিয়ড্ মনোনীত হন। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে কারণগুলো রাজস্ব দপ্তরে ১৮১৩ খৃঃ ৭ই আগস্ট সরকারী সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং অতঃপর মিঃ ম্যাকলিয়ড্ তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রে সরকারকে জানান যে, সরকারের উদ্দেশ্যগুলো রূপায়ণের জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তার প্রতি রাজার অসম্মানজনক আচরণ দেখা যায়! ১৮১৪ খৃঃ ১৯শে মার্চ সরকার ম্যাকলিয়ড্কে বিশেষ নির্দেশাবলী পাঠান এবং এই নির্দেশগুলোর সারমর্ম গভর্ণর জেনারেল তাঁর ১৫ই এপ্রিলের পত্রে রাজাকে জানিয়ে দেন।

রাজা এখন মনে হয় সরকারের ইচ্ছার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা স্পষ্ট করে দেখাচ্ছেন ; এবং মিঃ ম্যাকলিয়ড্ রাজার নামে কিন্তু কমিশনারের প্রতিনিধি মাধ্যমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন ব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য রাজাকে প্রস্তুত করতে আগ্রহী, এবং ১৮১৪ খৃঃ ২৭শে মে গভর্ণর একটি পত্রে রাজাকে তাঁর আপাতঃ আচরণের পরিবর্তনের প্রশংসা করা হয় ; এবং সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি গ্রহণে রাজার প্রতিরোধ প্রত্যাহৃত হয়েছে অনুমান করে ১৮১৪ খৃঃ ২রা আগস্ট মিঃ সেক্রেটারী ডওডেস্ওয়েলের চিঠিতে ম্যাকলিয়ড্কে অধিকন্তু বিস্তারিত নির্দেশাদি জানান হয়।

১৮১৪ খৃঃ ১৪ই অক্টোবর একই সচিবের এক চিঠিতে অতিরিক্ত নির্দেশাবলী প্রেরিত হয়, এবং অব্যবহিত পরেই কোচবিহারে পুলিশদের কার্যকরী সহায়তা দেবার জন্য কমিশনারকে রংপুরের সংলগ্ন থানাগুলোতে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হয়।

পরবর্তী বছরে মিঃ ম্যাকলিয়ডের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া অপ্রয়োজনীয়, এটা বলাই যথেষ্ট হবে যে তিনি প্রধানত হরিশ চক্রবর্তীর হত্যার ঘটনা এবং বৃটিশ সরকারের (ভাইস প্রেসিডেণ্টের নিকট ১৮১৪ খৃঃ ১৭ই ডিসেম্বরে রাজার প্রেরিত এক চিঠিতে

মিঃ ম্যাকলিয়ডের প্রতিনিধিত্ব ও আচরণের উপর মন্তব্য দেখা যাবে, এ বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবণতা যা তিনি সরকার ও কমিশনারের হস্তক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।) বিরুদ্ধে রাজার তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রাজাকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি গ্রহণে রাজী করাতে না পারায় গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কমিশনারের প্রতি তাঁদের পূর্বের নির্দেশাদি প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং সরাসরি কোন সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্বে রাজ্যের বিষয় পরিচালনার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন।

এই সিদ্ধান্তের কথা ১৮১৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী সচিব মিঃ এ্যাডামের এক পত্রে মিঃ নরম্যান ম্যাকলিয়ডকে এবং একই তারিখে আর এক পত্রে রাজাকেও জানিয়ে দেওয়া হয়।

সর্বশেষ উল্লেখিত পত্রের নির্দেশাবলী তখন থেকে সর্বদা পরবর্তী কমিশনারদের নিয়ন্ত্রিত করত, এবং সেই সময় থেকে পরামর্শের মাধ্যম ব্যতীত হস্তক্ষেপের একটি দৃষ্টান্তও আমার জানা নেই।

মিঃ ডেভিড স্কটের মাধ্যমে ১৮১৬ খৃঃ নভেম্বর মাসে মিঃ ম্যাকলিয়ড্‌কে কমিশনার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, যিনি এরপর অল্পদিনের মধ্যেই, উত্তর-পূর্ব রংপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট রূপে গারো হিলস্ ও গোয়ালপাড়ায়, বিভিন্ন রাজস্ব বিষয়ের বন্দোবস্তের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হয়ে জড়িয়ে পড়ায় কোচবিহার থেকে অবিরত অনুপস্থিত থাকেন ; এবং ১৮২৩-২৪ খৃঃ বর্মার সংগে যুদ্ধ সুরু হওয়া থেকে, ১৮৩১ খৃঃ আগস্ট মাসে তাঁর মৃত্যু দিন পর্যন্ত পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনার তত্ত্বাবধানে, এবং পরবর্তীকালে আসামের জন্য সরকারের একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় তিনি এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েন যে তিনি আর কখনও কোচবিহারে ফিরে আসতে পারেন নি।

১৪ বছর যাবৎ রাজার সংগে মিঃ স্কট কমিশনারের আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু নাজিরদেও এবং দেওয়ানদেও-এর সম্পর্কিত বিষয়, বৃটিশ সরকারকে দেয় রাজস্বের বকেয়া বিষয় নিয়েও পুনঃ পুনঃ আলোচনা হয়। বৃটিশ সরকারকে প্রদেয় বাৎসরিক রাজস্ব নিয়মিত প্রদান বিষয়ে রাজার অবহেলা এবং তাঁর যথেচ্ছ অর্থ অপচয় বিষয়েও আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল।

১৮৩০-১৮৩৪ খৃঃ পর্যন্ত মিঃ টি. সি. রবার্টসন কোচবিহারের কমিশনার ছিলেন এবং একবারও কখনও কোচবিহার পরিদর্শন করেন নি।

১৮৩৪ খৃঃ এপ্রিল মাসে কমিশনারের দায়িত্বভারের উত্তরাধিকারী হওয়ার উচ্চ সম্মান আমি লাভ করি। সেই সময়কার মুখ্য ঘটনা হলো বৃদ্ধ রাজার ১৮৩৯ খৃঃ বেনারসে মৃত্যু। তিনি তাঁর রাজ্য ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ এবং চতুর্থ পুত্র বজ্রেন্দ্রনারায়ণকে, (এই সময়ে রাজার তৃতীয় পুত্র জীবিত ছিলেন।) ও বর্তমানের সরবরেকারকে যুক্ত ভাবে কোচবিহারের পরিচালক নিযুক্ত করেন।

শিবেন্দ্রনারায়ণ পিতার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ব্যয় সংকুলান এবং সরকারের আনুকূল্যে বকেয়া বাৎসরিক রাজস্ব পরিশোধ করে দেন। তিনি রাজ্যের এবং রংপুরের জমিদারী (বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্বভাগ) গুলোর রাজস্ব বিষয়ে বিশেষ

নজর দেন এবং রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকদের কাজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে এবং নিজের ব্যয় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে তিনি কেবল আমাদের সরকারের প্রাপ্য বকেয়া করই শুধু পরিশোধ করেন নি, পক্ষান্তরে আমার বিশ্বাস তাঁর পিতা যে ব্যক্তিগত অগাধ ঋণের ভার তাঁর উপর রেখে গিয়েছিলেন, তা থেকেও নিজেকে মুক্ত করেন।

১৮৪৬ খৃঃ শিবেন্দ্রনারায়ণ তীর্থ করতে বেনারসে যান। তিনি প্রথমে তাঁর পরবর্তী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনারায়ণ এবং তাঁর মৃত্যুর পর বজ্রেন্দ্রনারায়ণ, যিনি বর্তমান সরবরেকার —যিনি তাঁর পরবর্তী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য পরিচালনায় নিযুক্ত করে যান। রাজা সরবরেকারের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে, যাঁকে তিনি তাঁর দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে, ১৮৪৭ খৃঃ ২৩শে আগস্টের পর অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান।

আমার নিয়োগের পর, আমি ১৮৩৬, ১৮৪১, ১৮৪৫ এবং ১৮৪৯ খৃঃ কোচবিহার পরিদর্শন করি এবং ১৮৪৪ খৃঃ একবার। সরকারের অনুমতি নিয়ে, আপার আসামে থাকাকালীন আমার অনুপস্থিতির সময়, মেজর ম্যাথীকে পরিদর্শনের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠান হয়।

আমি এই মন্তব্য সহ এই রূপরেখা শেষ করব যে কমিশনারের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ব্যতীত গত ৩৩ বছর কোচবিহারের বিষয়গুলো কেবল রাজা এবং তাঁর আধিকারিকদের আচরণের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এবং ২৬ বছর ধরে সেখানে কোন রেসিডেন্ট কমিশনার ছিলেন না, এবং অধিকন্তু, এই সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ১৪ বছর একটা মধ্যবর্তী সময়ে কোন কমিশনার কর্তৃক কোচবিহার পরিদর্শন হয় নি।

ফ্রান্সিস জেনকিন্স, মেজর,
এজেন্ট, গভর্ণর জেনারেল।

কোচবিহারের ভূমি ব্যবস্থা পরিচালনার নিয়মাবলী
সংক্ষিপ্তসারের ১৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত

এটাই প্রচলিত রীতি যে ইজারা শেষ হওয়ার সময় জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের কোন নির্দিষ্ট দিনে মালকাছারীর আধিকারিকগণ ঘোষণা করতেন যে—যাঁরা ইজারা গ্রহণে ইচ্ছুক তাঁরা মালকাছারীতে উপস্থিত হতে পারেন এবং জমিজমার জন্য নতুন বন্দোবস্তের চুক্তি করতে পারেন ; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন বন্দোবস্ত স্থির হয় ততদিন পর্যন্ত পূর্ববর্তী নির্ধার চালু থাকবে।

২। যাঁরা পূর্বের হার অপেক্ষা অধিকতর দেয়ার প্রস্তাব করতেন তাঁরা ইজারা নিতেন এবং তাঁদের নাম নালবন্দী অনুসারে কোন বইতে তোলা হতো।

৩। সম্প্রতি ইজারার সময় পাঁচ বছর নির্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ঐ সময় অপেক্ষা কোন কোন স্থানে এটা কম-বেশী আছে।

৪। ইজারাদারগণ পাট্টা নিতেন তাঁদের ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের নামে এবং তাঁরা নিজেরা জামিনদার হিসেবে থাকতেন। জামিনের বৈধতা সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হতো না, কিন্তু ওপর ওপর খোঁজ খবর নিয়ে যদি দেখা যেতো যথাযোগ্য, তাদের গ্রহণ করা হতো। অন্তঃপুরের মহিলা এবং কাছুয়ারাও তাঁদের ভৃত্যদের নামে ইজারা গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন, যাঁরা একই সংগে জামিনদার হতেন। যদি এই সব ভৃত্যদের তাদের কাজ থেকে বরখাস্ত করা হতো তাহলে তাদের ইজারার চুক্তি থেকে মুক্তি দেয়া হতো, কিন্তু তার স্থানে যে কেহ নিযুক্ত হলে ইজারার সর্ত অবশ্য মেনে নিতে হতো এবং কৃষকদের সংগে লাভ-ক্ষতির হিসেব মিটিয়ে ফেলতো।

৫। যদি কোন ইজারাদার পূর্ব ধার্য মূল্যে ইজারা দেয়া মহল রাখতে অনিচ্ছুক হতেন এবং যদি আর কেউ ঐ হারে ইজারা গ্রহণে ইচ্ছুক না থাকতেন তখন কম মূল্যেই ইজারা দেয়া হতো।

৬। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে ইজারা দেয়া হতো ঘোষণার মাধ্যমে, যেটা ১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অনুমতি অনুযায়ী অন্তঃপুরের মহিলাদের এবং কাছুয়াদের অধিকারভুক্ত ইজারাগুলোর কোন নতুন বন্দোবস্ত করা হতো না ; কেবলমাত্র প্রথাগত ভাবে ইজারা-মূল্য প্রতি নতুন বন্দোবস্তের সময় শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি পেতো। স্বয়ং রাজা এবং তাঁর নিজস্ব অন্তঃপুরের মহিলাদের ইজারাগুলোতেও এই সর্ত প্রযোজ্য ছিল।

৭। ইজারাগুলোর সর্ত পূরণ করতে না পারার জন্যে যখন মহলগুলো ক্রোক করা হতো, তখন ঐসব মহলগুলো পুনরায় গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের নাম, তৎসহ প্রত্যেকের দাখিল করা অর্থ একটি বইতে লিপিবদ্ধ করা হতো ; এবং যখন তাঁর এবং তাঁর ইজারা নির্ধারিত হতো, তখন দেহাবন্দী বইতে নামগুলো লেখা হতো যাতে ম্যানেজারের নাম সহি যুক্ত হতো।

৮। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত নির্ধারিত মূল্য ইজারাদারগন যথাযথ অংশে গ্রামগুলোর মধ্যে ভাগ করে দিতেন। সম্প্রতি বিভিন্ন জমিদারীতে অন্তঃপুরের মহিলাগণ,

কাছুয়াগণ এবং মহারাজা স্বয়ং ইজারাদারে পরিণত হন ; ফলস্বরূপ ঐসব জমিদারীর কাগজপত্র এই অফিসে আসতো না।

৯। জমিদারীর ম্যানেজার, এই বিষয়ে বন্দোবস্ত দিতেন।

১০। ইজারার সময় উত্তীর্ণ হলে পূর্ব ইজারাদারদের জমা ওয়াশিল বাকীয় কাগজ-পত্র অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা হতো। এ বিষয়ে কোন মাপঝোক করা হতো না।

১১। পাইক মহলের কোন প্রজা পালিয়ে গেলে অথবা কৃষি কাজ পরিত্যাগ করলে, সেটা নেবার জন্য যদি কেউ আবেদন করতেন তখন এর মূল্য নির্ধারণের জন্য উদ্‌ঘোষণা করা হতো এবং যিনি অধিক টাকা দিতে ইচ্ছুক থাকতেন তাঁকেই দখল দেওয়া হতো।

১২। ইজারা নেয়ার সময়ে রায়তরা আপোষে ইজারাদারদের বর্ধিত আয় দিত, কিন্তু যখন অনুরূপ ব্যবস্থা আপোষে হতো না, ইজারাদার জেলা বিচারালয়ে অথবা দেওয়ানী আদালতে অনিচ্ছুক পক্ষদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করতো।

১৩। কট্‌কিনা ইজারাদার বা তৃতীয় পর্যায়ের কৃষক প্রজাদের কাছ থেকে কোন বর্ধিত আয় দাবী করতে পারেন না। অথবা তিনি তাঁদের নির্দিষ্ট মূল্য বাড়িয়ে দিতে পারেন না, যদি না তাঁর এবং মূল্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের চুক্তি থাকে।

১৪। ইজারার চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে মহালগুলো খাসে পরিণত হয় এবং প্রাক্তন ইজারাদারের কাগজ-পত্র অনুযায়ী সম্মতভাবে রাজস্ব সংগৃহীত হয় ; বর্ধিত আয় বা ইজারাদারী এর অন্তর্ভূক্ত করা হতো না।

১৫। প্রতি মাসের ২০ তারিখে, রাজস্বের জন্য সমন জারি করা হতো। যদি সেই ইজারাদার তাঁদের প্রাপ্য প্রদান না করতেন তবে তাঁকে আটক করা হতো ; এবং এটা যদি পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হতো যে, তাঁর গাফিলতির জন্য ঘাট্‌তি ঘটেছে, ঘাটতি অর্থ সংগ্রহের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হতো এবং আদায়ীকৃত অর্থ ইজারাদারদের বাকী ফেলা রাজস্ব থেকে বাদ দেয়া হতো। সকল অতিরিক্ত ব্যয় ইজারাদারদের কাছ থেকে উসুল করা হতো।

১৬। খাস মহল রায়ত এবং মোকরারী পাট্টাদারদের রাজস্ব ঘাটতি, তাদের সম্পত্তি আটক এবং তাদের খামারগুলো কিস্তিবন্দীতে বিক্রয় করে উসুল করা হতো।

১৭। ইজারাদাররা স্বয়ং অথবা তাঁদের পাটোয়ারী বা বসুনীয়ার মারফৎ রাজস্ব আদায় করতেন। যখন টাকা আদায়ে ব্যর্থ হতেন তখন তাঁরা সরাসরি অথবা দেওয়ানী আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেন।

১৮। রাজস্ব ঘাটতির জন্য যখন ইজারাদারগণ রায়তদের শস্য ইত্যাদি আটক করতেন এবং তা কম দামে বিক্রী করতেন ; তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ আদালত বা মালকাছারীতে দায়ের হতো যা সর্বদাই শোনা হতো।

১৯। জুল কর (জলকর ?), বাজার, আফিম্ ইত্যাদি মহালগুলো একই নিয়মাবলী অনুযায়ী পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বন্দোবস্ত দেয়া হতো।

২০। যদি কোন জমি দশ বছর ধরে অনাবাদী বা পতিত থাকতো অথবা পরপর দু'জন ইজারাদার তার দখল না নিতেন তখন সেটা দেওয়ান কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হতো এবং তাকে দেওয়ান-বস বলা হতো ; এই জাতীয় অনাবাদী বা পতিত জমি প্রজাদের চার বা

পাঁচ বছরের জন্য বিনা মূল্যে দেয়া হতো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবাদের যোগ্য হয়। কিন্তু এই জমি আবাদের জন্য কোন কিছুই অগ্রিম দেয়া হতো না। এই সকল জমির কর্তৃত্ব বা দখল একটা সীমানা স্থির করে রায়তদের দেয়া হতো। যখন এই জমিগুলো আবাদযোগ্য হতো জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো।

২১। যখন কোন ব্যক্তি অভিযোগ করতেন যে জমিটি দেওয়ান-বসের অন্তর্গত নয়, প্রমাণানুযায়ী মামলার নিষ্পত্তি হতো।

ফ্রান্সিস জেনকিন্স, মেজর,
এজেন্ট, গভর্ণর জেনারেল।

অপ্রচলিত শব্দার্থ

আবওয়াব—আবুয়াব—আবয়াব—রাজস্ব ব্যতীত রাজা বা জমিদার কর্তৃক গৃহীত কর, অতিরিক্ত কর।

আহিলকার—আহেলকার—জেলায় শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

কট্‌কিনা ইজারাদার—তৃতীয় স্তরের ইজারাদার।

কাছারি—কাজকর্মের স্থান, অফিস।

কাছুয়া—রাজবংশজাত সন্তান।

কাচুয়া—ছোট ছেলে।

কিস্তিবন্দী—একবারে না দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা।

খাল্‌সা (আরবী)—খালিসা—রাজস্ব বিভাগ, সরকারী খাস জমি, গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগীয় দপ্তর, খাসমহল।

খানগীর—ব্যক্তিগত জমি।

খানাজ্ঞী (ফা)—নিজস্ব ভিটা বাড়ীর রায়ত, কর্মকালীন বেতনের বিনিময়ে প্রদত্ত জমি।

খাসবস—স্বয়ং রাজার স্বত্বাধীন জমি।

খাসজমা—নিজস্ব অধিকারে রাখা ভূসম্পত্তি।

খালিসা—রাজার নিজস্ব খাস জমি।

খালিসা মহল—সরকারী খাস করা জমির দপ্তর।

খাসবরদার—যে সিপাই রাজা প্রভৃতির সওয়ারীর সংগে বা ঠিক আগে যায়, রাজার ব্যক্তিগত অনুচর।

খাসনবীস—রাজা প্রভৃতির স্বকীয় মুনশী, ব্যক্তিগত সচিব।

খাসমহল—খাজনা দিতে না পারার ফলে রাজ সরকারের অধিগৃহীত জমি, যে সকল জমি প্রজার নিকট বিলি না করে জমিদার আপন অধীনে রাখে।

ছোবদার (ফ)—রাজার দেহরক্ষী।

দেওয়ানদেও—রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী।

দেওয়ানবস—দেওয়ানের অধীনে রাজস্ব বিভাগ, রাজা কর্তৃক দেওয়ানকে প্রদত্ত জমি।

দেওয়ানী আহিলকার—দেওয়ানী বিভাগের বিচারক।

দেহাবন্দী—একাধিক গ্রামের পরে পরে নামোল্লেখ, গ্রামওয়ারী, পথ নির্দেশিকা, থানাতে তার এলাকার রাস্তাঘাট ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ বহি।

দোগরদেও—প্রশাসনিক পদ।

নাজিরদেও—সেনা বাহিনীর কর্তা, সেনাপতি।

নালবন্ধী—রাজস্ব।

নায়েব আহিলকার—সহ-শাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

বাজে মহল—পত্তন না হওয়া জমি।

বিশ<বিশিনা—ভূমি পরিমাণ, সংখ্যা কুড়ি, কুড়ি কাঠা। এখানে জমা আদায়ের শিরোনাম।

মহাফেজ (ফা—মহাফিজ)—আদালতের কাগজপত্র সংরক্ষক।

মালগুজারী—রাজস্ব বা খাজনা।

মুচলেকা (তুর্কী)—বিশেষ সর্তে অঙ্গীকার পত্র।

মুকররী পাট্টাদার—নির্দিষ্ট খাজনাতে যে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে।

মুস্ত—স্থাবর।

মালকাছারী—রাজস্ব জমা করার অফিস।

মুৎসদ্দি—হেড ক্লার্ক, ম্যানেজার, কার্যাধ্যক্ষ।

রিশালদার—রেশালদার—অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক।

রুবকারনবিশ (ফাঃ)—বিচার কালে আদালত বিচারের সুবিধের জন্য কোন কোন সময় যে সকল বিশেষ আবশ্যক মন্তব্য যাদের দিয়ে লেখান হয়। হুকুম-পত্র লেখক।

শিক্কা টাকা (পা)—মুদ্রা।

সদর আমিন—রাজস্ব বিভাগীয় নিম্ন শ্রেণীর বিচারক, মুন্সিফ, কানুন গো।

সরবরাকার—সরবরেকার—সরবরাহকার (ফা)—কর্মাধ্যক্ষ।

সরাসরি-বিচার—আদালতের নিয়মমত বাদী বিবাদীর জবানবন্দি, জেরা ইত্যাদি বিস্তারিত না লিখে সংক্ষেপে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, সামারি ট্রায়াল।

সদর কাছারি—হেড কোয়ার্টার, প্রধান কার্যালয়।

সদর মালগুজার—যিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে রাজস্ব দাখিল করেন, রাজকোষ।

সাজোয়াল—রাজস্ব সংগ্রাহক, তহশীলদার, রাজকর্মচারী।

হস্তবুদ (পা)—যে হিসেবে রাজস্বের ভূত ও বর্তমান অবস্থা দেখান হয়।

ভূমিবিভাগ বিষয়ক তথ্য

জমিদারী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সূত্রে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক যিনি কোন পরগণার মালিকী স্বত্ব প্রাপ্ত হতেন, তাঁকে জমিদার বলা হতো। জমিদারের অধিকারস্থ ভূমির নাম জমিদারী ছিল।

যে ব্যক্তি খাজনা দিয়ে জমি ভোগদখল করেন, তাকে বলা হতো প্রজা।

ভূম্যধিকারী যে দলিল বা পত্র দ্বারা নিরূপিত করে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রজাকে ভূমির স্বত্ব প্রদান করতেন, তাকে বলা হতো পাট্টা।

প্রজা যদ্দারা ভূম্যধিকারীর পাট্টার স্বত্ব কবুল অর্থাৎ স্বীকার করতেন, তার নাম কবুলিয়ৎ।

প্রজার নিকট খাজনা পেয়ে তার নিদর্শন স্বরূপ তাকে যে দলিল দেওয়া হতো, তার নাম দাখিলা।

সালের বা বছরের মোট খাজনা আদায়ের নিদর্শন স্বরূপ দলিলের নাম সালিয়ানা। (কোচবিহার রাজ্যে সালিয়ানার পরিবর্তে রফাইত হিসেব প্রচলিত ছিল।)

যে হিসেব দ্বারা গভর্ণমেণ্ট বা জমিদার সরকারে টাকা দাখিল করা হতো, তাকে বলা হতো চালান।

যে দলিল দ্বারা সম্পত্তি সাফ বিক্রয় করা হতো, তার নাম ছিল কবলা।

যে দলিল দ্বারা কোন স্থাবর সম্পত্তি এককালে বিক্রয় না করে কোন নির্দিষ্ট সময়ান্তে বিক্রীত হবে, এরূপ সর্ত লিখে দেয়া হতো, তাকে কটকবলা বলা হতো।

পাট্টা—এতে পাট্টাদাতা ও গ্রহীতার নাম, ভূমির পরিমাণ, সীমানা নির্ধারিত কর ও মিয়াদ এবং সন তারিখ প্রভৃতি স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হতো।

কবুলিয়ৎ—এতে পাট্টায় যা যা দরকার, সেটাই আবশ্যক হতো।

দাখিলা—এখানে থাকের নম্বর, তালুকের নাম, প্রজার নাম, স্বত্ব এবং টাকার পরিমাণ ও দাখিলা-দাতার স্বাক্ষর থাকতো।

সালিয়ানা—এতে প্রজার নাম, জমির বিবরণ, মোট খাজনা এবং জমিদার অথবা তাঁর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর থাকতো।

চালান—এর মধ্যে থাকের ও তৌজির নম্বর, মহাল, পরগণা, তালুক, জোতদারের বা জমিদারের নাম এবং খাজনার পরিমাণ ও যার মারফত টাকা দেয়া হয় তার নামের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

কবলা—এতে খরিদদার ও বিক্রেতার নাম এবং ভূমির বিশেষ বিবরণ অর্থাৎ মহাল, পরগণা, তালুক, থাক, তৌজি এবং সীমানা প্রভৃতির উল্লেখ, বিক্রীত ভূমির পরিমাণ ও মূল্য এবং সন তারিখ ও সাক্ষীর নাম উল্লেখ থাকতো।

কটকবলা—এখানে কবলার সমস্ত বিবরণ থাকতো এবং অতিরিক্ত মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মিয়াদের উল্লেখ থাকতো, ঐ মিয়াদান্তে ভূমির সংগে কট দাতার কোন স্বত্ব থাকে না ; কট গ্রহীতার স্বত্ব বর্তিয়ে যেতো।

চিঠা বা মাপ বহী—যে বইতে প্রজার নাম, ভূমির সীমা, দৈর্ঘ প্রস্থ সহ ভূমির পরিমাণ ও প্রকার ভেদ লেখা হতো, তাকে চিঠা বলে।

পৈঠা—যে বইতে তৌজির নম্বর, প্রজার নাম, ভূমির পরিমাণ ও প্রকার ভেদ লিখিত থাকতো, তাকে পৈঠা বা বন্দটী বা দাগবিলি খতিয়ান বলতো।

তেরিজ—যে বইতে প্রজাগণের অধিকৃত নানা শ্রেণীর ভূমির বিবরণ বিশেষরূপে লেখা হতো, তার নাম তেরিজ বা একোয়াল খতিয়ান।

জমাবন্দী—যে বইতে প্রজার অধিকৃত নানা শ্রেণীর ভূমির পরিমাণ, জমার হার, খাজনার পরিমাণ লেখা হতো, তার নাম জমাবন্দী।

তৌজী—যে বইতে প্রত্যেক প্রজার ওয়াশীল বাকীর হিসেব বিস্তারিত রূপে লেখা হতো, তার নাম তৌজী।

আমদানী ও ক্যাশ—যে বহিতে জমিদারের আয়-ব্যয়ের হিসেব লেখা হতো, তাকে আমদানী ও ক্যাশ বলতো।

কোচবিহার রাজ্যের ভূমির স্বত্বাধিকারীগণের বিবরণ

জোতদার—যারা মহারাজ ভূপ বাহাদুরকে অথবা ব্রহ্মত্তরদার, নাখেরাজদার প্রভৃতিকে রাজস্ব দিয়ে ভূমি ভোগ-দখল করতো, তাদেরকে জোতদার বলতো।

চুকাণীদার—যারা জোতদারকে রাজস্ব দিয়ে ভূমি ভোগ-দখল করতো, তাদেরকে চুকাণীদার বলতো।

দরচুকাণীদার—যারা চুকাণীদারকে রাজস্ব দিয়ে ভূমি ভোগ-দখল করতো, তাদেরকে দরচুকাণীদার বলা হতো। এ ছাড়া সদর ভাগিয়ার, অধীন ভাগিয়ার, তলীতস্য চুকাণীদার, আধিয়ার প্রভৃতি কতকগুলো স্বত্ব ছিল।

এফ. জেনকিন্সের দ্বিতীয় প্রতিবেদন

প্রেরক—

কর্ণেল এফ. জেনকিন্স, এজেন্ট, গভর্ণর জেনারেল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত।

প্রাপক—

ই. এইচ. লাস্‌লিংটন, এস্‌কোয়্যার,

বাংলা সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব।

(ক্রমিক নং ২৩, তারিখ ৩রা মার্চ ১৮৬০)

রাজনৈতিক বিভাগ, এপ্রিল ১৮৬০ নং ৩৭।

মহাশয়,

আমার গত মাসের ২৭ তারিখের ২০ নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিনীত ভাবে কোচবিহার রাজ্যের অবস্থা বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন পেশ করছি।

২। আমার কোচবিহার পরিদর্শন বাস্তবিকই অসময়ে হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শূন্য পদগুলিতে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নি। কর্মচারীদের মধ্যেও অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজমান। আধিকারিক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত রাজা যে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণে ইচ্ছুক, সেগুলিও বন্ধ রাখা হয়েছে।

রাজার রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রানীরাও শূন্য পদগুলি পূরণে বিরত ছিলেন। ফলে পদগুলির দাবীদারের সংখ্যা দেখে রাজাও কম বিব্রত হন নি। রানীদের ইচ্ছা, এই বিষয়ে দাবীদারদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করে আমি আশা করছি, যে কোন ভাবেই হোক রাজ্যের এই অনিশ্চয়তার ভাব দূর হয়েছে, কারণ আমি রাজ্য থেকে চলে আসার সময় তিনি কাদের প্রধান পদগুলিতে নিয়োগ করবেন এ বিষয়ে মন স্থির করে ফেলেছেন।

৩। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্বেও আমি দেখেছি যে রাজা রাজ্যের সমস্ত দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন এবং তাঁর রাজ্যে ফেরার পর থেকে তিনি অফিসের বকেয়া কাজের অনেকগুলিই নিষ্পত্তি করেছেন।

আমার আগমনের তারিখ পর্যন্ত রাজা সেই সময়কার অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার জন্য একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরী করেছিলেন এবং স্বর্গীয় রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের গুরুতর অসুস্থতা, যা তাঁর মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়, যার দরুণ আরব্ধ কাজগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণার পরিচয় দেন। এ ছাড়াও রাজা রাজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ করে বর্তমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন বিষয়ে আমার পরামর্শ প্রার্থনা করেন। যেমন বর্তমান প্রচলিত নিয়মে কৃষকদের অল্প সময়ের জন্য জমি বন্দোবস্ত করা হয়। যে ব্যবস্থার দরুণ ইজারাদারদের জমির উপর স্থায়ী আগ্রহ থাকে না এবং যার দরুন অন্য কৃষকদের জমি বিলি করায় প্রচণ্ড দুর্নীতি হয়ে থাকে।

৪। রাজা রাজ্যের এবং তাঁর প্রজার উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, আমার

মুখ্য দায়িত্ব ছিল রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে রাজার পূর্ণ অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সংযত রাখা।

রংপুরের জমিদারী থেকে উৎবৃত্ত রাজস্ব এবং কোচবিহারের ভূমি রাজস্বের আয় থেকে দেখা যায় যে রাজার নিজস্ব তহবিলে অতি সামান্যই অবশিষ্ট থাকতো। তাঁর পিতামহের রাজত্বকালে মিঃ আমুটী জমির যে বন্দোবস্ত করেছিলেন তা থেকে রাজার অংশে সামান্য টাকাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে ভাবে রাজস্ব আদায় হচ্ছে তাতে বহু রাজস্বই গোপন এবং অপচয় করা হচ্ছে। আমি যে ২০ বছর এই রাজ্যের সংগে যুক্ত আছি, আমি মনে করি যে সেই সময়ে রাজ্যের কৃষি অন্ততঃ দ্বিগুণ হয়েছে এবং রাজার প্রথমেই কর্তব্য হবে জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থার সংশোধন, কারণ রাজাও মনে করেন, প্রতি শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু তাঁর রাজ্য থেকে সুষ্ঠুভাবে যে আয় হয় তা সঠিকভাবে জানার পূর্বে তিনি এ জাতীয় উদ্যোগ বা উন্নতিতে অগ্রসর হতে পারেন না, কারণ তাতে তাঁর পিতা যে ভাবে এই রাজ্যকে অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন, তাকে আবার সেই অবস্থায় পড়তে হবে।

৫। আমার কোচবিহার শেষ পরিদর্শনের সময় কৃষির উন্নয়ণ সর্বত্রই লক্ষণীয় ছিল, বিশেষ করে ছোট ছোট পতিত জমি, জলা জমি উদ্ধার করে চাষ করা হচ্ছে।

উন্নয়ণের আর একটি সুখদায়ক সংবাদ হল, আমি দেখেছি যে সর্বত্র শ্রমিকের পরিবর্তে বলদে টানা গাড়ীর ব্যবহার হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে কারণ আমি দেখেছি যে ব্যবসা এবং কৃষিতে যে বিরাট চাহিদা সরষে, পাট এবং অন্যান্য শস্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তার দরুণ ব্যবসায়ীরা এই পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে এবং এর প্রভাব আমার মনে হয় কোচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে রাজার কর্মচারীদের এবং পরিচারকদের একটি সাধারণ অভিযোগের কারণ হল জীবন ধারণের প্রতিটি আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, যা এদের স্বল্প বেতনে জীবন যাত্রায় পক্ষে কষ্টদায়ক, কিন্তু প্রজাগণ এই মূল্য বৃদ্ধির এবং মজুরী বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে।

৬। রাজা তাঁর এক যুবক কলেজ সংগী বাবু কালীকমল মৈত্র, যাঁকে রাজার সংগে মিশতে নিষেধ করা হয়েছিল, তাঁকেই রাজমন্ত্রী উপাধি দিয়ে তাঁর কর্মচারীদেব মধ্যে উচ্চপদ দিয়েছেন।